ভ্রমণ : মাটি মানুষের রং

ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির সঙ্গে ভিটেমাটির লড়াই

কেন্দ্রভজনার দুই নীতি : আসাম
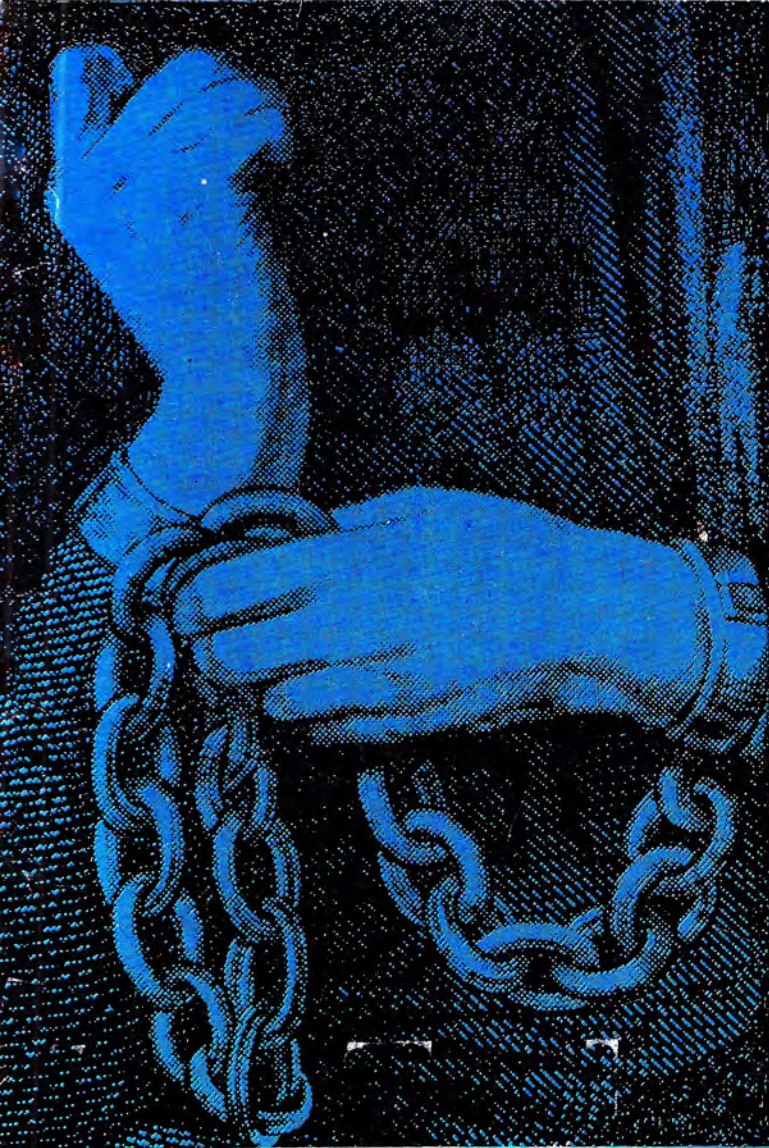
আজিজুল বিশ্বনাথসহ ৬৪ জন নকশাল বন্দীর মুক্তি না দেয়া রাজনৈতিক অপরাধ

নারী

শুধু নিজের জন্য নাচতে চাইনা

অমিতা দত্ত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সূচী

বাংলাভাষায় সর্বভারতীয় পাক্ষিক
চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব কর্তৃক ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোন ২৩ ০৫৯০ থেকে প্রকাশিত ও হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোম্পানি পি-২৫৩ সি· আই· টি স্কিম ৬-এম কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ : তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ।

দাম ৩ টাকা
বিমানে অতিরিক্ত ২৫ পয়সা

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

৬৪জন নকশাল বন্দী···

৬৪জন বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা এই প্রশ্ন নৈতিক ও রাজনৈতিক। সরকার অন্তত প্রকাশ্যে বলুন কেন এঁরা মুক্তি পাবেন না, কেন এঁদের রাজবন্দীর মর্যাদা দেয়া হবে না। পৃঃ ২১

ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির সঙ্গে ভিটেমাটির লড়াই

ভোগরাই এবং বালিয়াপোল, দুটি ব্লক এখন উড়িষ্যার ঝড়ের কেন্দ্র। সমুদ্র তীরের এই দুটি ব্লকের ১৭০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ন্যাশানাল মিসাইল টেস্টিং রেঞ্জ বসছে। এলাকার লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ আন্দোলন। পৃঃ ২৮

মাটি মানুষের রং

ভ্রমণ কাহিনীতে তত্ত্বের আমদানি ? এ যেন সাইকেলে সমাজ তত্ত্ব, কিন্তু যতই লেখক পথ চলেছেন, দেখেছেন দৈনিক কাগজের চাঞ্চল্যকর তদন্ত রিপোর্ট ও সরকারি পরিসংখ্যানের কঙ্কালের মাঝখানে আসল দেশ আর মানুষকে। পৃঃ ৪৭

মাথায় সবচেয়ে আগে পচন ধরে

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসেরই এক দল ২০০/৩০০ লোক নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে চড়াও হয়। এই আক্রমণকারীরা একমাত্র তখনই চলে যেতে বাধ্য হয় যখন তাদের প্রতিহত করার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেসের কিছু নেতা ও কিছু কর্মী পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হন।

প্রিয়রঞ্জন অভিযোগ করেছেন, আক্রমণকরীরা তাঁকে হত্যা করতেই চেয়েছিল। আক্রমণের পদ্ধতি দেখে মনে হয় প্রিয়রঞ্জনের এই অনুমানের যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে। আক্রমণকারীরা দল বেঁধে এসেছে, তাদের হাতে মারণাস্ত্রও ছিল। প্রিয়রঞ্জন যে-ঘরে ছিলেন তার প্রধান দরজা ভাঙতে না পেরে, পাশের দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকে পড়ে। শুধু তাঁর দেহরক্ষীর উপস্থিতবুদ্ধি ও যে-শিক্ষিকাদের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন তাঁদের অসামান্য সাহসের ফলেই আক্রমণকারীরা পেছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তৎসত্ত্বেও, খুনই যদি লক্ষ্য হত, তা হলে তারা হয়ত প্রিয়রঞ্জনকে খুন করেই যেত। আজকাল ভারতীয় রাজনীতিতে এই পদ্ধতি প্রায় স্বীকৃত হয়ে গেছে যে খুন করতে চাইলে বেশ সহজে ও অনায়াসে খুন করা যায় ও খুন করেও ধরা না পড়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খুন ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে স্বীকৃত পদ্ধতি হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক নেতা হিশেবে সকলের সামনেই এই বিপদ। হাজার দেহরক্ষীও এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

কিন্তু এই ঘটনার সবচেয়ে বিপদের দিক হল, কংগ্রেসের সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও রাজনৈতিক কাজকর্মই হয়ে উঠেছে সাধারণ নাগরিক জীবনযাত্রার বিরোধী। কোনো এলাকায় কংগ্রেসের কোনো দলীয় সভা ডাকা থাকলেও, তা হয়ে ওঠে আইনশৃঙ্খলাঘটিত একটা প্রধান সমস্যা। বর্তমান কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীর নীতি কতটা অনুসরণ করে চলেছে এবং কতটাই-বা সেই নীতি থেকে সরে এসেছে—এ তর্কের চাইতেও বড় সত্য হল রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আজ এক অরাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে এবং কংগ্রেসের মাস্তানিভবন সম্পূর্ণ হয়েছে।

সেদিন প্রিয়রঞ্জনের ঘরে যে-শিক্ষিকারা প্রিয়রঞ্জনকে বাঁচানোর জন্যে নিজেরা আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁরাও কংগ্রেসি। কিন্তু তাঁরা আজকের কংগ্রেস-সংগঠনের কেউ নন—তাঁরা কংগ্রেস-অনুগামী জনসাধারণের অনামা অংশ। জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের যাঁরা অনুগামী তাঁদের ভিতর এই শৌর্য, সাহস, বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক বোধ এখনো আছে। কিন্তু কংগ্রেসের যাঁরা মাথা তাঁদের ভিতর মাস্তানিতন্ত্রই এখন এক ও একমাত্র আশ্রয়। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম প্রকাশ্যেই উচ্চারিত হতে পারে—তৎসত্ত্বেও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই থেকে যান, প্রিয়রঞ্জনও সভাপতি থেকে যান। এই সহাবস্থান কংগ্রেসের জীবনীশক্তির লক্ষণ নয়, এই সহাবস্থান মুমূর্ষু জীবকোষে নানা আক্রমণশীল জীবাণুর সহাবস্থান। কংগ্রেসের মাথাতে সেই মরণপচন শুরু হয়েছে।
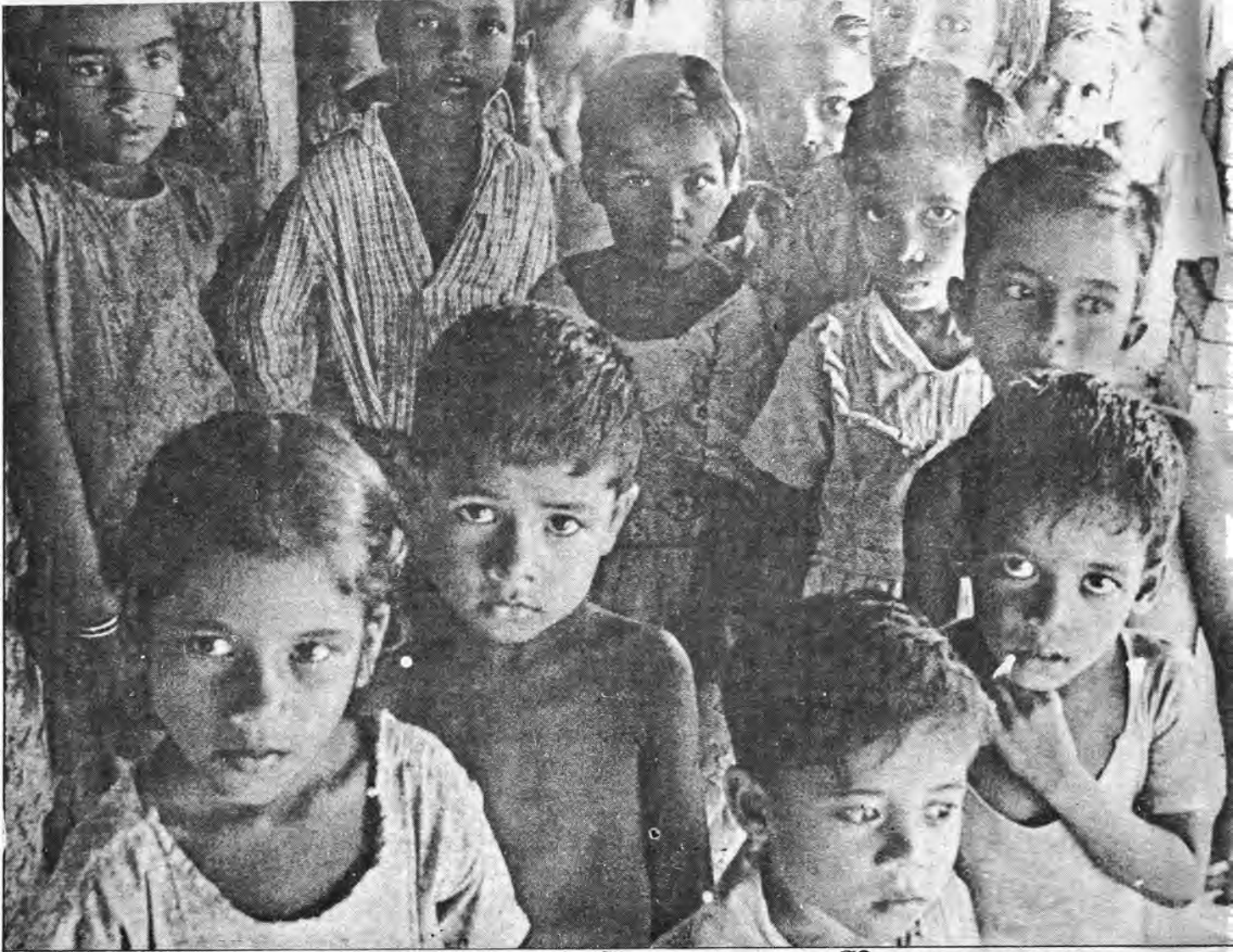
আমরা কাজে নেমেছি অন্ধকার ঘুচিয়ে এদের জীবনে আলো পৌঁছে দিতে

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেকদিন ধরে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য নানা অসুবিধে ভোগ করেছেন। তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে আজ সেই সংকটকে আমরা প্রায় অতিক্রম করতে পেরেছি। দীর্ঘ পথের শেষে যেন আজ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের সামনে এখন নতুন কাজ, নতুন দায়িত্ব। কেবল আরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই নয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার মান আরও উন্নত করতে হবে যাতে নিয়মিত, সুষ্ঠুভাবে, অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ চুরি ও অন্য নানাবিধ দুর্নীতি রোধ করতে হবে। রাজ্যের সুদূরতম অঞ্চলেও বিদ্যুৎ পৌছে দিতে হবে।

সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার প্রধান সহায়ক বিদ্যুৎ। প্রগতি ও পরিবর্তনের শুভকর্মপথে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
সমৃদ্ধির প্রসারে বিদ্যুৎ

PARICHAY-SEB

অমিয়ভূষণ ও বঙ্কিম পুরস্কার

অমিয়ভূষণ মজুমদার বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়ায় অনেকের নেত্রই বঙ্কিম হয়েছে। আমাদের নেত্রও বঙ্কিম হয়েছিল যখন একটি উপন্যাসে পড়েছিলুম মাইকেল মধুসূদন সমকামী, কালীপ্রসন্ন সিংহ ইমেজধারী নবীনচন্দ্র সিংহ জারজ সন্তান!
'প্রতিক্ষণ' সাহিত্য-কলমে দেবেশ রায় যথার্থ বলেছেন, অমিয়ভূষণ যে কী করে এতদিন লিখে গেছেন তা কল্পনা করাও কঠিন!
অমিয়ভূষণের প্রকাশকদের পাদপ্রদীপে এনে রায় মহাশয় বে-নজির সৃষ্টি করলেন। সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের উদ্দেশে জানাই অমিয়ভূষণকে দয়া করে খণ্ডে খণ্ডে আমাদের কাছে এনে দিন।

দেবায়ন রায়
কলকাতা ১০

দুই

২-১৬ জুলাই সংখ্যায় শ্রীদেবেশ রায়ের 'বঙ্কিম পুরস্কার ও অমিয়ভূষণ মজুমদার' লেখাটি শুধু তথ্যবহুলই নয় লেখাটি প্রতিক্ষণের এই মুহূর্তের একটি সময়োপযোগী সংযোজন। লেখাটি পড়ে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ সম্পর্কে জানা গেল অনেক অজানা তথ্য। একনজরে আমাদের কাছে লেখাটির মূল্য অপরিসীম। শ্রীরায়ের এই আলোচনাটি সাধারণ পাঠককেও অমিয়ভূষণ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি করে দিতে সক্ষম হবে। দেবেশবাবু যথার্থই লিখেছেন, "অমিয়ভূষণ এতটাই বিরল চরিত্রের লেখক যে তাঁকে ঔপন্যাসিক বললে অনেককে বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করতে হয়, হ্যাঁ, তিনিও উপন্যাস লিখেছেন বটে, বা, কেউ কেউ একটু বিহ্বলও হয়ে পড়েন।" আর সম্ভবত এই কারণেই এ যাবৎকালের পুরস্কৃত বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের পুরস্কার প্রাপ্তি একটা 'গেল গেল' রব তুলেছে। আমরা মনে করি এই 'গেল গেল' রব এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে অমিয়ভূষণকে ছোট করার প্রচেষ্টা তাঁকে ছোট না করে বরং আরো বড়-র স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।
তবে শ্রীরায় কেবল কলকাতার প্রকাশকদের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা হয়ত তাঁর জানা নেই যে উত্তরবঙ্গ থেকেও তাঁর বই প্রকাশ করা হয়েছে। আর বঙ্কিম পুরস্কারের আগেও তিনি ৮৪তে পেয়েছেন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য পুরস্কার'। এই পুরস্কার তাঁকে অন্তত চিনিয়েছে উত্তরবঙ্গের জনগণের কাছে। আর ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশনের মনোজ রাউত তো

তাঁর একটি গল্পসংকলন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে বসে ঐ বছরই বইমেলায় প্রকাশ করে ফেলেছিলেন বইটির নাম 'তন্ত্রসিদ্ধি'। এতে অমিয়ভূষণের দুটি বড়মাপের গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে তন্ত্রসিদ্ধি এবং বেতাগ, বাইতোড়, সরসুনা প্রভৃতি। (বইটির প্রচ্ছদপট অলংকরণ করেন পত্রলেখকদ্বয়ের মধ্যে একজন রথীন্দ্রনাথ রায়)।
এছাড়া অমিয়বাবুর বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা যেদিন হল, সে দিনই আমরা শ্রীমজুমদারকে ব্যক্তিগতভাবে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাই। শ্রীমজুমদার এতে খুশি হয়ে যে চিঠিটি আমাদের পাঠান তাও এই চিঠির অংশে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কেননা অমিয়ভূষণের পুরস্কার প্রাপ্তির খবরের পর তাঁকে নিয়ে কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক অপ্রত্যাশিত ও অশালীন কিছু মন্তব্য করেছেন যা ঐসব সাহিত্যিকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার আসনগুলি অনেকখানি নাড়িয়ে দেয়। তাই তাঁর চিঠির এই উদ্ধৃতি। শ্রীমজুমদার হয়ত এটা জানতেন বলেই ঐসব মন্তব্যের আগেভাগেই আমাদের লিখেছিলেন ২২-৬-৮৬ তারিখে "আপনাদের সম্মিলিত অভিনন্দনের কার্ডটা আমার এত আনন্দের হয়েছে যে আমি ভাবছি কি করে এটাকে প্রিজার্ভ করা যায়।
আমি তেমন ভালো লিখি কিনা, লিখলেও আমার রাজনগর পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত কিনা এসব বিতর্কিত বিষয়; আমার ভালো লাগছে এই ভেবে: চলতি কথায় যাকে মফস্বল বলে, কাগুজে ভাষায় গ্রাম বাংলা, সেখানে যাঁরা ছোট ছোট পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা করে যায়, কলকাতা শহরেও তেমন ছোট ছোট পত্রিকার লেখক আছে, এই পুরস্কার আমি তাদের সকলের পক্ষ হয়ে গ্রহণ করতে পারছি। যেন এই প্রথম কোনো বিশেষ পত্রিকা গোষ্ঠীর বাইরে কাউকে স্বীকৃতি দেয়া হল। আমি এবং আপনারা নিশ্চয় বিস্মিত হব না যদি সেসব গোষ্ঠীর মুখপাত্রেরা এই পুরস্কারের ব্যাপারটাকে খর্ব করার চেষ্টা করে, বিচারকদের আক্রমণ করে।"

রথীন্দ্রনাথ রায়, সুশান্ত আচার্য
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

জন্মদিন প্রতিক্ষণ

তৃতীয় বর্ষ শেষ। চতুর্থের শুরু হল সাজানো-গোছানো একটা সংখ্যা দিয়ে। নিয়মিত পাঠক নই, তবু কার না পড়তে ইচ্ছে হয়? একটা বড় কারণ আর্থিক। ডাক্তারি ওষুধ কিনতে গিয়েও সে পয়সা দিয়ে 'প্রতিক্ষণ' কিনে ফেলেছি। না, বাড়িয়ে বলছি না, এটা সত্য ঘটনা।
একটা কথা। খেলা নিয়ে যে জায়গাটা যাচ্ছে তাতে অভিনবত্ব কিছু নেই, কেননা খেলা বিষয়ক অনেক উঁচুদরের আলাদা পত্রিকা আছে। এ বিভাগটা বন্ধ করে দিতে পারেন। অবশ্য ব্যবসায়িক দিকটা আমার অজানা। তবে চিঠি প্রকাশ করে পাঠকদের মতামত যাচাই করে দেখতে পারেন।

তপনকুমার চক্রবর্তী
আইন বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দুই

জুলাইতে আমাদের প্রিয় পত্রিকা 'প্রতিক্ষণ' চার বছরে পা দিল। 'প্রতিক্ষণ' আবির্ভাবলগ্নেই পত্রিকা জগতে রুচিশীলতা ও মননশীল চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখেছিল। তখনই এই পত্রিকা রুচিশীল পাঠক পাঠিকার হৃদয় জয় করে নিয়েছে। যত দিন গেছে 'প্রতিক্ষণ' ততই পরিণত হয়েছে।
বিষয় নির্বাচনে, নতুন আঙ্গিকে, দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনে 'প্রতিক্ষণ' আজ সাহিত্য পিপাসু রুচিবান পাঠক পাঠিকার সম্পদ—অবসরের সঙ্গী।
এই শুভলগ্নে, 'প্রতিক্ষণ'-এর প্রতি আমাদের শুভকামনা 'প্রতিক্ষণ দীর্ঘজীবী হোক।

রানী দাশগুপ্ত,
শম্পা রায় ও
শান্তিরঞ্জন দে।
তিলজলা, কলকাতা-৩৯

তিন

সভ্যতার চরম সংকটসময়ে 'প্রতিক্ষণ'-এর ভূমিকা আমরা দেখেছি। তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' পত্রিকা নয়, মানুষ চেয়েছিল তাদের নিজস্ব পত্রিকা। পেয়েছেও। এবং সেইজন্যই 'প্রতিক্ষণে'র কাছে মানুষের আশা, চাহিদা অথবা দাবি অনেক বেশি। তিনটে বছর ধরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এলেও সামনে আরও কঠিন দিন আসছে। তবু প্রতিক্ষণ এগিয়ে যাবে—অর্থবল নয়, বিপুল জনসমর্থনকে পাথেয় করে: এই প্রত্যয় আমার মনে দৃঢ়।

অলোক দত্ত
কলকাতা-৬০

চার

বহু বাধাবিপত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে 'প্রতিক্ষণ' চতুর্থ বছরে পদার্পণ করল। এ জন্য প্রতিক্ষণকে নতুন করে সাজাবার যে প্রয়াস কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নবীন 'প্রতিক্ষণ' আজকের মানুষের ঘুম ভাঙিয়েছে। আজকের মানুষের মনে চেতনার সঞ্চার করেছে।
যদিও ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যার প্রায় সবকটি রচনাই প্রশংসার দাবি রাখে তথাপি আমার কাছে তুষার রঞ্জন পত্রনবীশ রচিত 'দেশকাল' বিভাগে 'কোন গঙ্গাজলে গঙ্গাজল ধোয়া হবে?' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। "পতিতোদ্ধারিণী" ও "কলুষনাশিনী" ভাগীরথীর বর্তমান

ভয়াবহ চিত্রটিকে চিত্রিত করতে লেখক সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। স্বল্প স্থানের মধ্যে বিশ্লেষণ ও নানা পরিসংখ্যা উত্থাপন করে লেখক যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর প্রশংসা না করে পারা যায় না।
মোটের ওপর বলা যেতে পারে, প্রবন্ধটি গঙ্গার জলদূষণের ভয়াবহ দিকটি সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। প্রবন্ধটির সঙ্গে সোমনাথ ঘোষের ফটোগুলিও যথোপযুক্ত হয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়ে তাই একটি কথাই বলা যায় আজ আমাদের ভাবার দিন এসেছে, আত্মসচেতনতা সৃষ্টির দিন এসেছে।

প্রদীপ্ত বাগচী
শেওড়াফুলি, হুগলি

পাঁচ

'প্রতিক্ষণ' এর প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই আমার নজর কেড়েছে এর বলিষ্ঠ লেখনি। শিল্প-সংস্কৃতি-রাজনীতি ইত্যাদির কলম অত্যন্ত নির্ভীক, বিশেষ করে পাঞ্জাব বিষয়ে লেখা তো অনবদ্য।
তবে আমি গত তিনবছর একটি আশাই নিয়ে ছিলাম যে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের এক ভীষণ নোংরা সমস্যা 'পণপ্রথা'-র ব্যাপারে আপনারা নজর দেবেন। আজ পশ্চিমবঙ্গে পণপ্রথা দুষ্টব্যাধির কবলে। বিশেষ অনুরোধ : এই 'বিশেষ' ব্যাধির ওপর একটি 'গোলটেবিল' করুন। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছ থেকে কথা শুনতে চাই।
তিন বছরের সাবালক 'প্রতিক্ষণ' দীর্ঘায়ু হয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিচরণ করুক এই কামনা করি।

গোয়ালা আশ
মাধবগঞ্জ
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

ছয়

নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'প্রতিক্ষণ' ২ জুলাই চার বছরে পা দিল। আমার আপশোষ, গত তিনবছর 'প্রতিক্ষণ' এর সুখ দুঃখের, ভালো মন্দের সাথী হতে পারিনি বলে। মাত্র মাস ছ'য়েক 'প্রতিক্ষণ' নিয়মিত পড়ছি ও সংগ্রহ করছি।
যে অবস্থা ও সম্মানবোধ নিয়ে 'প্রতিক্ষণ'-এর জন্ম, পরিচালকরা এর মর্যাদা রেখেছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, খেলা...কী নেই এতে ? সব ফাঁকই তো পূরণ হয়ে গেল ! সমাজে নারীর ভূমিকা বিরাট ও ব্যাপক দেখে 'নারী' বিভাগের সূচনা। নিত্য-আলোচ্য ও জনপ্রিয় টিভি-র আলোচনা, আরো কত কী ? তবে, সবচেয়ে ভালো লাগল 'ভ্রমণ' বিভাগের কথা শুনে। সাথে যদি রঙিন ছবি থাকে,—সে তো সোনায় সোহাগা।
পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার তুলনায় বাংলা কবিতার উচ্চমান নিয়ে গর্ব করা যায়। তাই তো 'প্রতিক্ষণে' দলমত নির্বিশেষে সমস্ত-শ্রেণীর কবিদের কবিতা গুরুত্ব পেয়েছে—বিশেষ করে তরুণদের। প্রতি পক্ষের কবিতার পৃষ্ঠাগুলি দেখলে সমকালীন বাংলা কাব্যের রূপটা স্পষ্ট হয়ে যায়।
একটা কথা। রঙিন ছবিগুলো বেশি ভালো হচ্ছে না। 'প্রতিক্ষণ' যেন কোনোদিনই সাপ্তাহিক করা না হয় ও বিজ্ঞাপন সর্বস্ব পত্রিকা না করা হয়, এ ব্যাপারে নজর রাখবেন।

সুশান্ত কুমার কবিরাজ
বগুলা, নদীয়া

সাত

সততা ও নিরপেক্ষতা সঙ্গে নিয়ে 'প্রতিক্ষণ' চতুর্থ বছরে পা দিল। আর বাংলার সচেতন পাঠকবৃন্দকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। প্রতি বছরই আপনারা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাগজের অঙ্গসজ্জার ও বিষয়সূচির যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য
নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক রচনা 'মৃত্যু শিবিরের শিল্প' ও গোপাল হালদারের ফিচার 'কথায় কথায়' অনবদ্য সংযোজন। কিন্তু 'যে যেখানে' বিভাগটি চোখে পড়ল না। তাহলে কি আমরা রেণু রাই কিংবা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মতো কিছু উজ্জ্বল মানুষের পরোক্ষ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হব ? ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন।
আর একটা ছোট্ট কথা : কবিতার পাতায় অলংকরণ শিল্পীর নাম ও 'নিবন্ধ নির্বাচিত' বিভাগে পত্রিকার নাম ও নিবন্ধ রচয়িতার নাম ছাড়াও পত্রিকার সম্পাদকের নাম উল্লেখ থাকলে কি ভালো হয় না !
'প্রতিক্ষণ' দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা নিয়ে শেষ করছি।

অমিত মণ্ডল
হাওড়া ১

আট

প্রতিক্ষণের নিয়মিত পাঠক হিশেবে প্রিয় 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকাকে জানাই চতুর্থ বর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই অতনু রায়চৌধুরীকে, তার 'কলকাতাতেও ভ্রূণ হত্যার ঝোঁক' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ রচনাটির জন্য। আশা রাখব এই রকম অনেক তথ্যের হদিশ পাব প্রতিক্ষণের পাতায়

শুভেন্দুশেখর রায়
কলকাতা-৩৬

নয়

সর্বভারতীয় বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা 'প্রতিক্ষণ' চার বছরে পদার্পন করল। বিগত তিন বছর ধরে 'প্রতিক্ষণ' নিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন করে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে 'প্রতিক্ষণ' সঠিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। 'প্রতিক্ষণ' আমাদের গর্ব।

তপন সরকার
যাদবপুর, কলকাতা ৩২

দশ

চতুর্থ বর্ষের শুরুতে প্রতিক্ষণের নতুন সজ্জা লক্ষ করলাম। আপনারা পাঠকের মতামতকে যে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সে প্রমাণ পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। ছাপার ছোট হরফের বিরুদ্ধে আমারই বোধ হয় প্রতিবাদ ছিল বেশি। এবার তার পরিবর্তনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ
নতুন বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিভাগের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য পত্রিকার গুরুত্ব বাড়বে।
শেষ পাতার 'যে যেখানে' বিভাগ কেন বন্ধ করলেন ? চারজন না হোক এক কলমে একজন করে উপস্থিত করে বিভাগটি চালু রাখুন। 'এ পক্ষের কলকাতায়' বিভাগে ছবির পরিচিতি থাকলে ভালো হয়।
আপনারা যে বলেছেন 'প্রতিক্ষণ' বের হবার পর বাংলা পত্রিকার চেহারা পালটে গেছে, কথাটি ঠিক। একচেটিয়া সাহিত্য কারবারের এখন অবসান ঘটেছে। আমাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা 'প্রতিক্ষণ'কে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত করুক।

মনোজকুমার মিত্র
কলকাতা-৩৯

'সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস'

গত ২ জুলাই, প্রতিক্ষণে 'টিভি' বিভাগটিতে প্রকাশিত আমার 'সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস...' শীর্ষক লেখাটিতে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল রয়ে গেছে। যেমন, লেখক হিশেবে রাজশেখর বসু কি আন্তন চেখফের নাম, কিংবা ভিক্টর ব্যানার্জী, ওম পুরী, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ে মতো অভিনেতাদের নাম বাদ পড়ে যাওয়া। একজন সমালোচকের পক্ষে এ ধরনের ভুল নিশ্চয়ই মার্জনীয় নয়। সে দায় আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।

শুদ্ধব্রত দেব
কলকাতা-২৮

দুই

'প্রতিক্ষণে' (২-১৬ জুলাই) শুদ্ধব্রত দেবের 'সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস' শীর্ষক একটি দামি লেখা পড়লাম। এক এক সময় প্রতিভাশালী এমন এক একজন আসেন যখন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই লোকে পাগলামি ভাবেন। এককালে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু যেমন বলা যেত না, আজকাল তেমনি সত্যজিৎ সম্পর্কেও। সত্যজিৎ অবশ্যই ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে তুলনারহিত, অসামান্য তাঁর দান কিন্তু তাঁর লেখা কিশোর উপন্যাসসমূহ দুর্বল ঠিক নয়, অপাঠ্য। রূপকথার জগতে আমরা কেউই আজ বাস করি না, কিন্তু রূপকথার পাঠকের সংখ্যা আজও নেহাৎ নগণ্য নয়। কেন ? এমনও কেউ কেউ আছেন যে তারা রূপকথা নিয়ে গবেষণাও করেন। কারণ তাতে আছে শিশু-কিশোর মানসিকতার এক মায়াময় রোমান্টিকতা, কিশোরকে শিল্পী করে তোলার অন্তঃস্বভাবী আশ্লেষ। তাই তাদের দিনযাপনের গ্লানি নেই। সত্যজিতের লেখাকে আধুনিক রূপকথা বলতে যদি চান কেউ তবে তা ভ্রান্তিরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, যদি জ্ঞানের বিস্তৃতির প্রশ্ন ওঠে তবে বলা যায়, সত্যজিতের ভুল এগুলিকে ইতিহাস বলে তথ্য বলে পরিবেশন করা। তাই সেগুলো এসেছে সিরিয়াস ভাবেই।

রূপকথা কিন্তু কখনো ইতিহাস বলে না, তথ্য দেয় না অথচ গল্প বলে এক বর্ণাঢ্য উর্বরতায়। সত্যজিতের উপন্যাসকে যিনি যে চরিত্রেই ভাবুন না কেন তাতে এই উর্বরতা নেই অথচ তাঁর কাছে আমরা কিন্তু সহজেই এসব আশা করি না।

অরুণাশু ভট্টাচার্য
মহানাদ, হুগলি

তিন

এখনও কিছু কিছু লোক অন্যান্য সময়ের মতই সরবে রয়েছেন যারা মনে করেন কিছু করার আগে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া উচিত। আসলে যাঁরা তালেগোলের বাজারে হৈহৈ করে নিজেদের ভাসিয়ে দেন না।

শুদ্ধব্রত দেবের এলেম আছে। আমাদের দেশে সাঁইবাবার মতোই সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে একটা 'মিথ' এবং 'ইলিউশন' সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ভাঙাটা বুদ্ধিমানের কাজ এবং তা করতে গেলে প্রাথমিকভাবে দাঁড়াতে হয় একটা স্রোতের বিরুদ্ধে আর তার জন্য চাই সাহস। মনে হয় শুদ্ধব্রতবাবুর তা আছে। আশার কথা, 'সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস' নিয়ে যে বাগাড়ম্বর এবং হৈচৈ শুরুতে ছিল তা শেষে নেই—কারণ স্পষ্ট, অন্তঃসারশূন্যতার চমক থাকতে পারে কিন্তু স্থায়িত্ব বড় সাময়িক। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সন্ন্যাসীর অভিশাপে মানুষ সাপ হয়ে যায় এটা গল্পে স্বস্তিতে না পড়তে পারাটা সত্যজিৎ-বিরোধিতা। এক ব্যক্তি যে কোনো পুরনো জিনিশ সংগ্রহ করে তার ইতিহাস বলে দিতে পারে এটা বিশ্বাস না করতে চাওয়াটা সত্যজিৎ বিরোধিতা। মৃত মানুষেরা রাতে এসে স্টুডিওতে মডেল হয় এটা না মানতে চাইলে সত্যজিৎ-বিরোধিতা হয়। জন্মান্তরবাদ, টেলিপ্যাথি এগুলো অবিশ্বাস করার অপর নাম সত্যজিৎ বিরোধিতা। ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি এই সমস্ত বিষয় নিয়েই 'গবেষণা' করত। সত্যজিৎ কি তাঁদের উত্তরসূরী?

অঞ্জন ভৌমিক
কলকাতা ৪৭

চার

২-১৬ জুলাইয়ের টি· ভি· সিরিয়াল সমীক্ষাতে মনে হল শুদ্ধব্রত দেবের শেষপর্যন্ত 'সত্যজিৎ রে প্রেজেন্টস' ব্যাপারটি সামগ্রিক ভাবে ভালো লেগে ওঠে নি। সত্যি কথাই এটা যে, কারও ব্যক্তিগত ভালোলাগা—মন্দ লাগার ওপর অন্য কারও হাত থাকতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভাবনা ও মন্তব্যে স্বাধীন এবং আস্থাশীল। কিন্তু এই স্বাধীনতার গণ্ডি যে কতটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আমাদের বিচরণভূমি যে কতটা সীমিত তা যে কোনো আলোচনার দোর গোড়াতেই মেপে দেখার দরকার আছে। অর্থাৎ মোদ্দাকথায়, আলোচনা করার এলেম তৈরি হয়েছে কিনা, এবং তা সর্বসমক্ষে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রকাশ করা যায় কিনা তা মেপে দেখার দরকার আছে।

শুদ্ধব্রতবাবুর কলম বেশ সাহসী এবং প্রসারিত। বিশ শতকী চিন্তায় তিনি সরাসরি সত্যজিৎ রায়কে কলমের একটি মাত্র খোঁচায় "ইয়েলো রাইটার" আখ্যা দিয়ে দিলেন। তাঁর জুৎসই ভায়ায়,"···ছোট ছেলেদের, ইউ· এফ· ও চক্কর মেরে যায় বাঁশবনে আর অলৌকিক ইন্দ্রজালের কাছে বোকা বনে যায় বিজ্ঞান" ইত্যাদি কথাগুলোয় বেশ ঝাঁঝ আছে। সত্যজিৎ রায়ের 'একডজন গপ্প'-তে বঙ্কুবাবুর গল্পটি কি সত্যিই বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং শুধু ছোটদের গল্প? ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে আসা 'এ্যাং' নামক জীবটি কি প্রতীক হিশেবে গণ্য হতে পারে না? তার কি বৈজ্ঞানিক যথার্থতার কোনো প্রয়োজন আছে গল্পের ফোকাল পয়েন্টটি বোঝাবার জন্যে? সত্যিই বুঝি না ড্রইং রুমের মজলিশ কফি হাউসের হলদে বাংলা আমাদের আর কতদিন হজম করতে হবে পত্রপত্রিকার পাতাতেও।

দীপক দে
কন্টাই, মেদিনীপুর

পাঁচ

সন্দীপ রায়ের টি· ভি· সিরিয়ালের আলোচনা প্রসঙ্গে ৪ বর্ষের ১ সংখ্যার 'প্রতিক্ষণে' শুদ্ধব্রতদেব সত্যজিৎ রায়ের অবৈজ্ঞানিক গল্প-উপন্যাসের যোগ্য সমালোচনার সাহস দেখিয়েছেন। শুধু গল্প-উপন্যাসে নয়, তাঁর জীবনেও এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী কীরকম আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে সে তথ্যও সত্যজিৎ রায় জানিয়েছেন 'সন্দেশে'র সাম্প্রতিক এক সংখ্যায়।

সুকুমার রায়ের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের কাজে ও লেখায়। সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরীর দাবি নিয়ে সত্যজিৎ রায় অবৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রচার করে চলেছেন, বিনা বাধায়, বিনা সমালোচনায়, এমনই দেশে, যেখানে কম্পিউটার দিয়ে ভাগ্য গণনা করা হয়।

সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতির সঙ্গে যাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত তাঁদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। অন্য কোনো মহল থেকেও সত্যজিৎ রায়ের এই বিপজ্জনক ঝোঁকটির সমালোচনা করা হয় না। নির্বিচার স্তুতিই সব রঙের ভক্তদের সত্যজিৎ-পূজার একমাত্র উপাচার। স্রোতের বিপরীতে গিয়েও শুদ্ধব্রতবাবু এই অপ্রিয় দায়িত্বটি পালন করেছেন। তাঁকে জানাই পূর্ণ সমর্থন।

সোমেশ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা ৪

ছয়

টি· ভি-তে এযাবৎ সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় যে সব ছবি দেখানো হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই বক্তব্যবিষয়, গল্পবলার ধরন, কলাকৌশলগত কাজ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে খুবই মামুলি গোছের, যা 'প্রতিক্ষণ'-এর আলোচনাতেও যথার্থভাবে ধরা পড়েছে। এমনকী অভিনয় কিংবা ক্যামেরার কাজেও সবসময় একই মান বজায় থাকে নি। অথচ কোনো কোনো পত্রপত্রিকা ইতিমধ্যে সন্দীপ রায় সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছে। সম্ভবত সিরিয়ালের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের নাম যুক্ত থাকাই এর কারণ কিংবা এর পিছনে গূঢ় ব্যবসায়িক কারণ থাকাও বিচিত্র নয়। এর কোনোটাকেই শিল্পসম্মতভাবে সফল ছবি বলা চলে না। বেশির ভাগ গল্পেই কিছু ছকে বাঁধা ঘটনা বা চরিত্রও এসে গেছে। কোথাও কোথাও তাদের বাস্তব বলে ভেবে নিতেও বেশ কষ্ট হয়।

গল্প বাছতে গিয়েই প্রথম ভুল করে বসেছেন সন্দীপ। সত্যজিতের কিছু গল্প অবশ্যই সুখপাঠ্য কিন্তু তাদের কোনোমতেই খুব বড় ধরনের সাহিত্যকীর্তি বলে ধরে নেওয়া যায় না। আর একথাও সত্যি যে তার অনেক গল্পে অদ্ভুত চরিত্র, ঘটনা বা বর্ণনা স্থান পেয়েছে যার কোনো বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিশোর বা সদ্য যুবক মনের উপযোগী করে লিখতে গিয়ে এমন সব উপাদান অনেকসময় চলে এসেছে যা না থাকলেই ভালো হত। সত্যজিৎ ছাড়া পরশুরাম এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ভিত্তিতে একটি করে ছবি দেখানো হয়েছে। সুনীলের মূল গল্প পড়া নেই। কিন্তু পরশুরামের রচনার চিত্ররূপ দেখে একেবারেই অপরিণত হাতের কাজ মনে হয়েছে। অথচ শাদামাটা গল্পেরও সার্থক চলচ্চিত্র রূপান্তর আমরা টি· ভি-তেই দেখেছি, যেমন 'দর্পণ', কিংবা 'এক কহানী'র কিছু সিরিয়ালে। আর 'কথাসাগর' সিরিয়ালে দেখেছি শ্যাম বেনেগালের হাতে কয়েকটি সেরা গল্পের মণিকাঞ্চন যোগ। আসলে দৃশ্য-শ্রাব্য একটি মাধ্যম হিশেবে চলচ্চিত্রে নিজস্ব যে ভাষা আছে, যা সত্যজিতের অনেক ছবিতেই প্রাণ পেয়েছে, তার উপর সন্দীপের এখনও তত ভালো দখল হয় নি।

> **সেরা চিঠি**
> **এই সংখ্যার সেরা চিঠির লেখক কলকাতা-৪-এর সোমেশ চট্টোপাধ্যায়**

সন্দীপ রায়ের প্রথম কয়েকটি ছবির বেলায় এত ক্ষুদে অক্ষরে কলাকুশলীদের নাম দেখানো হয়েছিল যে তা পড়তে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। পরে অবশ্য এই ভুলটা আর চোখে পড়েনি। শেষ করছি অন্য একটি প্রসঙ্গ দিয়ে। এই সিরিয়ালের বেশিরভাগ ছবিতেই গল্পকার এবং সংগীত পরিচালক হিশেবে সত্যজিৎ রায়ের নাম আছে। শুধু কি এ কারণেই সিরিয়ালের নামকরণে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে? নাকি এর পিছনে রয়েছে শুধু প্রযোজকদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য?

বিভাস ভট্টাচার্য
নাকতলা, কলকাতা ৪৭
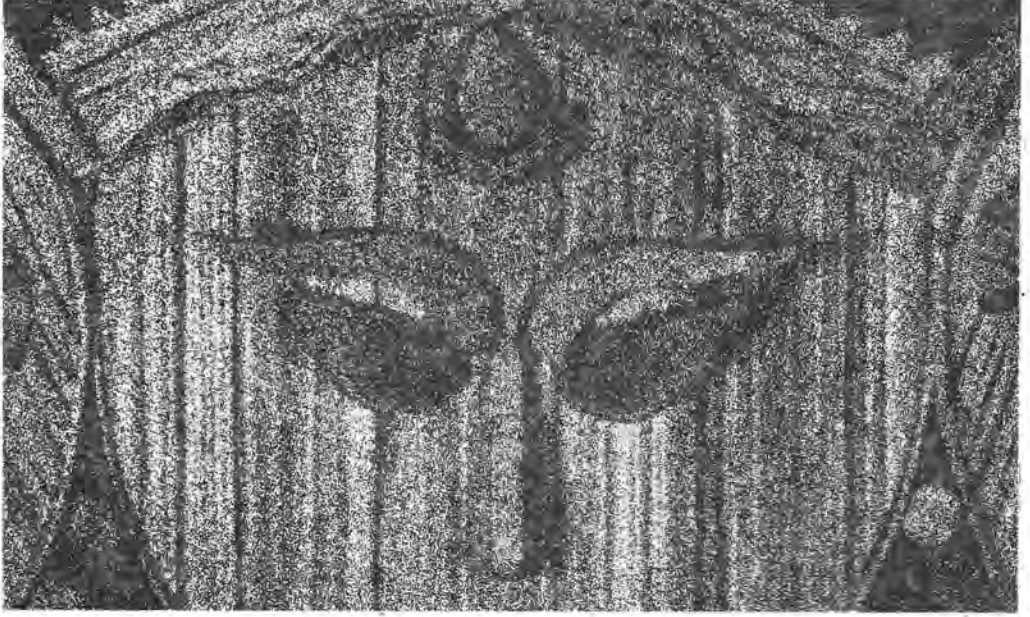
এবারের শারদীয় প্রতিক্ষণে কী কী থাকছে তা নিয়ে এখন থেকেই কৌতূহল নানা জনের। এমনকি অনেক পাঠক জানতে চেয়েছেন চিঠি দিয়ে। আসলে তাঁদের জানার ইচ্ছে ঠিক লেখক সূচি নয় ততখানি। জানতে চান বিষয়ের বৈচিত্র। এবারের শারদীয় প্রতিক্ষণে কার গল্প, কার উপন্যাস, কাদের কবিতা, কিংবা প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন কারা কারা সে সব প্রসঙ্গ এখুনি বিজ্ঞাপিত করতে চাইনা আমরা। প্রতিক্ষণ-এর উপর আস্থাশীল পাঠক অনায়াসেই ভেবে নিতে পারবেন, তাঁদের জন্যে সংকলিত হবে সেরা রচনাই। উপরি পাওনা হিসেবে পাবেন রবীন্দ্রনাথের এক গুচ্ছ অপ্রকাশিত চিঠি ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পত্রালাপের অসংখ্য নিদর্শন। আর এবারে রঙিন পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু দাম থাকছে গতবছরের মতোই ২০ টাকা মাত্র।

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩

দ্বিধাগ্রস্ত রাজনীতি—সমঝোতা না সংঘাত ?

এই প্রথম রাজ্য সরকারের এতদিন ধরে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়ে আসা কংগ্রেসের গণ্যমান্য নেতাদের সবাইকে দল বেঁধে রাজেশ পাইলট ও অগপ সরকারের বিধায়িনী দলপতি গোলক রাজবংশীকে ভাষণ দানের সুযোগ দেওয়া হয় ।

সন্তোষমোহন দেব

...দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব সম্প্রতি দুদিনের সফরে গুয়াহাটি এসেছিলেন । রাজ্য সরকারের কোনো মন্ত্রী তাঁর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে আসেন নি । এমনকি রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীও নয় । আসামের পর্যটন বিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ফলে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অফিসারদের সঙ্গেই তাঁকে সারতে হয় । অবশ্য এ নিয়ে সন্তোষমোহন দেবের কোনো খেদ ছিল না । সকৌতুকে সাংবাদিকদের জানান, অ গ প সরকারের মন্ত্রীদের এখনও রাজনৈতিক ও শিক্ষানবিসি চলছে । এসব ছেলেমানুষি সে জন্যেই ।

ইতিপূর্বে সন্তোষমোহন দেব যখন মন্ত্রী হিশেবে প্রথম তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র শিলচর আসেন, তখন দিশপুর থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকার জন্য সরকারি নির্দেশ গিয়েছিল । ফলে জিলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মচারীর অধিকাংশই স্থানীয় এম পি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন ।

গুয়াহাটি সফরকালে কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এক আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় রাজ্য সরকারের সকল মন্ত্রীকেই আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু কেউই তাতে সাড়া দেন নি ।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র আসামের দুই প্রতিনিধিই—কাছাড় জেলার সন্তোষমোহন দেব এবং কারবি আঙলং জেলার বীরেন সিং ইংতি রাজ্য সরকারের অসহযোগী ও বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন—অন্য মন্ত্রীরা কেউ নন । প্রতিবেশী মেঘালয়ের পূর্ণ সাংমা কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী হিশাবে যখন আসাম সফরে আসেন, তখন অসম গণ পরিষদ সরকারের সৌজন্য বোধের কোন অভাব হয় নি, পরিবহণ দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজেশ পাইলট তো রীতিমতো উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে গেছেন । অ গ প মন্ত্রী বিধায়করা বিভিন্ন ছোট বড় দলে বিভক্ত হয়ে বারে বারে পাইলটের কাছে গেছেন । দিনে রাতে অনেকটা সময় রাজেশ পাইলেটকে ঘিরে অ গ প বিধায়কদের ভিড় ছিল । ব্যাপার স্যাপার দেখে বহু সময় কংগ্রেসিরা দূরে সরে গেছেন । অ গ প মন্ত্রী বিধায়কদের সাথে কেন্দ্রীয় পরিবহণ প্রতিমন্ত্রীরএত দহরম মহরম দেখে তারা অনেকেই ভেবেছেন, রাজেশ পাইলট হয়ত রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক দূত হয়ে এসেছেন—কংগ্রেস (ই) শিবিরে অ গ প-কে ভিড়ানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে । দু-একজন অ গ প নেতাও সেই আশঙ্কা করেছিলেন, অবশ্য এই ধারণার কোনো সমর্থন এখনও পাওয়া যায় নি । তবে লক্ষণীয় যে রাজেশ পাইলট তার গুয়াহাটিতে অবস্থান-সূচী হঠাৎ একদিনের জন্য বাড়িয়ে নেন । রাজেশ পাইলটের অনুরোধে মাত্র বারো ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর জন্য অ গ প সরকার গুয়াহাটি থেকে তেজপুর ও ডিব্রুগড় পর্যন্ত পণ্যবাহী জাহাজ সার্ভিস 'চালু' করেন (এই সার্ভিস যে বহুদিন থেকেই চলছে এবং উদ্বোধনী সার্ভিস যে আদৌ তেজপুর বা ডিব্রুগড় যায় নি, সে অন্য কাহিনী) এবং এই প্রথম রাজ্য সরকারের এতদিন ধরে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়ে আসা কংগ্রেসের গণ্যমান্য নেতাদের সবাইকে দল বেঁধে রাজেশ পাইলট ও অ গ প সরকারের যৌথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা যায় । কংগ্রেস (ই) বিধায়িনী দলপতি গোলক রাজবংশীকে ভাষণ দানের সুযোগও দেওয়া হয় ।

রাজেশ পাইলট সত্যি সত্যিই কংগ্রেস (ই) হাইকমান্ডের সঙ্গে অসম গণ পরিষদের সেতুবন্ধন ঘটাতে এসেছিলেন কিনা, তার সত্যাসত্য নির্ধারণ এখনই সম্ভব নয় । তবে কংগ্রেস (ই)-র যে অংশ অসম গণ পরিষদ সরকারের সঙ্গে কোনোমতেই সংঘর্ষে যেতে চান না, এবং অ গ প সরকারকে অসমীয়া জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে গণ্য করে অসম গণ পরিষদের সঙ্গে এ আই ডি এম কে সুলভ ঘনিষ্টতর মিত্রতায় আবদ্ধ করতে আগ্রহী, প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-র পুনর্গঠিত কার্যনির্বাহক কমিটিতে তাদের সন্দেহাতীত আধিপত্য চোখে পড়ার মতো । কংগ্রেস (ই) হাইকমান্ড যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস

(ই) কমিটিকে অসম গণ পরিষদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার তাগিদ অনুভব করেছেন, তার সঙ্গে রাজেশ পাইলটের দৌত্যের সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। অসম গণ পরিষদ সরকার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজেশ পাইলটকে কেন অন্তরঙ্গ মিত্র বলে মনে করে, অথচ তারই সহযোগী অপর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব কেন বৈরী বলে গণ্য হন, তা অনেকের কাছে অবশ্যই একটি ধাঁধা। আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর গুয়াহাটি ও অন্যত্র আন্দোলনপন্থী ছাত্র যুবকদের বিজয় মিছিলে 'রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ' ও 'হিতেশ্বর শইকীয়া মুর্দাবাদ' ধ্বনি একই সঙ্গে যে শোনা গিয়েছিল, এই ধাঁধার উত্তর তার মধ্যে লুকানো রয়েছে। রাজীব গান্ধী চুক্তি স্বাক্ষর করে আন্দোলনপন্থী শক্তিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বলেই তাঁর প্রতি অসম গণ পরিষদের নেতারা কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাবোধ ভবিষ্যতে এই নবীন আঞ্চলিক দলকে তরুণ প্রধান মন্ত্রীর আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করে এ আই ডি এম কে-র মতো জাতীয় পর্যায়ে পুচ্ছবৃত্তির রাজনীতি করতে বাধ্য করবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এ কথা ঠিক যে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে অসম গণ পরিষদ যে তাদের নির্বাচনী অভিযানের সহযাত্রী তেলুগু দেশমসহ সকল বিরোধী দল থেকেই নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইছে, রাজীব গান্ধীর প্রতি দুর্বলতাই তার প্রধান কারণ। পূর্বতম মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া আন্দোলন শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছিলেন। সে জন্যেই শইকীয়ার নামে 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল। আসাম আন্দোলন তথা অসম গণ পরিষদের বিচারে রাজীব গান্ধী তাদের মিত্র, কিন্তু হিতেশ্বর শইকীয়া শত্রু। দিল্লির কংগ্রেস (ই) বন্ধু কিন্তু আসামের কংগ্রেস (ই) বৈরী। আর তাই রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত দূত হিশাবে আসাম আন্দোলনের নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলে আসাম কেবলমাত্র রাজীব গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে আঞ্চলিক দলের সরকার গঠনের ক্ষেত্র রচনায় যিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই রাজেশ পাইলট অসম গণ পরিষদ সরকারের কাছে অতি আদরণীয়। কিন্তু হিতেশ্বর শইকীয়ার ঘনিষ্ট বলে পরিচিত সন্তোষমোহন দেব অবাঞ্ছিত। অসম গণ পরিষদের সাথে মিত্রতামূলক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এঁরাই অন্তরায় সৃষ্টি করেন বলে অ গ প নেতারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগও করেছেন।

অসম গণপরিষদ দলকে সর্বভারতীয় বিরোধী রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে রাজীব গান্ধী সক্ষম হয়েছেন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির অবশ্য আসামের আন্দোলন সম্পর্কে কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু জনতা পার্টি ও ভারতীয় জনতা পার্টি আশা করেছিল আসামের আন্দোলনকারী যুব শক্তি রাষ্ট্রীয় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে শামিল হবে।

ইতিমধ্যে অসম গণ পরিষদ দলকে সর্বভারতীয় বিরোধী রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে রাজীব গান্ধী সক্ষম হয়েছেন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির অবশ্য আসামের আন্দোলন সম্পর্কে কোনো মোহ কখনোই ছিল না, কিন্তু জনতা পার্টি ও ভারতীয় জনতা পার্টি আশা করেছিল, আসামের আন্দোলনকারী যুব শক্তি রাষ্ট্রীয় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে শামিল হবে। তাদের সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 'ভারত বন্ধ' পালনকালে অসম গণ পরিষদের কর্মীরা তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছে। সংসদীয় বিতর্কেও রাজীব গান্ধীর প্রতি তাদের দুর্বলতা ধরা পড়েছে। এমনকি হরিজন হত্যার প্রতিবাদে বিরোধী সংসদ সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগেও তারা যোগ দেন নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কংগ্রেস (ই)-কে অসম গণ পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিশাবে গড়ে তুলতে রাজীব গান্ধীর আগ্রহের অভাব তাই অযৌক্তিক নয়। কংগ্রেস (ই)র পুরানো রাজনীতিকদের চাইতে অসম গণ পরিষদের নবীন নেতারা রাজীব গান্ধীর স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত রাখতে পারবে, এ-রকম একটি ধারণাও হয়ত গড়ে উঠেছে। রাজীব গান্ধী ও তার পার্শ্বচর হিশাবে যেসব অ-রাজনৈতিক তরুণ রয়েছেন, তাঁরা রাজনীতিকদের সান্নিধ্যে অস্বস্তি বোধ করেন। অ-রাজনীতিকদেরই তাঁরা বেশি বিশ্বস্ত মনে করে থাকেন। সেদিক থেকে অ গ প মন্ত্রী-বিধায়কদের প্রতি তাঁদের সহজাত আকর্ষণ বোধ করা স্বাভাবিক। লক্ষণীয় যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসম গণ পরিষদের বিকল্প কোনো রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র যাতে গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকে স্বয়ং রাজীব গান্ধী লক্ষ্য রেখেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসামের প্রতিনিধিত্ব বাছাই করতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া ভাষীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন।

প্রফুল্ল মহন্ত

বরাক উপত্যকার বাংলাভাষী সন্তোষমোহন দেব ও পার্বত্য অঞ্চলের কারবিভাষী বীরেন সিং ইংতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসামের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এতে অসম গণ পরিষদের নেতারাই সবচাইতে খুশি—তাঁদের রাজনৈতিক বিচরণ ভূমিতে এঁরা কেউই কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবেন না। এদিকে বরাক উপত্যকায় ভাষা নিয়ে, আর পার্বত্য অঞ্চলে পৃথক রাজ্য নিয়ে যে আন্দোলন, তা সামলানোর দায়িত্ব অনেকটাই এখন এই দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওপর এসে বর্তাবে। রাজীব গান্ধীর হিশেব হয়ত তাই-ই।

কিন্তু রাজনীতির হিশেব সব সময় যে মিলবেই, এমন কোনো কথা নেই। রাজীব প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কে যতই নমনীয় করে গঠন করুন না কেন, রাজ্যিক কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব যতই অসম গণ পরিষদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হোক কেন, ঘটনাপ্রবাহ তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলেছে। কংগ্রেস (ই) কে যদি আসামে তার নিজের পায়ে আবার দাঁড়াতে হয়, এবং অন্ততপক্ষে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিশাবে সংগঠিত হতে হয়, তা হলে ক্ষমতাসীন অসম গণ পরিষদ দলের সঙ্গে সংঘাতে তাকে আসতে হবেই।

রবিজিৎ চৌধুরী

জীবনদায়ী ওষুধ জীবন রক্ষার দায়িত্ব কে নেবে ?

জনসাধারণের যন্ত্রণা যতক্ষণ সম্পত্তি বা অন্য কোনো লেনদেনে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা কষ্টকর হলেও সহনীয়, কিন্তু যখন তা খাদ্য বা ওষুধকেন্দ্রিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

কয়েকদিন আগে মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে একটি বাড়িতে হঠাৎ একজন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় ডাক্তার রুগিকে পরীক্ষা করে রায় দেন, তাকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে ওষুধ 'গার্ডিনাল' দেওয়া প্রয়োজন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে বাড়ির লোকেরা নিকটবর্তী ওষুধের দোকানে গেলেন। পাড়ার দোকানে ওষুধটি পাওয়া গেল না। দোকানি জানালেন গার্ডিনাল রাখতে গেলে শিডিউল 'এক্স' লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। লাইসেন্স তিনি করান নি। তাই গার্ডিনালসহ যেকোনো প্রকারের জীবনদায়ী ওষুধ তিনি দোকানে রাখতে পারবেন না।

সরকার জীবনদায়ী ওষুধকে শিডিউল এক্স-এর আওতায় এনেছেন। শিডিউল এক্স লাইসেন্স করতে গেলে ৮০ টাকা বেশি জমা দিতে হবে। বেশি টাকা দিতে ওষুধ বিক্রেতাদের কোন আপত্তি নেই, আপত্তি অন্য জায়গায় জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি করতে গেলে প্রতিটি ওষুধের জন্য ডাক্তারের দেওয়া দু কপি প্রেসক্রিপশান জমা নিতে হবে।

জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি হচ্ছে একটি দোকানে

শিডিউল এক্স লাইসেন্স ব্যাপারটা কী, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় রুগির বাড়ির লোকেদের ছিল না। তাঁরা অন্য দোকানে ছুটলেন। কিন্তু সব জায়গায়ই এক কথা—গার্ডিনাল নেই, কারণ কোনো দোকানেই শিডিউল এক্স-এর লাইসেন্স নেই।

মধ্যমগ্রামে না থাকলে বারাসাতের দোকানগুলিতে শিডিউল-এক্স-এর পর্যায়ভুক্ত ওষুধ নিশ্চয় থাকবে। এই আশা নিয়ে বাড়ির লোক ছুটে গেলেন বারাসাতে। সেখানেও একই উত্তর, শিডিউল এক্স-এর কোনো ওষুধ দোকানে নেই। তাহলে গার্ডিনাল পাওয়া যাবে কোথায় ? সবাই এক বাক্যে কলকাতার দে'জ মেডিক্যালস বা নিউ মার্কেটের 'ব্লু প্রিন্টে'র নাম করলেন। ওরাই একমাত্র শিডিউল এক্স পর্যায়ভুক্ত জীবনদায়ী ওষুধ রাখে। কিন্তু সে-ওষুধ সেখানে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়েই বিক্রি করা হয়ে থাকে। তাহলে উপায় ? রুগি বাঁচবে কী করে

পরিবারটির ভাগ্য ভালো, রুগি সেদিন কোনোক্রমে বেঁচে যায়। পরিবারের লোকজন এরপর আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে এক মাসের মতো গার্ডিনাল নিউ মার্কেটের 'ব্লু প্রিন্ট' থেকে কিনে ঘরে মজুত করে রেখে দিয়েছেন।

গার্ডিনালের মতো জীবনদায়ী ওষুধ পাড়ার ছোট ছোট ওষুধের দোকানিরা রাখে না কেন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় মধ্যমগ্রামের রেমিডি মেডিসিন সেন্টারের মালিক শ্রীঅংশুমান দাস জানালেন, "অতি সম্প্রতি সরকার থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি করতে গেলে দোকানদারকে তার স্টক রেজিস্টার আপ-টু-ডেট রাখতে হবে। একদিন স্টক রেজিস্টার না লিখলে ড্রাগ ইন্সপেকটরের রোষের শিকার হবেন দোকানি। প্রত্যেক ওষুধের দোকানদারকে বার্ষিক লাইসেন্স ফি দিতে হয় ৮০ টাকা। সরকার জীবনদায়ী ওষুধকে শিডিউল 'এক্স'-এর আওতায় এনেছেন। শিডিউল এক্স লাইসেন্স করতে গেলে আরো ৮০ টাকা বেশি জমা দিতে হবে। বেশি টাকা দিতে ওষুধ বিক্রেতাদের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি অন্য জায়গায়। জীবনদায়ী ওষুধ বিক্রি করতে গেলে প্রতিটি ওষুধের জন্য ডাক্তারের দেওয়া দু কপি প্রেসক্রিপশন

"শিডিউল এক্স ড্রাগস-এর মধ্যে নেশার ট্যাবলেটও পড়ে। পাড়ার ছেলেরা এসে ট্যাবলেট চাইলে আমাদের উভয় সঙ্কট। প্রেসক্রিপশান ছাড়া দিলে ড্রাগ ইন্সপেক্টর গলা চেপে ধরবে, আর না দিলে পাড়ার ছেলেরা ঝামেলা বাধাবে। ...তাই সব ভেবে চিন্তে ঝামেলা এড়াতে আমরা শিডিউল এক্স লাইসেন্স নিই না।"

জমা নিতে হবে। এক কপি থাকবে দোকানে ড্রাগ ইন্সপেকটর এলে দেখাতে হবে, আরেক কপি জমা দিয়ে আসতে হবে ড্রাগ কন্ট্রোলারের অফিসে। অথচ জীবনদায়ী ওষুধের দাম খুবই কম। গার্ডিনাল ট্যাবলেটের দাম যেমন মাত্র ৬ পয়সা। বিক্রি হয় ৫টি কি ৬টি ট্যাবলেট প্রতি প্রেসক্রিপশনে। প্রেসক্রিপশন জমা রাখার সঙ্গে আছে তিন কপি করে ক্যাশ মেমো লেখার ঝামেলা। এক কপি খদ্দেরের জন্য, এক কপি দোকানে থাকবে ড্রাগ ইন্সপেকটরের পর্যবেক্ষণের জন্য এবং আরেক কপি পাঠাতে হবে ড্রাগ কন্ট্রোলার অফিসে। ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির উপক্রম। এতসব ফর্মালিটি বজায় রেখে দোকান সুষ্ঠুভাবে চালানো দায়। ওষুধ দিতে দেরি হলে খদ্দের যায় চটে, লাভ হয় কম এবং ব্যবসা মাথা ঠান্ডা রেখে চালানো কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়, বিশেষ করে দোকানে যখন ভিড় থাকে।"

অংশুমান দাসের সুরে সুর মিলিয়ে প্রায় সব ছোটখাটো পাড়ার দোকান এই প্রতিবেদককে একই উত্তর দিয়েছেন। ভি আই·পি-উল্টোডাঙার মোড়ে ব্যস্ত দোকান 'কেয়ার ড্রাগ হাউস'-এর মালিকের ছেলে বললেন, "শিডিউল 'এক্স' ড্রাগস-এর মধ্যে নেশার ট্যাবলেটও পড়ে। পাড়ার ছেলেরা এসে ট্যাবলেট চাইলে আমাদের উভয় সঙ্কট। প্রেসক্রিপশন ছাড়া দিলে ড্রাগ ইন্সপেকটর গলা চেপে ধরবে, আর না দিলে পাড়ার ছেলেরা ঝামেলা বাধাবে। তাছাড়া অনেক সময় কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি ঘুমের বড়ি চাইলেন। চেনা লোক, বুঝতে পারছি সত্যি সত্যি দরকার, কিন্তু দেবার উপায় নেই, না দিলে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ধরে চিড়। অথচ একটি ঘুমের ট্যাবলেটের জন্য ভদ্রলোকের পক্ষেও ডাক্তারকে ফিস দিয়ে প্রেসক্রিপশন যোগাড় করা বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই সব ভেবেচিন্তে, ঝামেলা এড়াতে আমরা শিডিউল 'এক্স' লাইসেন্স নিই নি।"

কলকাতায় কাঁকুড়গাছির মোড়ে 'জয়শ্রী মেডিক্যালস'-এ একই প্রশ্ন করেছিলাম। দোকানে বসা ভদ্রলোক জানালেন, "দেখুন, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, বদনাম কিনতে নয়। দশ পয়সার ওষুধের পাই-টু-পাই হিশেব ও প্রেসক্রিপশনের কপি না রাখার দায়ে জেল খেটে বদনাম কিনতে রাজি নই। শিডিউল এক্স লাইসেন্স না থাকায় ব্যবসায় অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শান্তিতে আছি। পাড়ার লোকেদের কটু মন্তব্য শুনতে হয় একথা যেমন সত্য, তেমনি পাশাপাশি ড্রাগ ইন্সপেকটরের চোখ রাঙানি থেকে আমরা মুক্ত।"

কাঁকুড়গাছি অঞ্চলের কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার ও পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রণব বোসকে এই সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "আমার জানা ছিল না পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ কন্ট্রোলার এমন একটি অবাস্তব ও জনবিরোধী লাইসেন্স প্রথা চালু করতে পারে, আমি কেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুও বোধহয় এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। আমার মতে সরকারের উচিত অবিলম্বে এই লাইসেন্স প্রথা বাতিল করা অথবা সব ওষুধের দোকানকে বাধ্য করা এই লাইসেন্স নিতে। আমি তো আমার কেন্দ্রের সমস্ত ওষুধ বিক্রেতাকে জানিয়ে দেব লাইসেন্স থাকুক ছাই না থাকুক, জীবনদায়ী ওষুধ দোকানে রাখতেই হবে অথবা কেউ চাইলে তা যেখান থেকে হোক এনে দিতে হবে। ড্রাগ ইন্সপেকটরের ঝামেলা এলাকার যুব কংগ্রেস সামলাবে। ওষুধের দোকানে যদি জীবনদায়ী ওষুধ না পাওয়া যায় তাহলে সেই দোকান পাড়ায় থেকে লাভ কী?"

সল্টলেক এলাকায় একটি মাত্র দোকান শিডিউল-এক্স লাইসেন্স করিয়েছে। দোকানের নাম 'আশা মেডিক্যালস'। লাইসেন্স নম্বর ২৯। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় দোকানের মালিক বললেন, সল্টলেক, উল্টোডাঙা, ভি আই পি রোড ও কাঁকুড়গাছির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শিডিউল এক্স লাইসেন্সধারী দোকান বলতে এই একটিই। শিডিউল এক্স লাইসেন্স করে সুবিধা বা অসুবিধা কী হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তরে আশা মেডিক্যালসের মালিক জানালেন, "সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হয়েছে বেশি। আলাদা ফাইল রাখতে হচ্ছে, প্রেসক্রিপশনের কপি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মাঝেমাঝে খদ্দেরের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। বলুন কোন খদ্দের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের জেরক্স কপি নিয়ে দোকানে ওষুধ কিনতে আসে? জীবনদায়ী ওষুধ; জেরক্স করিয়ে, দোকানে প্রেসক্রিপশন জমা দিয়ে বাড়িতে ওষুধ নিতে নিতে রুগি শেষ। অন্যদিকে প্রেশক্রিপশনের কপি না রেখে ওষুধ দিলে আমার হাতে ঝুলবে হাতকড়া। বলুন যাই কোথায়?"

প্রশ্ন করলাম, "শিডিউল এক্স লাইসেন্সের দৌলতে আপনার ব্যবসা নিশ্চয় আগের থেকে বেড়েছে?"

উত্তরে মালিক ভদ্রলোক বললেন, "তা হলে তো মনে কোনো ক্ষোভ থাকত না। আমরা, অর্থাৎ যাদের লাইসেন্স আছে, তারা শিডিউল এক্স ড্রাগস সরকারিভাবে রাখি, আর যাদের নেই তারা রাখে লুকিয়ে। বাংলাদেশের গার্ডিনালে বাজার ছেয়ে গেছে। তাছাড়া দেখুন না, শিডিউল এক্স লাইসেন্সের পর্যায়ভুক্ত ওষুধ যেমন ম্যানড্রেক্স, রেসটিল, হিপটোজেন, লিপাটোন অর্থাৎ সিডেটিভ ড্রাগস যেগুলি, ওষুধ প্রস্তুতকারকরা আর সেগুলি উৎপাদন করছে না। ফলে শিডিউল এক্স লাইসেন্স থাকাও যা, না থাকাও তা। ঝামেলা এড়াতে দে'জ মেডিক্যালসের মতো দোকান শিডিউল এক্স ড্রাগস বেচা বন্ধ করে দিয়েছে। নিউ মার্কেটের ব্লু প্রিন্টও একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে দিয়েছে শিডিউল এক্স ড্রাগসের জন্য। সকালে আপনাকে টাকা ও প্রেসক্রিপশনের কপি জমা দিতে হবে। তার বদলে দোকান থেকে আপনাকে একটি টোকেন দেওয়া হবে। দুপুরের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময় টোকেন দেখিয়ে আপনাকে ওষুধ নিতে হবে।"

শিডিউল এক্স-জনিত সমস্যা আজ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র। ওষুধ বিক্রেতাদের অ্যাসোসিয়েশন এ-ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মাঝে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘটে সর্বস্তরের ওষুধ বিক্রেতারা সাড়া দিলেও সরকার এখনো এ-ব্যাপারে নির্বিকার। যে সব দোকান শিডিউল এক্স লাইসেন্স করিয়েছে, তারা অ্যাসোসিয়েশন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওষুধ বিক্রেতাদের কাছে অচ্ছুৎ। তাদের ইতিমধ্যেই একঘরে করে দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। শিডিউল এক্স-এর জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষ নাজেহাল তাঁদের কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশী অথবা জাল ও চোরাপথে আসা ওষুধ, যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। সরকারের এই নীতিতে কোন পক্ষ লাভবান হয়েছে তা বলা মুশকিল, তবে হলফ করে বলা যেতে পারে ড্রাগ ইন্সপেকটরদের ভাগ্য গেছে খুলে। তাদের কাজ ও আমদানি, দুই-ই বেড়ে গেছে।

অরুণাভ ঘোষ

রেশন দোকান কর্মচারীদের নতুন সংগঠন

এই প্রথম কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন দোকান কর্মচারীরা 'কলকাতা রেশন দোকান কর্মচারী সমিতি' নামে একটি সংগঠন তৈরি করলেন গত তেইশে জুন তারিখে। বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকা ধরলে বিধিবদ্ধ রেশন দোকানের সংখ্যা এগারশ। এই এগারশ দোকানে কর্মরত আছেন প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। সাধারণভাবে, প্রতি দোকান পিছু অন্ততপক্ষে দুজন কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। একজন ক্যাশ দেখেন ও বিল-বই লেখেন। আরেকজন খাদ্যদ্রব্য ওজন করেন,

ফটো : মণীশ সেনগুপ্ত

রেশন দোকানের কর্মীরা

দোকানের পরিভাষায় যাঁদের বলা হয় 'ওয়েটম্যান'। বিভিন্ন রেশন দোকানে কর্মরত এই আড়াই হাজার শ্রমিক দীর্ঘকাল ধরেই এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বহু কর্মচারীই আছেন, যাঁরা দীর্ঘ কুড়ি, পঁচিশ বা তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্মরত থাকার পরেও আজও চাকরিতে স্থায়ী হন নি। এমনকি এই সমস্ত কর্মচারী আদৌ সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিতে কর্মরত কিনা, তারও কোনো প্রমাণপত্র এঁদের হাতে নেই। কারণ চাকরিতে নিয়োগের সময় এঁদের, এমনকি, অস্থায়ী নিয়োগপত্রও দেওয়া হয় নি। কাজেই, সহজেই অনুমেয় যে, এঁদের চাকরিরও কোনো স্থিরতা নেই। এমনকি, রেশন দোকান কর্মচারীদের মজুরিও অত্যন্ত কম। মাসের মজুরি গড়ে একশ পঁচিশ থেকে আড়াইশ, খুব বেশি হলে সাড়ে তিনশ থেকে চারশ টাকা। বলা বাহুল্য, এই তিনশ বা চারশ টাকা মজুরি দেবার মতন মালিকও মুষ্টিমেয়। এই সমস্ত কর্মচারীদের না আছে কোনো মহার্ঘ ভাতা, না আছে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা। বছরের পর বছর এই সমস্ত কর্মচারীদের একই মজুরিতে কাজ করে যেতে হয়। এমনকি পুজোর সময়ও বোনাস বলতে এঁদের কিছু নেই।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর 'ন্যূনতম মজুরি আইন' নামক একটি আইন জারি করেন। যাতে শুধু রেশন দোকান কর্মচারীরাই নন, সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দোকান কর্মচারীরই উপকৃত হবার কথা। এই আইনে দোকান কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনে প্রতিটি কর্মচারীর ঘণ্টা পিছু, দিন পিছু ও মাসান্তের মজুরি কত হবে, তা পৃথক পৃথকভাবে উল্লিখিত রয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা রেশন দোকানের 'ওয়েটম্যান', তাঁদের ন্যূনতম বেতন দেবার কথা মাসিক মোট ৪৯৫·১০ টাকা (বেসিক ২৯৯·১০ টাকা ও মহার্ঘ ভাতা ১৯৭ টাকা) এবং একজন ক্যাসিয়ারের বেতন হওয়ার কথা মাসিক মোট ৫৩১·১০ টাকা (বেসিক ৩৩৪·১০ টাকা ও মহার্ঘ ভাতা ১৯৭ টাকা)।

কিন্তু আইনের বিধান ও বাস্তব চিত্র যে একই কথা বলছে না, তা এই রিপোর্টের গোড়াতেই বলা হয়েছে। যেমন, ওয়াটগঞ্জ সাব-এরিয়ার একটি রেশন দোকানের কর্মচারী গোপাল সাহা মজুরি পান বর্তমানে ৩৫০ টাকা, তাঁর কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেছে। পুজোয় বোনাস পান ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ওয়াটগঞ্জের এই দোকানে তিনি আছেন প্রায় পাঁচ বছর, আগে অন্য একটি দোকানে তিনি পনেরো বছর কাজ করেছেন, তখন তাঁর মজুরি হয়েছিল ক্রমান্বয়ে ৮০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা।

রেশন দোকান কর্মচারীদের এই নানাবিধি অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে 'কলকাতা রেশন দোকান কর্মচারী সমিতি'র সভাপতি কাজী আবু তোরাব্ 'প্রতিক্ষণ'কে সক্ষেদে জানালেন, 'দীর্ঘকাল ধরে রেশন দোকান কর্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। আজকের যুগেও তাদের সামান্য মজুরির বিনিময়ে প্রায় ক্রীতদাসের মতো খাটানো হয়। এই সব কর্মচারীদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই, ভবিষ্যতের সঞ্চয় বলেও কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরেই এঁদের উপর যে অবিচার হচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার জন্যই এই 'কর্মচারী সমিতি' গঠন করা হয়েছে। যে কোনো রকম অন্যায়ের ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেই সমিতি আন্দোলন চালাবে। হাঁ, এটাও খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার দীর্ঘ আট বছর পরে এই আইন জারি করলেন। কিন্তু এই আইন যে এখনও ঠিক মতো মানা হচ্ছে না, তা দেখার দায়িত্ব কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নয়?' কাজী সাহেব আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে শুধুমাত্র কলকাতার রেশন দোকান কর্মচারীরাই এই সংগঠনের আওতায় এলেও ভবিষ্যতে সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রেশন দোকান কর্মচারীকেও এর আওতায় আনা হবে। বর্তমানে সংগঠনের সভ্যসংখ্যা খুব বেশি না হলেও আগামী ছ মাসের মধ্যেই আরও দু হাজার কর্মচারীকে এই সংগঠনের সভ্য করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে বলেও আবু তোরাব্ উল্লেখ করেন।

তাপস সিংহ

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন : এবার অন্ধ্রে

অন্ধ্রপ্রদেশ নব সংঘর্ষণ সমিতির পাঁচসপ্তাহব্যাপী আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমিতির ছাত্র প্রতিনিধিদের গোলটেবিল সম্মেলনে আহ্বান করেন। সেই সম্মেলন থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা বেরিয়ে আসেন।
এপিএনএসএস-এর নেতাদের বক্তব্য, ওরা সভা ত্যাগ করে, কারণ নিম্নবর্ণের ছাত্র প্রতিনিধিরা তাদের কুৎসিত ভাষায় মন্তব্য করেছিল এবং সরকার সভার ন্যূনতম বিধি নিয়ম মেনে চলে নি। তাদের মূল দাবি ছিল কার্যকরী আলোচনা। রামা রাও জানান আলোচনায় আবেদন ছিল সর্বসম্মতভাবে ছাত্ররা আন্দোলন প্রত্যাহার করুক।
যখন গোলটেবিল সম্মেলন চলছিল এপিএনএসএস-এর প্রায় ১০০০ ছাত্র সমর্থক সারা রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এপিএনএসএস হায়দ্রাবাদে তার প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ছাত্ররা মন্ত্রী ও বিধায়কদের ঘেরাও করেছিল, এবং স্বাধীনতা দিবস বয়কট করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল "জেল ভরো" ও "রাস্তা রোক" আন্দোলনের জন্য প্রচার, সভা করার।
রামা রাও সরকারের পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীগুলির জন্য "আসন সংরক্ষণ" ২৫ থেকে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তের ফলে সংরক্ষণ সমর্থকরা ১২ আগস্ট হায়দ্রাবাদে এক সমাবেশ করে। বিপরীত দিকে সংরক্ষণ বিরোধীদের ডাকে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি সফল "বন্‌ধ" হয়।
যেকোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই এটা বুঝে যাবে যে "সংরক্ষণের" মতো জাতীয় বিষয়টির সমর্থক ও বিরোধীদের বক্তব্যের পিছনে যথেষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।
পশ্চাদ্‌পদ বর্ণের ব্যাপারে রামা রাও-এর চূড়ান্ত সফলতায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও মণ্ডলের নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে বলেই কংগ্রেস(ই) সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আসন সংরক্ষণ বিরোধীদের সমর্থন করতে ভয় পাচ্ছে কংগ্রেস—পশ্চাদ্‌পদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে। অবশ্য ওরা রামা রাও-এর কার্যকলাপের নীরব দর্শকও থাকতে পারে না। রামা রাও-এর কায়দায় কংগ্রেস-এর টি. বালা গাউদ এম. পি., প্রাক্তন কং(ই) মন্ত্রী কোন্দা লক্ষ্মণ বাপুজি এবং লোকদলের নেতা গৌথু লাতচান্নার নেতৃত্বে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণী সংগঠন রক্ষার চেষ্টা করছে। সম্ভবত ১২ আগস্টের এ পি এস এস পি-র নেতৃত্বে রামা রাও সরকারের 'সংরক্ষণ কোটা'-র প্রস্তাব সমর্থন করে নি এবং মুরলিধর রাও কমিশনের রিপোর্টের রায় প্রয়োগ করতেও আপত্তি জানায়। বর্তমানে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চাদ্‌পদ বর্ণের জন্য পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে শতকরা ২০টি আসন সংরক্ষণ নীতির প্রতিবাদ জানায়। তারা মনে করে শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষণ করা উচিত। এ পি এস এস পি-রা মনে করে সরকারের উচিত ১২,০০০ টাকা আয়ের প্রান্তসীমা তুলে দেওয়া। তাদের মতে সংখ্যালঘু শ্রেণীগুলি অত্যন্ত কম পরিমাণ সুবিধা পেয়ে থাকে। আন্দোলনের আর একটি পর্যায় হল পশ্চাদ্‌পদ বর্ণের নেতারা একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

পশ্চাদ্‌পদ বর্ণের নেতারা একই সঙ্গে রামা রাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি সংরক্ষণ বিরোধীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের কোটা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং এ পি এন এস এস-এর আন্দোলনকারীদের শর্ত বাতিল করাটা লোক দেখানো ব্যাপার।

পশ্চাদ্‌পদ বর্ণের নেতারা একই সঙ্গে রামা রাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি সংরক্ষণ বিরোধীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের কোটা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং এ পি এন এস এস-এর আন্দোলনকারীদের শর্ত বাতিল করাটা লোক দেখানো ব্যাপার। এ পি এন এস এস নেতারা ১৪ আগস্টের গোলটেবিল সম্মেলনে যোগ দেয় নি। কারণ দলের সভাপতি টি বালা গাউদ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কোন্দা লক্ষ্মণ বাপুজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। কেবল মাত্র গৌথু লাতচান্না আমন্ত্রিত ছিলেন। কংগ্রেস(ই)-এর রাজ্য সভাপতি জে. ভেঙ্গল রাও আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি দিল্লিতে থাকেন, এই অজুহাতে কংগ্রেস(ই) সম্মেলনে যোগ দেয় নি।
সমস্ত আন্দোলনকারীর প্রতি রামা রাও-এর অনমনীয় মনোভাবের ফলে দুবছর আগে তামাক চাষী আন্দোলনকারীর দুজন নিহত হয়েছিলেন। সেই আচরণ রহস্যজনকভাবে এ পি এন এস এস আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কংগ্রেস(ই) পশ্চাদ্‌পদ জাতির নেতারা উল্লেখ করে বলে সংরক্ষণ বিরোধীদের আর একটি আন্দোলনেও রামা রাও-এর ভূমিকা খুবই নির্লিপ্ত। এই ব্যবহারের কারণ হিশেবে বলা যেতে পারে এ পি এন এস এস শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিল। যদিও ছাত্ররা আর টি সি-র বাস পোড়ানো, সরকারি অফিসে ও পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ধর্ণা গণ্ডগোল, এবং একাধিক বিধায়ককে পদত্যাগ করতে চাপ সৃষ্টি এবং বিধায়ক ও মন্ত্রীদের ঘেরাও করেছিল।
একই সঙ্গে আন্দোলনকারীরা তাদের জমায়েতে প্রচুর মহিলা চিকিৎসক নিয়ে আসে, ফলে খবরের কাগজ ও সাধারণ মানুষ ওদের প্রতি আগ্রহী হয়। এছাড়া যে সমস্ত স্লোগান তারা দিচ্ছিল তাতে তাদের বক্তব্য সকলের কাছে পৌঁছনটা খুবই সহজ হয়েছিল। ওদের প্ল্যাকার্ডে নার্সারি রাইমের মতো করে লেখা ছিল "Ding Dong bell, Merit in the well; who put it in, NTR's bill" আর একটা হল "Bah! Bah! black sheept, have you any seats; yes sir, yes sir, three seats full—One for the BC, One for the SC, One for the ST, but none for the FC (forward castes)".

যখন এ পি এন এস এস-এর আন্দোলনকারীরা ঘটনাচক্রে ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে, এ পি এস এস পি-র আন্দোলনকারীরা বিরক্ত হয়ে ১২ আগস্ট হায়দ্রাবাদ প্রেস ক্লাবের সামনে বিভিন্ন পত্রিকার কপি পোড়ায় এবং প্রেস বিরোধী স্লোগান দেয়। পরদিন এ পি এস এস পি-র নেতারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওদের কাজকে যুক্তিযুক্ত বলে এবং সাংবাদিকদের পক্ষপাত দুষ্ট ও সংরক্ষণ বিরোধী বলে আক্রমণ করে। এতে ক্ষুব্ধ সাংবাদিকগণ সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করেন। একজন পশ্চাদ্‌পদ নেতা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে এইসব রিপোর্টাররা সংরক্ষণ বিরোধীদের হয়ে কাজ করছে, বিশেষত তেলুগু প্রেস উচ্চ বর্ণের। তিনি বলেন 'যদি আপনারা মনে করেন একমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত, তবে আপনারাই বলুন পত্রিকাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে কজন পশ্চাদ্‌পদবর্ণের লোক রয়েছে ?'

মুকুন্দন সি মেনন

মাদ্রাজে তামিল গেরিলাদের সম্মেলন

২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই মাদ্রাজ শহরে এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের (এ এস এ) ব্যবস্থাপনায় এক আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, নেপাল, ফিলিপাইনস, পশ্চিম জার্মানি, নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। তামিল ইলমের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠিত করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই ছাত্র সংগঠন ইতিমধ্যেই বন, প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপীয় শহরে তামিল ইলমের সংগ্রামের সমর্থনে শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

সম্মেলনের মূল আলোচনা হয় ২ জুলাই। শ্রীলঙ্কায় আন্দোলনরত তামিল গোষ্ঠীগুলোর নেতৃবৃন্দ বিদেশী ছাত্র প্রতিনিধিদের সামনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। আগত ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে প্যালেস্তাইন ও ফিলিপাইনসের প্রতিনিধিরা ছিল সবচেয়ে বেশি উৎসাহী।

প্যালেস্তাইনের ছাত্র প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো তামিল ইলম সম্পর্কে কি ভাবেন। আলোচনায় উপস্থিত তামিল ইউনাইটেড লিবারেশান ফ্রন্টের নেতা যোগেশ্বরণ বলেন সি পি আই ও সি পি আই(এম) ওদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। সি পি আই(এম-এল) জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর ছাত্র সংগঠন র‍্যাডিকাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নও সমর্থন জানিয়েছে। সম্মেলনে ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের মাদুরাই আঞ্চলিক কমিটির নেতা উপস্থিত ছিলেন।

তামিল নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে ওরা ভারত সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়। এদের মতে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কোরিয়া, তাইওয়ান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে শ্রীলঙ্কা সরকার অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। উমা মহেশ্বরণ বলেন এটা খুব দুঃখের যে চীন সরকারও জয়বর্ধনকে অস্ত্র সাহায্য করছে।

তামিল নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে ওরা ভারত সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়। এদের মতে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কোরিয়া, তাইওয়ান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে শ্রীলঙ্কা সরকার অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। উমা মহেশ্বরণ বলেন এটা খুবই দুঃখের যে চীন সরকারও জয়বর্ধনকে অস্ত্র সাহায্য করছে। এই বক্তব্যে প্যালেস্তাইনি প্রতিনিধিরা বিস্মিত হয়ে বলেন চীন প্যালেস্তাইনি গেরিলা বাহিনীকে অস্ত্র সাহায্য করে। সেই চীনা অস্ত্রই প্যালেস্তাইন তামিল গেরিলাদের পাঠিয়েছে। এদিকে শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর হাতেও চীনা অস্ত্র। ঐ প্রতিনিধির মতে চীনের বর্তমান নেতৃত্বের ভুল লাইনের জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। সম্মেলনে সোভিয়েত

ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয় নি। সভায় শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে ভারত সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক এই দাবিতে এক প্রস্তাব আসে। কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ই আর ও এস-এর নেতা বালাকুমার বলেন যে ভারত সরকারের মধ্যস্থতার ভূমিকার জন্য গত নভেম্বরে থিম্পুতে বৈঠকও আরো আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তা মোটেই সুবিধাজনক হবে না।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য

লিবারেশান অর্গানাইজেশান অফ তামিল ইলম (এল, টি, টি, ই) তামিল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী এই দলটি ১৯৭২ সালে গঠিত হয়েছিল, তখন এর নাম ছিল তামিল নিউ টাইগারস। নেতার নাম ভি পিরাভাকরণ। এই গোষ্ঠীর সকলেই গলায় সুতো বেঁধে সায়নাইড অ্যাম্পুল ঝুলিয়ে রাখে যাতে পুলিশ বা সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করে অত্যাচার চালাতে না পারে।

পিপলস লিবারেশান অর্গানাইজেশান অফ তামিল ইলম (পি, এল, ও, টি, ই): মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী। এদের মতে তামিল ইলমের প্রথম লক্ষ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব করা। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রামের পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা। এরা সিংহলী জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে চায়। এদের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই গোষ্ঠীর নেতা উমা মহেশ্বর সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দৃঢ়তার সঙ্গে আলোচনা চালায়।

ইলম রেভ্যুলিউশানারি অর্গানাইজেশান অফ স্টুডেন্টস (ই, আর, ও, এস): ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে গঠিত হয়েছিল। এই গোষ্ঠী পুলিশ মিলিটারির পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে বেশি উৎসাহী। এদের নেতা স্বত্নাসভাপতি ও ভি বালকুমার।

ইলম পিপলস রেভ্যুলিউশানারি লিবারেশান (ই, পি, আর, এল, এফ) ১৯৮১ সালে গঠিত। এই গোষ্ঠী মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাস। এই গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট। এদের উদ্যোগে ইলম ন্যাশনাল লিবারেশান ফ্রন্ট (ই, এন, এল, এফ) গড়ে উঠেছে। এই দলের সেক্রেটারি জেনারেল হলেন কে পত্নানরা।

তামিল ইলম লিবারেশান অর্গানাইজেশান (টি, ই, এল, ও) তামিল উগ্রপন্থীদের সবচেয়ে পুরনো সংগঠন। ১৯৬৯ সালে গঠিত হয়েছিল। এই দলের সবচেয়ে বড় অ্যাকশান ১৯৮১ সালের ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে ৮১ লক্ষ টাকা লুঠ। ভারতের রিসার্চ এন্ড এ্যানালিটিকাল উইং-এর সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সিংহলী পুলিশ এদের অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে জানতে পারে যে এই দলের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং ভারতে হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি দলের মধ্যে লিবারেশান টাইগার ও প্লট সবচেয়ে বেশি সংগঠিত ও ক্ষমতাশালী। বিদেশ প্রবাসী শ্রীলঙ্কার তামিলরা এই গোষ্ঠীগুলোকে অর্থ সরবরাহ করে।

কেরালায় নির্বাচনের হাওয়া জমে উঠছে

> **মার্কসিস্ট নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলি এই বলে প্রচার চালাচ্ছে যে কংগ্রেস(ই)-এর প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে আপাতত করার কিছুই নেই। তাদের ধারণা, কংগ্রেস(ই) চালাকির খেলা খেলছে। করুণাকরণের নেতৃত্বে কংগ্রেস(ই) মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে সত্যিই কোনো রদবদল আনতে পারবে কি ?**

মুখ্যমন্ত্রী কে করুণাকরণের ঘনিষ্ঠ মহল যদি ঠিক ঠিক বুঝে থাকেন, তাহলে রাজ্য সরকার অক্টোবরের মধ্যেই নির্বাচন করবেন। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে না। এম ভি রাঘবনকে দল থেকে বহিষ্কারের সূত্রে সি পি আই(এম)-এর মধ্যে যে ভাঙন প্রকট হয়ে পড়েছে, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এখন সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যদিও তাঁর মন্ত্রীত্বের পাঁচ বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি, তথাপি, দেরি না করার ব্যাপারে তিনি স্থিত-সংকল্প। তাঁর এই তড়িঘড়িতে দলের কেউ কেউ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস(ই) মুখ্যমন্ত্রী, মার্ক্সবাদী পার্টির ভাঙনে লেফ্‌ট ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের (এল ডি এফ) সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং উদ্যমের অভাবজনিত হাওয়াকে নির্বাচনের পক্ষে অনুকূল বলে মনে করছেন। রাঘবনের সদ্যোজাত 'কম্যুনিস্ট মার্কসিস্ট পার্টি'ও তাঁর এখনো পর্যন্ত স্বস্তির বিষয়। যদিও, সে পার্টির প্রধান রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেস(ই)।

এখন প্রায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আগাম নির্বাচন হতে চলেছে। এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলির জোটবদ্ধতার প্রশ্নটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সি ভি পদ্মরাজন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন—কংগ্রেস(ই)-এর নেতৃত্বাধীনে ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট এই নির্বাচনে মোকাবিলা করলে এখনকার মতো কম্যুনিস্ট বিরোধী হয়ে থাকলে চলবে না। তিনি আরো বলেন, যে সব দলের মতি-গতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তারা ফ্রন্টে জায়গা পাবে না। ফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি তথা নৈতিক রদবদল হবে বলে তাঁর কাছ থেকে যে আভাস পাওয়া গেছে, এখন সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

সভাপতির মতে, ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি নিয়ে ফ্রন্টের ভাবনা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যাঁরা রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বকে স্বীকার করেন এবং একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এমন দলগুলিকেও ফ্রন্টে স্থান দিতে হবে।

কে পি সি সি-র সভাপতির এই বিবৃতি নানা ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। তার থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেরোলা কংগ্রেসকে আগামী নির্বাচনের অংশীদার করা হচ্ছে না। সেটা তার কেন্দ্রবিরোধী রণভঙ্গি এবং কেন্দ্রকে লড়াইয়ের হুমকি দেওয়ার জন্যেই। এদিকে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি প্রকাশ্যে যত হাত কচলানোর ভাব থাকুক না কেন, মুসলিম লীগ কিন্তু মোটেই কেন্দ্রবিরোধী নয়।

পদ্মরাজনের বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেস(ই) এমন সব দলের সঙ্গে তার মৈত্রী বা সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী, যারা তার কর্মসূচি ও কূটনীতিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। কাজেই কেরালা কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ যে এক্ষেত্রে কংগ্রেস(ই)-কে তুষ্ট করে চলবে তাতে সন্দেহ কি ? খোলাখুলি ঘটনা এরকমই যে, কংগ্রেস(ই)-এর কাছে মুসলিম লীগ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসল, যা কেরালা কংগ্রেস করে নি।

তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, প্রেসিডেন্টের মন্তব্যগুলি থেকে একটি জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে—কংগ্রেস(ই) ও তাহলে তার নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক দলগুলিকে তার ফ্রন্ট তফাতে রাখতে চায় ? মার্কসিস্ট নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলি এই বলে প্রচার চালাচ্ছে যে, কংগ্রেস(ই)-এর প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে আপাতত করার কিছুই নেই। তাদের ধারণা, কংগ্রেস(ই) চালাকির খেলা খেলছে।

এখন প্রশ্ন, করুণাকরণের নেতৃত্বে কংগ্রেস(ই) মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে সত্যিই কোনো রদবদল আনতে পারবে কি না। বোঝা যাচ্ছে, কেরালা কংগ্রেসকে ঢুকতে না দেওয়াটা তাঁর একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু রদবদল আনতে গেলে ফ্রন্টকে ঢেলে সাজাতে হবে।

তাহলে এটা কি একটা নির্বাচনী চমক ? আর এর লক্ষ্যও হলো নির্বাচনের আগে টিকিট বিলি করার সময় যারা লম্বা লম্বা দাবি তোলে, সেই সব দলগুলিকে পোষ মানিয়ে রাখা ? ইতিমধ্যে সি পি আই(এম)-এর লেফ্‌ট ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট হতাশায় ভুগতে শুরু করেছে। এম ভি রাঘবনের ঘোষিত নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি ওই নেতাদের মর্মাহত করেছে। নইলে তাঁরা কেন বলে বেড়াবেন যে, 'পার্টি থেকে বেরিয়ে যাবার পর, রাঘবনের পিছনে একটা নেড়ি কুত্তাও যাবে না।'

দুজন নামকরা মার্ক্সবাদী নেতা ইতিমধ্যে তাঁর দলে ভিড়েছেন। তাঁর আশা ছিল আরো বেশি। যে সমাবেশে রাঘবনের নতুন দল গঠনের খবর প্রকাশ করা হয়, সেখানে প্রায় দু হাজার ব্যাজধারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরেকটি সমাবেশ করার তালে আছেন, তাতে নাকি আরো বেশি অতিথির সমাগম হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিকভাবে মার্ক্সবাদী পার্টির সাধারণ স্তর থেকে তাঁকে উৎসাহিত করা হয় তবু, রাঘবন কিন্তু সে লোক নন। কথা একটু বেশি বলতে ভালোবাসলেও দলে থাকাকালীন তিনি ছিলেন রীতিমত করিৎকর্মা, ইমেজয়ালা। অনেক কমরেডই তাঁকে জনগণের নেতা হিশেবে প্রয়াত এ কে গোপালানের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এখন তাঁর এই নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি সত্যি সত্যি এল ডি এফ-এর নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। কেরালার মালাবার অঞ্চলটিতে মার্কসিস্টদের আধিপত্য। কিন্তু সেখানেও রাঘবনের বেশ কিছু সমর্থক আছে। ৩০ জন মার্ক্সবাদী বিধায়কের ১৭ জন সেখানকার। সেই অর্থে, সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বের প্রতি তার বিদ্রোহের পর তিনি দলীয় যুবকদের মধ্যে দ্বিধা সৃষ্টি করে দেওয়ার কাজে অনেকটাই সার্থক। এবং সেটাই এখন নেতৃত্বের স্তরে দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন নিশ্চয় করে বলা যায় না মার্কসিস্ট দলে কে কে থেকে গেলেন। কারণ কে কখন আবার রাঘবনের দলে গিয়ে ভিড়বেন তার ঠিক নেই। তবে এটা সত্যি যে, মার্ক্সবাদী দলে এখন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। শুরুতে, এই দলের রাজ্য সম্পাদক ভি এম অচ্যুতানন্দন এবং অন্যান্যরা রাঘবনের বেরিয়ে যাওয়াকে ঠাট্টা করে, দলের পক্ষে 'মলত্যাগ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা কি তাই ? মলত্যাগের দরুন যে শারীরিক স্বস্তি পাওয়া যায়, সে স্বস্তি তাদের কই ? তার বদলে শুধুই ভয়। শুধুই অবিশ্বাস। তারা এখন বাজিয়ে না দেখে কোনো পার্টির কমরেডকেই দলভুক্ত করবে কি ?

জি এস কারথা

পাকিস্তানে ফিলিপাইনস-ফর্মূলা

পাকিস্তানে নতুন করে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে গত ১৪ই আগস্ট । সামরিক শাসক জিয়া-উল-হকের কারাগারে বেনাজির-সহ অন্যান্য নেতারা বন্দী । কিন্তু প্রতিবাদ থামে নি । অন্যদিকে, মুভমেন্ট ফর দ্য রেস্টরেশন অব ডিমোক্রেসি-র মধ্যে মতপার্থক্য । আবার বেনাজির-পরিচালিত পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির ভেতরও বিদ্রোহ—দুই প্রবীণ নেতা ২৪ অগাস্ট নতুন দল গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন । বেনাজিরের রাজনীতিতেও স্ববিরোধিতা আছে । তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারি পাকিস্তানি মতের সমর্থক । সিয়াচেন হিমবাহতে পাকিস্তানি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা । 'আজাদ' কাশ্মীরের কথা তিনি বার বারই বলেন । বেনাজিরের নেতৃত্বে পাকিস্তানে কি সত্যিই কোনো বৈপ্লবিক বদল আসবে ? নাকি, এই এলাকায় মার্কিনি ঘাঁটিতে তিনি কেবল জনসমর্থিত ক্রীড়নক মাত্র ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি পাকিস্তানে বেনাজিরকে কাজে লাগিয়ে ফিলিপাইনস্ ফর্মূলাই প্রয়োগ করতে চাইছে ?

গত ১৪ অগাস্ট থেকে পাকিস্তানে নতুন করে অসন্তোষ শুরু হয়েছে । মুভমেন্ট ফর রেস্টরেশন অব ডিমোক্রেসি-র নেতারা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসকে বেছে নিয়েছিলেন দাবি জানাবার দিন হিশেবে । তাঁরা চান, জিয়া-উল-হকের সরকার ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘোষণা করুক, আগামী শরতে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানে । সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি বিরোধীদের এই দাবি মেনে না নেন, তাহলে 'মুভমেন্ট' নেতাদের পরিচালনায় সারা দেশ জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হবে ।

চোদ্দ তারিখ লাহোরের শহীদ মিনারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জুনেজো-রও বক্তৃতা দেবার কথা ছিল । কিন্তু বেনাজির-ঘাউস বকস-এর নেতৃত্বাধীন 'মুভমেন্ট'-ও সেদিন সমাবেশের ডাক দেয় । হাজার হাজার মানুষের পদযাত্রা ছিল বিরোধীদেরই ঐ মিটিঙের দিকে । জুনেজোর মুসলিম লীগ আহুত সভায় লোকজন হবে না, এমন আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তাঁর মিটিং বাতিল করে উদ্যোক্তারা ।

অথচ এই জুনেজোই 'টাইম' পত্রিকায় (অগাস্ট ৪, ১৯৮৬) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বেনাজিরের প্রচার যত এই মার্কিন মুলুকেই । আপনারা আমেরিকায় বসে ভাবেন, বেনাজিরই বুঝি পাকিস্তান রাজনীতির কেউকেটা । (গত এপ্রিল মাসে) সে বিদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন ছেড়ে লাহোরে এসে ভেবেছিল, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বুঝি তার সঙ্গে আছে আর নেমেই সে সমস্ত উল্টোপাল্টা করে দেবে । কিন্তু মাসের পর মাস গেছে । কিছুই হয় নি । পাকিস্তানের সামনে এখন বড় সমস্যা দুটো—সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা । আমি ও দুটোই করে দিয়েছি । ফলে, বেনাজিরের করবার আর কী-ই বা আছে ?" (পৃষ্ঠা ২৩) ।

এই সাক্ষাৎকার দেবার পর ঠিক দশ দিনের মাথায় বেনাজিরদের ডাকা সভার হুমকিতেই জুনোজোকে নিজের ঘোষিত সভা থেকে পালিয়ে যেতে হলো ।

জিয়ার সরকার দাবি করছে, জনসাধারণের রায়ে তিনি নাকি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবার অধিকারী । বিরোধীদের বক্তব্য ১৯৮৫-র ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ও বয়কটের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ১৯৭৩ সালের সংবিধানের বিরোধী ও পরিপন্থী । আইনবিরুদ্ধ । জিয়ার ক্ষমতাসীন থাকবার জেদ ও জিয়া-বিরোধী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের তীব্রতাই পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে । ফলে, ১৯৬৫-তে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ও ১৯৭১-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জেনারেল জিয়াও এখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সামরিক শাসন, বা বলা উচিত জিয়া-বিরোধী, বিক্ষোভ দমনে রাস্তায় নেমে পড়েছেন । মৃতের সংখ্যা শতাধিক । বেনাজির নির্জন কারাগারে বন্দী । ধৃত 'মুভমেন্ট'-এর প্রায় সমস্ত প্রথম সারির নেতারা ।

পাকিস্তানে জিয়ার সামরিক শাসনই, প্রাক্তন শাসকদের তুলনায়, এখন দীর্ঘতম । আইয়ুব খানের রাজত্ব ছিল চার বছর—১৯৫৮-র অক্টোবর থেকে ১৯৬২-র জুন পর্যন্ত । ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন তুলে নিজের

তৈরি এক সংবিধান চাপিয়ে দেন দেশের ওপর ; সে সংবিধান অনুযায়ী 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রধান পদক্ষেপ হলো দলহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন।

ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯-র মার্চে ক্ষমতা দখল করলে স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুব প্রবর্তিত সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খানই প্রথম পাকিস্তানের ইতিহাসে ব্যক্তিপ্রতি-একভোট ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন করেন ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে। কিন্তু জয়ী দলকে ক্ষমতা দিতে গররাজি থাকায় পশ্চিম পাকিস্তান-পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের অবসান ঘটে ভুট্টোর আমলে, ১৯৭২ সালে। ১৯৭০-এ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রথমে ভুট্টো প্রধান সামরিক শাসকই ছিলেন। ১৯৭১-র ডিসেম্বরে বাংলাদেশ হবার পর তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ সালে নতুন সংবিধান ঐকমত্যে গৃহীত হলো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে।

জেনারেল জিয়া-উল-হক-কে সামরিক বাহিনী সর্বাধিনায়কের পদে নিয়োগ করেন ভুট্টোই, সাতজন সিনিয়র জেনারেলকে টপকে। সেই জিয়াই ১৯৭৭-র ৫ই জুলাই ভুট্টোকে অপসারিত করে ক্ষমতায় আসেন। ১৯৭৩-এর সংবিধান বাতিল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। জিয়া ও তাঁর সমর্থকদের যুক্তি ছিল, ১৯৭৭-এর মার্চে সাধারণ নির্বাচনে যথেচ্ছ কারচুপি হয়েছে।

জিয়ার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি ছিল, ৯০ দিনের ভেতরই নির্বাচন হবে। ১৯৭৭-র ১৮ অক্টোবর নির্বাচনের দিন হিশেবে ঘোষিত হয়। কিন্তু নির্বাচন হলো না। জিয়া নভেম্বরেই সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের মতপার্থক্য তখন তুঙ্গে। সেই সুযোগে জিয়া ১৯৭৯-র ৪ঠা এপ্রিল ভুট্টোর ফাঁসি দিলেন। ভুট্টোর মৃত্যু পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নতুন চেতনা আনল—যৌথভাবে না এগুলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়া অসম্ভব। সেই চেতনারই ফল হিশেবে ১৯৮১-র ৬ই ফেব্রুয়ারি ১১টি দলের যৌথ সংগঠন তৈরি হয়—মুভমেন্ট ফর দ্য রেস্টরেশন অব ডিমোক্রেসি (এম· আর· ডি·)।

১৯৮১-৮২ জুড়েই এম. আর. ডি. নেতারা ছিলেন কারারুদ্ধ। ১৯৮৩-র ১৪ আগস্ট এম. আর. ডি. গণ-আন্দোলনের ডাক দিল। তার দুদিন আগে জিয়া ১৯৮৫-র মার্চের মধ্যে শাসনক্ষমতা অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার কথা বললে বিরোধীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। আন্দোলন তীব্র চেহারা নেয়, কিন্তু জিয়া ডিসেম্বরের মধ্যেই ঐ আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দিলেন। ১৯৭৩-এর সংবিধান ফিরিয়ে আনা হোক, বিরোধীদের এই দাবিও স্বভাবতই আর পাত্তা পেল না।

দেশের মানুষ তাঁকেই রাষ্ট্রপতি চায়, ১৯৮৪-র ১৯ ডিসেম্বরে এক বিতর্কিত 'জনমত' নিয়ে জিয়া বলে দিলেন, আগামী পাঁচ বছর তিনিই রাষ্ট্রপতি থাকবেন—অর্থাৎ ১৯৯০ সাল অব্দি তাঁর আসন 'নিরাপদ'।

১৯৮৫-র শুরুতে এক দলবিহীন নির্বাচনের ডাক দিয়ে, নির্বাচন করিয়ে, নিজের পছন্দমত ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে, ডিসেম্বরে সাড়ে আট বছর শাসনের 'অবসান' ঘটালেন, নিজে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে বহাল রইলেন। জিয়া প্রথমেই বলে দিয়েছেন, 'নির্বাচিত' সরকার কথা না শুনলে সামরিক শাসন ফের আসবে।

বিরোধীদের যৌথ সংগঠন এম. আর. ডি. চায়, ১৯৭৩-র অসংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হোক ; কিন্তু জিয়া তা মানতে নারাজ। এই বিরোধিতা থেকেই এম. আর. ডি.-জিয়ার মধ্যে শেষতম লড়াই শুরু।

কিন্তু এম. আর. ডি.-র মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে। যেমন সবচাইতে বড় দল পি· পি· পি·-র সঙ্গে পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি ও ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক পার্টির সম্পর্ক ভাল ; অন্যদিকে আসগর খান পরিচালিত তেহরিক-ই-ইশতিকলাল দলের তেমন বনিবনা নেই। পাকিস্তানের রাজনীতিতেও 'ভুট্টোবাদ' প্রয়োগে পি. পি. পি.-তেও মতপার্থক্য আছে। নতুন যুবশক্তি ও প্রাচীন নেতাদের ভেতর আন্দোলন সম্পর্কিত মতামত আলাদা। তারই পরিণাম হিশেবে আন্দোলনের মূল এলাকা সিন্ধ-এ দলের সভাপতি গুলাম· মুস্তাফা জাটোইকে বেনাজির সরিয়ে দিয়েছেন।

জাটোই এবং অন্য এক নেতা গুলাম মুস্তাফা খার পি. পি. পি. থেকে বেরিয়ে নতুন দল করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন লন্ডনে ২৪ অগাস্ট। সে দলের নাম হচ্ছে 'পিপলস্ পার্টি'। জাটোই ও খার বেনাজিরকে স্বৈরাচারি বলেন। তাঁদের মতে, ভুট্টোর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁরাই। বেনাজিরের কোনো অধিকার নেই আন্দোলনে

ধৃত আইনজীবি

ছবি : টাইম-এর সৌজন্যে

নেতৃত্ব দেবার।

কিন্তু বেনাজির কোন রাজনীতিতে নেমেছেন ? সত্যিই কি তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানে কোনো বিপ্লব হতে চলেছে ? নাকি, ফিলিপাইনসের কোরাজন অ্যাকুইনোর মতো, তিনিও মার্কিনি কর্তৃপক্ষের ঘোড়ার চাল—বেকায়দা দেখলেই জিয়াকে সরিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় বসাতে যারা দ্বিধা করবে না ?

প্রথমেই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা সংক্রান্ত মার্কিনি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্টিফেন জে সোলারজ্-এর পাকিস্তানে নির্বাচন ব্যাপারে মতামত খতিয়ে দেখা দরকার। পাকিস্তান ঘুরে গিয়ে, বি·বি·সি-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সোলারজ স্পষ্ট জানালেন, পাকিস্তানে নতুন নির্বাচন হওয়া উচিত। পাকিস্তান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাঁটছড়া যে কত শক্ত করে বাঁধা, তা সকলেরই জানা। একদিকে আফগানিস্তান অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে গোলমাল তৈরির মূল কেন্দ্র এখন পাকিস্তান। কিন্তু মার্কোস যেমন এতদিন মার্কিনিদের বন্ধু থেকেও এখন আর এত বন্ধু নন, জিয়াকেও কি মার্কিনিরা ঐ একই চোখে দেখছে ? তা না হলে জিয়ার বিরুদ্ধে, বিরোধীদের নতুন নির্বাচনী দাবিকে সোলারজ্ হঠাৎ এমন সমর্থন জানালেন কেন ?

আসলে ভিয়েতনাম বা ইরানের পর মার্কিনি কর্তৃপক্ষ আর কোনো বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁরা সমস্ত বিকল্পই খোলা রাখছেন এখন। ফিলিপাইনসে তাঁরা মার্কোস, অ্যাকুইনো—দুই ফ্রন্টই খোলা রেখেছিলেন। যখন জনরোষের প্রকাশে বোঝা গেল, ওখানকার মানুষই আর মার্কোসকে চাইছে না, তখন আরও নির্ভরযোগ্য কোরাজন অ্যাকুইনোকে বসানো হলো মার্কিনি উদ্যোগেই। মার্কিনিরা মার্কোসকে নিরাপদ আশ্রয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এখন সুবিক বে-র মার্কিনি নৌঘাঁটি ও ক্লার্ক এয়ারবেস নিরাপদ ; অ্যাকুইনোকে দিয়ে সবচাইতে পরিকল্পিত কমিউনিস্ট- নিধন চলছে এখন ফিলিপাইনসে।

পাকিস্তানেও বিকল্প খোলা রাখতে চাইছে আমেরিকা। তাই জিয়ার বিরুদ্ধে 'মুভমেন্ট' নেতাদের নির্বাচনী দাবি সমর্থন করলেন সোলারজ্। গত এপ্রিলে বেনাজির পাকিস্তানে ফিরে আসবার পর তাঁকে ঘিরে তুমুল জনসমর্থন গড়ে উঠতে থাকে। চোদ্দ অগাস্টের শেষতম বিক্ষোভ তার উদাহরণ। বেনাজিরের মুক্তিও চেয়েছে আমেরিকা। সোলারজ-এর মন্তব্য, মার্কিনি প্রশাসনের বেনাজির- সংক্রান্ত মতপ্রকাশে কি মার্কিনি নীতির গূঢ় বদল বোঝা যাচ্ছে ? থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় সফল হয়ে নবতম সাফল্যে উৎসাহিত মার্কিনিরা কি পাকিস্তানে ফিলিপাইনস- ফর্মূলা প্রয়োগ করতে চাইছে ?

সুমিত্র দেশপাণ্ডে

আজিজুল-বিশ্বনাথসহ

৬৪ জন নকশাল বন্দীর মুক্তি না দেয়া রাজনৈতিক অপরাধ

শুভাশিস মৈত্র

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট গত প্রায় দশ বছরের রাজ্যশাসনে ৪৩৪টি দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো নির্বতনমূলক আইন তাঁরা এ রাজ্যে প্রয়োগ করেন নি। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস(ই)-র কোনো আন্দোলন প্রতিহত করতে বামফ্রন্ট সরকার কোনো পুলিশি ব্যবস্থা নেন নি। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশের গোপন রিপোর্টের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার তুলে দিয়েছেন। এই সমস্তই দেশের নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রসারিত করেছে।

এরই সঙ্গে এ-কথা অবশ্যই উল্লেখ করা কর্তব্য যে বামফ্রন্ট গত দশ বছরে এ রাজ্যে সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রায় স্বস্তি দিয়েছেন। ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘুরা পশ্চিমবঙ্গকে তাঁদের পক্ষে নিরাপদতম রাজ্য মনে করেন। যে-দ্রুততায় ও ঐকান্তিকতায় বারবার দাঙ্গার হুমকি এই সরকার ঠেকিয়েছেন, তা, অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ।

কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারই নকশালপন্থী বলে পরিচিত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রতিশোধের নীতি গ্রহণ করেছেন ও সেই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন অবিচলিতভাবে।

বর্তমানে এই গোষ্ঠীর মোট ৬৪ জন বন্দী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলখানায় আছেন। তাঁদের মধ্যে আজিজুল হকের মুক্তি দাবি করে বাংলা দৈনিক 'আজকাল' কিছুদিন আগে প্রচার শুরু করে। সেই প্রচারের সূত্রেই জানা যায়—আরো কয়েকজন বন্দী আজ মৃত্যুর মুখোমুখি। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অসুস্থতার কারণ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে পুলিশের বেআইনি, গোপন অথচ সুবিদিত অত্যাচার

পুলিশের এই অত্যাচারের অধিকার ও ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্যে তখনকার রাজনৈতিক কর্মীদের জেলখানায় নৃশংস অত্যাচার করা হত। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা বারবার জেলের

"আমি মেদনীপুর থেকে রাজবন্দীদের ডাক্তার হয়ে যাই। আলিপুরে এসেও সেই কাজ করতাম। ...একদিন আমি জেল-হাসপাতালে সাধারণ কয়েদীদের দেখতে গেছি, সেখানে একটি অতি কম-বয়সের ছেলেকে দেখি। নাম জিজ্ঞেস করতে বললে, ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়। 'কি মামলায় জেল হয়েছে ?' 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায়।' আমার বুকটা ফেটে পড়তে চাইল।... আমি সাধারণ পোশাকে। আর সে ? সাধারণ কয়েদীর পোশাকে। কী করেছে সে অপরাধ ? আমি ও সে তো এক কাজের কাজী। কেন তাদের হেয় করবে ওরা ? কী অধিকার আছে ঐ বঞ্চক বিদেশীদের ? ঐ পরস্বাপহারীদের ? ...বিদ্রোহে, ক্ষোভে, ক্রোধে, মন গরগরিয়ে উঠল।"

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভিতরে আন্দোলন করেছেন। যতীন দাশের মহামরণ সেই রাজবন্দীর মর্যাদার দাবি করে অনশনের ফল। হিজলি বন্দীশালায় রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আন্দামানে রাজবন্দীরা যখন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জানিয়েছিলেন সংহতি। এমন কি স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট বন্দীরা জেলের ভিতরে রাজবন্দীর মর্যাদার দাবিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

বামফ্রন্ট সরকার আজিজুল হক, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সহ এই ৬৪ জন বন্দীকে রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করছেন, এঁদের মধ্যে যাঁরা গুরুতর অসুস্থ তাঁদের প্রতি 'মানবিক বিবেচনা' দেখাতে অস্বীকার করছেন ও এঁদের প্রতি সাধারণ খুনী-আসামী থেকে পৃথক আচরণ করতে অস্বীকার করছেন। যদি দৈনিক কাগজে আজিজুলের অসুস্থতার খবর প্রকাশিত না হত, তা হলে তার চিকিৎসা নিয়ে এখন যে-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তাও হত কি না সন্দেহ।

আমরা মনে করি এই ৬৪ জন নকশালপন্থী বাদী রাজবন্দী। স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহিদদের জীবনের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা-অনুযায়ী এঁরা রাজবন্দী। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা অনুযায়ীও এঁরা রাজবন্দী। বাংলার চারু মজুমদার, অন্ধ্রের নাগভূষণ পট্টনায়েক কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁদের রাজনৈতিক পথ গ্রহণ করেন নি। সে-পথ রাজনীতিগত ভাবেই সংবিধানবিরোধী। কিন্তু সংবিধানবিরোধিতার অপরাধে তাঁদের রাজনীতির রাজনৈতিকতা মিথ্যা হয়ে যায় না।

বিচারাধীন বন্দীকে মুক্তি দেয়ার অধিকার সরকারের নেই—এর চাইতে অর্থহীন কথা আর-কিছুই হতে পারে না। এঁদের বিরুদ্ধে মামলা গত তিন-চার বছর ধরে চলছে। পুলিশ সর্বক্ষেত্রেই মামলার সারি ঝুলিয়ে রেখেছে। একটি মামলার মীমাংসা হলেই আর একটি মামলা শুরু হয়। তিন-চার বছর ধরে যে-আসামীকে কোনো একটি মামলাতেও দোষী প্রমাণ করা যায় নি—কোন নৈতিক অধিকারে একটি সরকার তাকে বন্দী করে রাখতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এ-রাজ্যে 'মিশা' আইন প্রয়োগ করেন নি—এই গর্ব কোথায় যাবে যখন দেখা যায় ৬৪ জন রাজবন্দী বিচারাধীন অবস্থায় তিন-চার বছর জেলেই আছেন। 'মিশা'-র চাইতে 'বিচারাধীন বন্দীত্ব' কি প্রগতিশীল ? রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল কোনো একটি কোর্টে যদি মুখে আবেদন করেন যে এঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা রাজ্য সরকার তুলে নিচ্ছেন তা হলে পর মুহূর্তে এই ৬৪ জন বন্দী মুক্তি পেতে পারেন।

রাজ্য সরকার মামলা তুলে নিতে পারেন না—এই যুক্তিও হাস্যকর। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় দুই যুক্তফ্রন্ট ও প্রথম বামফ্রন্ট—এই তিন সরকারই রাজ্য ক্ষমতায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে বহু মামলা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে নিয়েছিলেন।

এই ৬৪ জন বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা এই প্রশ্ন প্রধানত নৈতিক ও রাজনৈতিক। বামফ্রন্ট সরকার অন্তত প্রকাশ্যে বলুন কেন এঁরা মুক্তি পাবেন না, কেন এঁদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়া হবে না, কেন এঁদের রাজবন্দীর মর্যাদা দেয়া হবে না।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা আজিজুল হককে অবশেষে জেল হাসপাতাল থেকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেন্টিনারি বিল্ডিং-এর পাঁচ তলার একটি ব্লকের সমস্ত কেবিন এবং ঘর খালি করে একটি বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে আজিজুলকে। দীর্ঘ করিডোরে লম্বা কাঠের বেঞ্চ পেতে ব্যারিকেড তৈরি করে সার বেঁধে বসে আছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। শাদা পোশাকের

তখন আজিজুল জেলের বাইরে। স্ত্রী মণিদীপ্পর সঙ্গে

"সকালে লপ্‌সী আহার, দ্বিপ্রহরে জলবৎ-তরলম্‌ দালের সহিত হরেক রকম পাতাবাহারী মাছের ঝোল দিয়া সকঙ্কর আধ-রাঙা বুক্‌ড়ি চালের ভাত । ঝোলটি মাছের বলিয়াই বোধ হইল, কারণ গুঁড়া-গুঁড়া মাছ সে পূত জাহ্নবীধারায় সন্তরণ দিয়া স্নান করিতেছিল । তরকারীর অপেক্ষা হরেক রকম পাতাই, এই মৎস্য-পাঁচনের আস্বাদ ও রূপের খোলতাই করিয়াছিল । বেলা চারটার সময় দ্বিপ্রহরেরই দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঝে মাঝে একটা তরল টক ।··· পরদিনই ছেলেরা সুপারিনঠনঠন সাহেবকে আহার-বিহারের একটু যথাসাধ্য উনিশ-বিশ সম্বন্ধে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল বটে, কিন্তু সাহেব বলিলেন, তাঁহাকে জেল কোডের পরিধির মাঝে ন্যায় ও করুণাকে লঙ্কায়-গণ্ডিবদ্ধ জানকীর দশায় রাখিতে হয়, সুতরাং তিনি নাচার ও নিরুপায় ।"

বারীন্দ্রের অত্মকাহিনী

পুলিশে ছেয়ে আছে হাসপাতাল যাকে ঘিরে এত ব্যবস্থা সেই আজিজুল হক অবশ্য একেবারেই হাঁটা-চলা করতে পারেন না । ভালো করে বসতে পারেন না । লেখার জন্য একটা কলম পর্যন্ত ধরতে পারেন না । তাঁর মুখ থেকে কথা আদায়ের জন্য হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দিয়েছে পুলিশ । এই রিপোর্ট যখন লেখা হচ্ছে হাসপাতাল সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল তাঁর শারীরিক অবস্থার খুবই অবনতি হয়েছে, সারা দিনে একটুকুও খাবার খেতে পারেন নি । ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছে । তাঁকে অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে । ডাক্তাররা অবশ্য জানিয়েছেন তাঁরা আশা করছেন রাতের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি হবে ।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ১৬,০০০ মামলা তুলে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন । এটা ১৯৭৭-এর কথা । সেই সময়েই অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দীদের সঙ্গে আজিজুলও জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন । নকশালপন্থী আন্দোলন ততদিনে অনেকগুলো ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । এবং বেশির ভাগ ছোট দলই চারু মজুমদারের 'বিপ্লবী তত্ত্ব' কে আর সঠিক মনে করছেন না । একমাত্র ব্যতিক্রম আজিজুলের সংগঠন । তাঁর দল দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি তখনও চারু মজুমদারের 'গেরিলা যুদ্ধের' তত্ত্ব, 'শ্রেণী শত্রু খতমের' তত্ত্বকে সঠিক মনে করে পশ্চিমবাংলার গ্রামে তার প্রয়োগ শুরু করলে ১৯৮২ সালে পুলিশ আজিজুলকে আবার গ্রেপ্তার করে ।

আজিজুলের বিরুদ্ধে পুলিশের দেওয়া কেসের সংখ্যা মোট ৪৩টি । ১৯৮২ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ মোট ৬৪ জন নকশালপন্থীকে গ্রেপ্তার করে । ইন্টারোগেসনের জন্য পুলিশ আজিজুলকে দীর্ঘদিন টালিগঞ্জের রিট্রিট-এ রেখেছিল । এই সময়ই আজিজুলের হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দেওয়া হয় যাতে

"প্রত্যেক বারই অনশন হলে কিছু না কিছু লোক খসে যায় । গোড়ায় তাই বাছাই করতে হয় । যাদের শরীর খারাপ, যাদের খুব বয়স হয়েছে—তারা এমনিতে বাদ যায় । কিছু লোক অনশনের মুখোমুখি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে । ব্যাপার বুঝে নিয়ে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয় । কিছু আছে যারা মুখ ফুটে বলেই ফেলে । তাদের রেহাই দেবার জন্যে মুখরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হয় । আবার অনশন চলতে চলতে ভাঙবারও লোক থাকে । লক-আপের পর কারো ঘরে স্ট্রেচার এলেই বুঝতে হবে হাসপাতালে যাচ্ছে নির্ঘাত হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙতে । আশপাশের জেল থেকে কমরেডরা তাদের দিকে থুতু ছিটোয়, মা-বাবা তুলে গাল দেয় ।

হাংরাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তিনি কখনও কলম ধরতে না পারেন । আজিজুল আরো বলেছেন (সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) তাঁকে চিকিৎসার নাম করে কয়েকবার ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হয়েছে । উদ্দেশ্য ছিল সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে নষ্ট করে দেওয়া । বর্তমানে যে মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর চিকিৎসা করছেন তিনি সেই বোর্ডকেও এই ইলেকট্রিক শক্-এর বিষয়টি জানিয়েছেন । বোর্ড এই প্রসঙ্গে কতগুলো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও নিতে চলেছে ।

টালিগঞ্জের রিট্রিট নামের এই বাড়িটি কলকাতা পুলিশের একটি অতি আধুনিক 'টর্চার চেম্বার' । এখানে নকশালপন্থীদের দীর্ঘ সময় ধরে রেখে ইন্টারোগেসন করা হয় । আজিজুল ছাড়া অন্য যে নকশালপন্থী বন্দীকে এখানে রাখা হয়েছিল তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । বিশ্বনাথের একটি ফুসফুস এবং বুকের পাঁজরের ৮টি হাড় নেই । ভয়ঙ্কর অসুস্থ অবস্থায় বিশ্বনাথ এখন পি জি হাসপাতালে আছেন । সম্ভবত তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না । অথচ এই সব নকশালপন্থী বন্দীদের প্রসঙ্গে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এরা সবাই বিচারাধীন বন্দী । ৬৪ জন বন্দী নকশালপন্থীর মাত্র তিন জনের বিচার হয়েছে । আজিজুল গত চার বছর বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী আছেন । গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেন এমন একজন আইনজীবী এম এ লতিফ সম্প্রতি 'পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি-'র একটি মিটিং-এ বলেছেন বিচারাধীন বন্দীদের এইভাবে দীর্ঘদিন আটকে রাখা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী । তাঁর মতে এই কাজ সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ১২১ ধারার পরিপন্থী ।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি দল আলিপুর জেলে আজিজুলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আজিজুল তাঁদের জানান, তিনি ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ কিন্তু এখানে তাঁর কোনো রকম চিকিৎসাই হচ্ছে না । চিকিৎসার নাম করে তাঁকে বার বার এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তিনি আরো জানান যে তিনি কখনই আশা করেন না যে সরকার প্রকৃতই তাঁর চিকিৎসা করতে আগ্রহী । আজিজুল বলেন, তিনি কোনো অবস্থাতেই জামিন নেবেন না, তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক শান্তি, যা জেলে পাওয়া সম্ভব নয় । তিনি দাবি করেন, হয় তাকে বাকি ৬৩ জন বন্দীসহ নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক অথবা তাকে প্যারোলে ছাড়া হোক । এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সি পি আই(এম)-এর পার্টি সেক্রেটারি সরোজ মুখার্জি সাংবাদিকদের জানান, কোনো অবস্থাতেই কোনো বন্দীকে প্যারোলে ছাড়া হবে না, জেলখানাতে বা হাসপাতালেই চিকিৎসার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে । রাজ্য সরকার এটাও জানিয়েছিল যে হক জামিন নিতে পারেন । পরে আজিজুল একটি প্রশ্নের উত্তরে এই রিপোর্টারকে জানান, 'জামিন নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কোনো বিপ্লবীর পক্ষেই জামিন নেওয়া সম্ভব নয় ।' পরে হাসতে হাসতে বলেন, 'হিউম্যান বন্ডেজ ছাড়া আর কোনো বন্ডেজ আমি মানতে নারাজ' । অন্যদিকে আরো একটি প্রশ্ন এই-সময়ে ওঠে, তা হল, আজিজুলসহ অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাবেন কি না ! এই প্রসঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ জানান জেল কোডে রাজনৈতিক বন্দী বলে কিছু নেই ।

এই সময়ে একটি ঘটনা আর এস পি নেতাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তোলে । 'জেলে যদি আজিজুলের মৃত্যু হয় তার সম্পূর্ণ দায় আপনাদের দলের উপর বর্তাবে । ফ্রন্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কিন্তু আপনারা দল বাঁচাতে পারবেন না । নির্বাচনের আর খুব একটা দেরি নেই । আজিজুলের মৃত্যু হলে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই' । এই যুক্তিতে আর এস পি নেতারা চিন্তিত হয়ে ওঠেন । এবং আর এস পি-র দুজন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে আজিজুলকে দেখতে ছুটে যান । তাঁরা আজিজুলকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জেল হাসপাতাল থেকে সরকারি হাসপাতালে আসতে সম্মত হন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করেন । আজিজুল তাঁদেরকেও সরাসরি বলেন তিনি সরকারি হাসপাতালে যাবেন না এবং সরকারি চিকিৎসা গ্রহণ করবেন না । অন্যদিকে জেল হাসপাতালে ডাঃ ঠাকুর এবং ডাঃ সামন্ত ক্রমাগতই আজিজুল হকের স্ত্রী মণিদীপা সঈদাকে অনুরোধ করে যাচ্ছিলেন, তিনি যেন আজিজুলকে সরকারি হাসপাতালে চলে যেতে রাজি করান । ঐ দুজন ডাক্তারের বক্তব্য ছিল শুধু অক্সিজেন সিলিন্ডার আর স্যালাইন দিয়ে এত ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ কোনো রুগীকে সারিয়ে তোলা যায় না । কারণ ন্যূনতম জীবনদায়ী ওষুধপত্রও জেলে কখনই থাকে না । কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে । কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব ফ্রন্ট অগ্রাহ্য করেছে অসুস্থতার কারণে আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে । সরকারি পক্ষের উকিল এই অনুরোধের বিরোধিতা করে আদালতকে জানান যে সরকার আজিজুলের চিকিৎসার জন্য চারজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেছেন এবং ঐ বোর্ডই আজিজুলের চিকিৎসার ভার নিয়েছে । ফলে আজিজুলকে প্যারোলে ছেড়ে দেবার কোনো যুক্তি নেই । প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র এই যুক্তি মেনে নিয়ে সিভিল লিবার্টি সংগঠনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন ।

যদিও আজিজুল হক প্রায় ১ মাস ধরে ক্রমাগত বলে আসছিলেন তিনি সরকারি চিকিৎসা নেবেন না । কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগাস্ট-এর ১১ তারিখে তিনি স্বেচ্ছায় জেল হাসপাতাল থেকে চলে এলেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । যদিও তাঁর

"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বহু বিপ্লবীর জেলে ফাঁসী-কাঠে মৃত্যু আছে—অনশনেও মৃত্যু আছে। এ-ছাড়া জেলে অত্যাচারে কেহ কেহ উন্মাদ হইয়াছেন, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছেন।…জেলে চিকিৎসার বিভ্রাটে বা গাফিলতিতে মারা গিয়াছে, এমন সংখ্যাও আছে। ঢাকা জেলে হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যু অস্বাভাবিক। বিপ্লবী হরেন্দ্রকে চিকিৎসক এমন করিয়াই পথ্য (দুধ) দিলেন—যাহার পরিণাম মৃত্যু। কুমিল্লার তরুণ বিপ্লবী কর্মী সুস্থদেহী বলিষ্ঠ যুবক শৈলেশ চ্যাটার্জী। অসুখের চিকিৎসায় দেওয়া হইল ইনজেকশন কিন্তু রোগ-মুক্তি হইল না—শৈলেশ চিরদিনের জন্য চোখ বুজিলেন।"

বাংলার বিপ্লববাদ
নলিনীকিশোর গুহ

অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতাল স্থানান্তরের সময় তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে ডাঃ সামন্ত এবং ডাঃ ঠাকুর তাঁকে স্ট্রেচারে তুলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জেলের সুপার এবং জেলার নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে ফেলার উৎসাহে ঐ অবস্থাতেই আজিজুলকে জেল থেকে নীলরতনে পাঠিয়ে দেন। পরে যখন আজিজুল হককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি প্রথমে সরকারি চিকিৎসা নেবেন না বলেছিলেন এতদিন ধরে আজ এখন মত বদলানোর কারণ কি? উত্তরে আজিজুল বলেছিলেন, 'রাজ্যসরকার এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন যেন সত্যিই তাঁরা আমার ঠিকমত চিকিৎসা করতে আগ্রহী, আমি নিচ্ছি না বলেই তা সম্ভব হচ্ছে না। এটা আসলে সাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া। চিকিৎসা করার ইচ্ছে থাকলে ওঁরা অনেক আগেই তা করতে পারতেন। আমি সেটাই প্রমাণ করবার জন্য ওঁদের কথা মেনে নিয়েছি। আপনি বোর্ডের ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করুন না এখানে কি হচ্ছে, ওঁরাই বলবেন।'

অন্যদিকে চারজনের মেডিকেল বোর্ডও দু ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ অবনী রায়চৌধুরী, তাঁর বিশ্বাস নীলরতনে পুলিশ পাহারায় আজিজুলের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্ভব। অন্যদিকে আছেন ডাঃ অরুণ ব্যানার্জী, ডাঃ অজয় মিত্র এবং ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী। এঁরা ঠিক উল্টোটা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন আজিজুলের মানসিক শান্তি ও বিশ্রাম প্রয়োজন যা এখানে একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে আজিজুল চোখ খুললেই দেখতে পান খাকী এবং শাদা পোশাকপরা পুলিশ। তিনি প্রায়শই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এ ধরনের উত্তেজনার ফলেই সম্ভবত এখানে আসার পর বেশ কয়েকবার তিনি রক্তবমি করেছেন। ডাক্তাররা এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই মন্ত্রীকেও জানিয়েছেন। □

দমদম জেলে উত্তমের ইংরাজি ব্যাকরণ বইও পুলিশ কেড়ে নিয়েছে

দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে একটি চিঠিতে নকশালপন্থী বন্দী উত্তম সাহা জানিয়েছেন পুলিশ তার সাত খানা বই কেড়ে নিয়েছে। এই বইগুলোর মধ্যে নজরুল আর সুকান্তর কবিতার বই ছাড়া বাকিগুলো ছিল উচ্চমাধ্যমিকের অর্থনীতি, লজিক আর ইংরাজি ব্যাকরণের বই।

একটি কবিতাসহ ছ পাতার একটি চিঠিতে উত্তম আবেদন জানিয়েছেন, নকশাল বন্দী আজিজুল হকের স্বাস্থ্য নিয়ে সংবাদপত্রে সাংবাদিকরা যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন জেলে আরো ভয়ঙ্কর রকম অসুস্থ যে সব নকশালপন্থী বন্দীরা আছেন তাঁদের পক্ষেও কিছু যেন লেখা হয়। উত্তমের চিঠিতে এরকম চার জন বন্দীর বিবরণ আছে।

(১) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী** বিশ্বনাথ ১৯৭৭-৭৮ সালে টিউবারকোলোসিস আক্রান্ত হয়ে যাদবপুরে কে এস রায় মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। ঐ হাসপাতালে তখন মৃত্যুর হার ছিল প্রতি তিন দিনে ১ জন। তখন বিশ্বনাথ কোনোরকম রাজনীতি করতেন না। কিন্তু ঐ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবারের দাবিতে বিশ্বনাথ আন্দোলন শুরু করলেন। যক্ষ্মা রুগীদের দীর্ঘ মিছিল যাদবপুরের রাস্তায় সেই সময় অনেকেরই চোখে পড়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে এই আন্দোলন চলেছিল। পরে বিশ্বনাথকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কলকাতা মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করে। সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। একটি ফুসফুস তার আগেই অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছিল। তারপর থেকে কিছুটা অসুস্থ তিনি বরাবরই ছিলেন। চার বছর আগে বিশ্বনাথকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে। বিশ্বনাথ বিচারাধীন বন্দী। দমদম জেলে বিচারাধীন নকশাল বন্দীদের উপর পুলিশ লাঠি চালানো বছর খানেক আগে বেশ কিছু বন্দী আহত হয়, এবং বিশ্বনাথের বুকের পাঁজরের ৮টি হাড় ভেঙে যায়। জেলে চিকিৎসার অভাবে একটু ঠাণ্ডা লাগলেই ওঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরত। এ বছর ২৫ জুন বিশ্বনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দীরা বিশ্বনাথের চিকিৎসায় অবহেলার প্রতিবাদ করলে পুলিশ বন্দীদের উপর লাঠি চালায়। বিশ্বনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে লাঠির আঘাতে। উত্তম লিখেছে, বিশ্বনাথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গত সপ্তাহে আগস্ট মাসের (১৯৮৬) ১ তারিখে বিশ্বনাথের নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করলে আই জি প্রিজন সুমন্ত চৌধুরী মহাকরণে সাংবাদিকদের জানান ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্বনাথকে এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হবে। পরের দিন অর্থাৎ ২ তারিখে পুলিশ বিশ্বনাথকে ঐ হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

(২) **গৌতম চক্রবর্তী** গৌতম বিচারাধীন বন্দী। বন্দী থাকা অবস্থায় জেলে ওঁর মাথায় পুলিশের গুলি লাগে। গুলিতে গৌতমের মৃত্যু হয় নি। গুলি মাথায় নিয়েই সে এখনও জীবিত। গৌতমের মাথায় গুলিটি অপারেশন করে বার করার কোনো চেষ্টা এখনও হয় নি।

সাক্ষাৎকার

আজিজুল হক

প্র : আপনি সরকারি চিকিৎসা নেবেন না বলেছিলেন এর আগে। কিন্তু এখন আপনি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নিজের ইচ্ছায় এসেছেন না আপনাকে জোর করে আনা হয়েছে?

উ : হ্যাঁ আমি এ কথা বলেছিলাম। আমাকে এখানে জোর করে আনা হয় নি। ওঁরা বলছেন মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি হয়েছে, ওঁরা চিকিৎসা করতে চান। আমি এটা চ্যালেঞ্জ হিশেবে নিয়েছি। আসলে সরকার আদৌ চান না আমার চিকিৎসা হোক বা আমি সুস্থ হয়ে উঠি। এটা একটা 'আইওয়াশ'। এমনএকটা প্রচার চালানো হচ্ছিলযেন আমার অনিচ্ছার জন্যই আমার চিকিৎসা হচ্ছে না। এটা ভুল প্রমাণ করার জন্য আমি হাসপাতালে এসেছি।

প্র : আপনাকে চিকিৎসার নাম করে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে, ইলেকট্রিক হিটারে পায়ের তলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ঘটনাগুলো কতদূর সত্যি?

উ : এগুলো হয়েছে। কিন্তু পুলিশের অত্যাচার নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলে আমি মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়াতে চাই না।

প্র : আপনি কি জামিন পেতে ইচ্ছুক?

উ : বেইল মানেই তো বন্ড। কোনো রকম শর্তাধীন মুক্তি চাই না।

প্র : জেলে অসুস্থ অবস্থায় আপনার কি চিকিৎসা হয়েছিল? জেলে বইপত্র পেতেন?

উ : কোন চিকিৎসাই হয় নি। সে কথা তো এখন ডাক্তাররাই বলছেন। আর বইপত্র? দমদম সেন্ট্রাল জেলে তাও এক-আধটা খাতা বই আনানো যেত, আলিপুরে তো লেখার কলমও পাই নি। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে যেদিন আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করা হল সেদিন আমার সেল থেকে সমস্ত বই এবং আমার প্রিয়জনদের ছবি সব পুলিশ নিয়ে নেয়। কিছুই আজও ফেরৎ পাই নি।

প্র : হাসপাতালে এখন আপনার প্রধান অসুবিধে কি?

উ : হাসপাতাল সম্পর্কে দুটো অসুবিধের কথা উঠতে পারে। এক, আমার ব্যক্তিগত অসুবিধে। ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধে নেই। জাহান্নামেও আমার কোনো অসুবিধে হয় না। আর হাসপাতাল প্রশাসনের সম্পর্কে কোন অসুবিধের কথা? সেটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আমার চোখের সামনে সার বেঁধে পুলিশ বসে থাকবে কি না সেটা সরকারই ঠিক করবেন।

প্র : নকশালপন্থী বন্দীদের মুক্তির জন্য একটা চাপ সংবাদপত্রগুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য?

উ : নিশ্চয়ই। গত চার বছর ধরে তো কেউ জানতেনই না যে এতগুলো ছেলে বিভিন্ন জেলে বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ এই সত্যগুলো জানতে পারলেন। 'আজকাল' পত্রিকাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। ওঁরাই এই আন্দোলনটা শুরু করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য সংবাদগুলোও এগিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা গৌরবের। আমার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতা পত্রিকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

প্র : আপনি কি কোনো বই লিখছেন বা লেখার ইচ্ছে আছে?

উ : এখন তো সম্ভব নয়। আমার হাতের আঙুলগুলো অকেজো হয়ে গেছে। ইনডেক্স ফিঙ্গারটা স্টিফ হয়ে গেছে। আগের বেশ কিছু লেখা আছে। সেগুলো যদি বই হয় তবে বই, না করলে শুধুই লেখা। আর যদি আঙুলে আবার যদি শক্তি ফিরে আসে তখন আবার লিখব। লিখতে আমি ভালবাসি।

এখনও চিকিৎসা শুরুই হয় নি

জেল হাসপাতালে এবং বর্তমানে নীলরতনে আজিজুল হককে চিকিৎসা করছেন এমন একজন ডাক্তার সঙ্গতকারণেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আজিজুল হকের অসুস্থতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন প্রতিক্ষণ-কে।

'ওর অসুখ একটা নয়। গত এক মাসের উপর শয্যাশায়ী। বসতে বা দাঁড়াতে পারেন না। এতই দুর্বল। সারা শরীর অসম্ভব কাঁপে সবসময়। সেইজন্য কিছু ধরতে বা দাঁড়াতে অসুবিধে হয়। পেটে একটা ব্যথা আছে। কারণ বোঝা যাচ্ছে না। পেটে একটা সেলাই-এর দাগ আছে। ১৯৭৩-এ যখন তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন তখন একটা অপারেশন নাকি হয়েছিল স্টমাকে। সেলাই-এর দাগটা সম্ভবত তারই। ঐ অপারেশনটা করেছিলেন ডাঃ এস.এম. দাস। তিনি এখন মেডিক্যাল কলেজে আছেন। ডাঃ দাসকে আমরা ডেকেছি। সেই সময়ের কেস হিস্ট্রি আমাদের জানাবার জন্য। ওঁর পেচ্ছাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। ক'দিন অবশ্য এটা একটু বন্ধ আছে। এটার কারণ এখনও বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় রোজই রক্তবমি হচ্ছে। মাঝে মাঝে রক্তচাপ সাংঘাতিক নেমে যাচ্ছে। তখন স্যালাইন প্রয়োজন হয়। জেলের ভেতরে কি কি হয়েছে আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল। তবে এগুলো ম্যালনিউট্রিশনের জন্য হচ্ছে না। তার চেয়ে অনেক সিরিয়াস কিছু কারণ আছে। আজিজুল আমাদের বলেছেন, জেলে ওঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এখনও ওজন নেওয়া হয় নি। তবে মনে হচ্ছে ওজন খুবই কমে গেছে। ওঁর স্ত্রী আমাদের বলেছেন ১৪ কিলো ওজন নাকি কমে গেছে। গত কয়েক মাসে। টর্চার-এর থেকে এগুলো হতে পারে। তবে এখনই কনক্লুসিভলি এটা বলা মুশকিল। এখনও তো ওঁর রোগ ডায়াগনসিস হয় নি। এগুলো সবই সিমপটম। এখনও সব প্রসেস চলছে। ক্লিনিক্যাল টেস্ট রিপোর্টগুলো এখনও হাতে পাই নি আমরা। তাই এখনও চিকিৎসা শুরুই হয় নি। এতদিন যা হয়েছে জেলে এবং এখানেও সবই সিমপটমেটিক ট্রিটমেন্ট। আজিজুল আমাদের বলেছেন ওঁকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে। তারজন্যও এসব হতে পারে। কিন্তু তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। শক দেওয়া হয়েছিল কি না এটা ক্লিনিক্যালি বোঝার জন্য নিউরোলজিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মেডিক্যাল বোর্ডে কোনো নিউরোলজিস্ট নেই। হয়তো ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্যামল সেনকে এই বিষয়ে কনসালটেনসনের জন্য ডাকা হবে। নিউরোলজিস্ট হিশেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমরা মন্ত্রীকে এগুলো জানিয়েছি। আপাতত আমরা 'ওয়াকার' দিয়েছি, 'ওয়াকার' দিয়ে একটু একটু হাঁটাবার চেষ্টা করব। জেলেই 'ওয়াকার' দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা দেওয়া হয় নি। এখন হাসপাতালে দেওয়া হল। ওঁর চোখ খুবই খারাপ। একজন আই স্পেশালিস্ট এবং একজন ফিজিক্যাল মেডিসিনের লোকও আমাদের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর বেশি এখন বলা সম্ভব নয়। এর পর চিকিৎসা শুরু হলে, ক্লিনিক্যাল রিপোর্টগুলো হাতে পেলে হয়তো আরো অনেক কিছু জানা যাবে।

কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা আটবার গিয়েছি। বন্দীমুক্তি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানার জন্য। কখনও তিনি ব্যস্ত ছিলেন, কখনও অসুস্থ। তবে একবারের জন্যও তিনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন নি। কিন্তু সময়াভাবে আমরা নবমবার যেতে ব্যর্থ হই।

"বলা হইয়াছে, নির্জন কারাবাস বিশেষ শাস্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শাস্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্ব ভঙ্গ হয় বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্‌কাতরা মাখানো টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মাথর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তীব্র আন্দোলন ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত,… । নির্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফর্‌ম হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফর্‌ম হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসণ-প্রণালী সংশোধন।"

কারা কাহিনী

শ্রীঅরবিন্দ

বছর খানেক ধরে একটি গুলি মাথায় নিয়ে গৌতম আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যুর দিন গুণছেন।

(৩) **সমর দে** সমরের দুটো ফুসফুসই টিউবারকোলোসিস রোগে আক্রান্ত। ধরা পড়ার সময় এই রোগ সমরের ছিল না। জেলের ভিতরে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন টিউবারকোলোসিস রোগে। চিকিৎসার অভাবে সমর মৃতপ্রায়। কিছুদিন আগে সমরকে দমদম থেকে আলিপুরে ট্রান্সফার করা হয়েছে। উত্তম লিখেছেন 'একবার আলিপুরে গিয়ে সমরকে দেখে আসুন, সদ্য কবর থেকে উঠে আসা ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর মতো একটি উপযুক্ত কঙ্কাল সমর এখন'।

(৪) **সেবিকারঞ্জন ঠাকুর** সেবিকা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে সেবিকাকে দু মাস আগে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করা হয়েছে। হাঁপানিসহ নানান রোগে সেবিকা দীর্ঘদিন আক্রান্ত। ওঁর সহবন্দীরাও মনে করেন সেবিকা এভাবে থাকলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন। ১৯৮৬-র আগস্টের ২ তারিখে আই জি প্রিজন সুমন্ত চৌধুরীও মহাকরণে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সেবিকা গুরুতর অসুস্থ। উত্তম চিঠিতে লিখেছেন; 'সেবিকার যদি মৃত্যু হয় এইভাবে তার দায়িত্ব কে নেবে?' আই জি প্রিজন অবশ্য জানিয়েছেন তাঁরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন খুব তাড়াতাড়ি।

উত্তমের চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, এই চার জন ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ বন্দীর কথাও যেন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ তাদের কথা জানতে পারেন এবং সরকার তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চিঠির শেষ অংশে উত্তম লিখেছেন, "আমরা আজ অন্ধ কারাগারে বন্দী, এই বন্দী জীবনের ইতিহাস আপনারা জানেন না। কারা অন্তরালে বন্দীদের দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে। এখানে সর্বত্র নিপীড়িতের ক্রন্দন রোল। এই জেলের প্রতিটি ইট বন্দীদের রক্তে সিক্ত। অন্ধকারের ছায়া সবাইকে গ্রাস করতে আসে। তিল তিল করে এখানে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এখানে এলে আপনাদের মানবিক বিবেককে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করবে। তারপর এই সভ্য দুনিয়ার মানুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাবেন।"

নকশালপন্থী হিশেবে যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে গত চার বছরে তাদের সংখ্যা সঠিক কত কেউ জানে না। এঁদের খুব কম সংখ্যকেরই (মাত্র দু তিন জন) বিচার হয়েছে। বিচারাধীন বন্দীদের বছরের পর বছর কিভাবে আটক রাখা হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর সেক্রেটারি এবং আইনজীবী লতিফ সাহেব বলেছেন এ কাজ সংবিধানের ১২১, ১৪ এবং ১৯ ধারার বিরোধী। □

"আজিজুল হকের ব্যাপার তো মিটে গেছে"

সুমন্ত চৌধুরী, আই-জি-প্রিজন

প্র : আজিজুল হক গত চার বছর জেলে আছেন। ইদানীং আমরা জেনেছি তিনি ভয়ঙ্কর অসুস্থ এবং জেলে থাকাকালীন তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পান নি। এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

উ : আজিজুল হকের ব্যাপার তো মিটে গেছে। ওকে আমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। উনি তো আর জেলে নেই। আর তাছাড়াএই প্রসঙ্গে আমিকোনো কথা বলতে চাই না। প্রেস যা করেছে এটা নিয়ে তাতে অযথা কনট্রভার্সি বেড়েছে। কিছু জানতে হলে হোম সেক্রেটারির কাছে যান। অথবা কিছু পজিটিভ প্রশ্ন করুন।

প্র : জেলের ভেতরের অবস্থাটা কি কিছুটা মানবিক করা যায় না?

উ : জেলগুলো 'মর্ডানাইজ' করার একটা বড় পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। ১১ কোটি টাকার স্কিম শুধু মেয়েদের জন্য একটা বড় জেল তৈরি হবে। প্রতিটি জেলে ডিপ টিউবওয়েল বসবে, জেনারেটর বসবে জেলের স্যানিটারি ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে এ কাজগুলো আমরা করব। এছাড়া জেল ইনডাস্ট্রিগুলো ডেভলপ করা হবে। স্প্রে পেইন্টিং মেশিন, সেলাই মেশিন এসব দিয়ে বন্দীদের কাজ করানো হবে।

প্র : বন্দীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা?

উ : খুব তাড়াতাড়ি আমরা প্রতিটি জেলে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি খুলব।

প্র : আগে কি এগুলো ছিল না?

উ : না, তা নয়, কিছু কিছু ছিল, আসলে আমরা জেলে চিকিৎসার সুযোগটা বাড়িয়ে দেব।

প্র : এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে, বন্দীরা উপকৃত হয় এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে তো একটা 'ক্লীন' অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' চাই, তা কি আপনাদের আছে?

উ : এ বিষয়ে আমি কোনো কমেন্ট করব না।
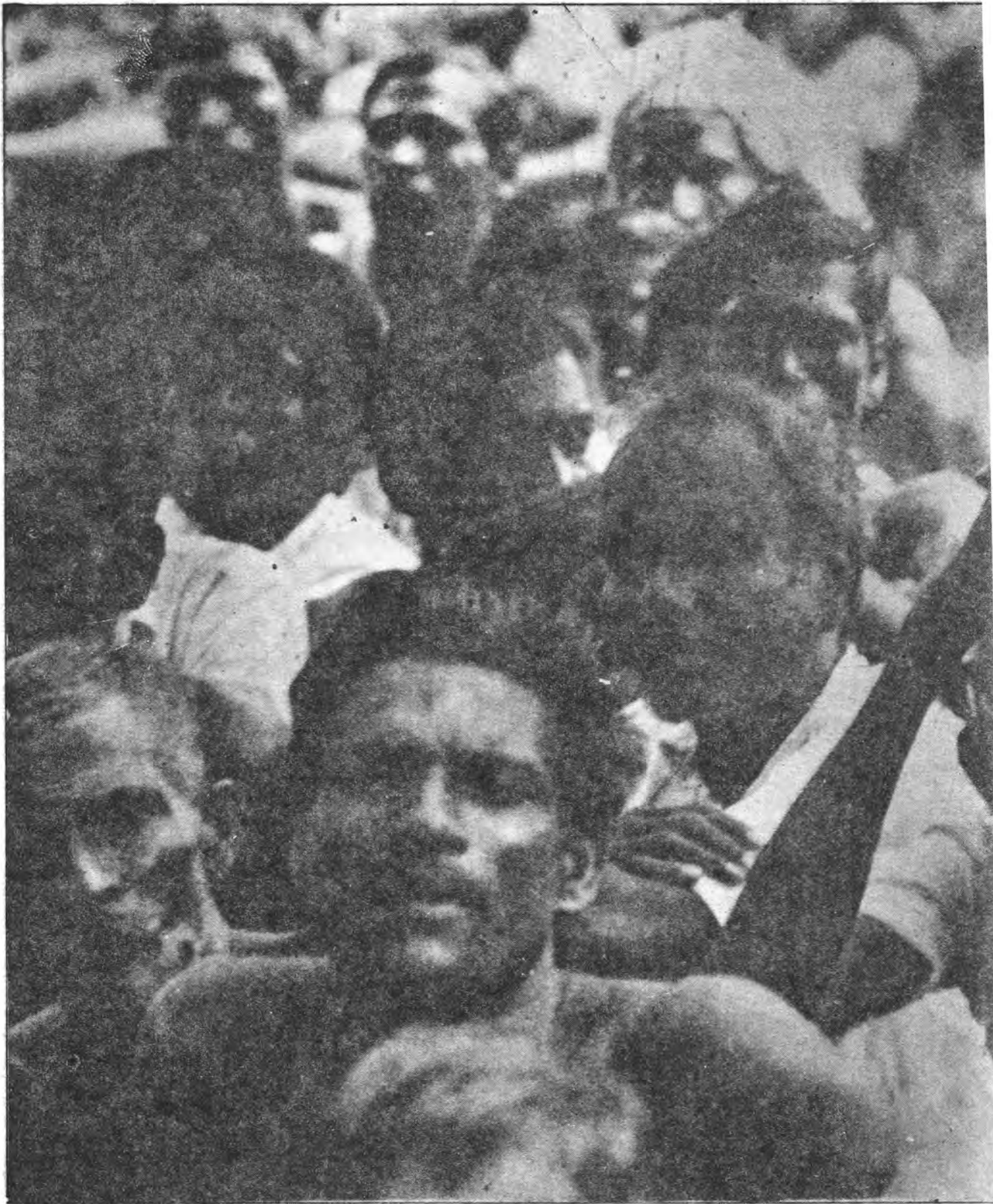
ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির সঙ্গে ভিটেমাটির লড়াই

মিলন দত্ত

ভোগরাই এবং বালিয়াপাল—দুটি ব্লক এখন উড়িষ্যার ঝড়ের কেন্দ্রস্থল। দীঘার খুব কাছে, সমুদ্রতীরের এই দুটি ব্লকের ১৭০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে 'ন্যাশনাল মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ' বসছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের গোচরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এলাকার লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ আন্দোলন। সূচনায় বিক্ষিপ্ত সেই আন্দোলন ক্রমশ নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে। ১৭ আগস্ট তারিখে বালিয়াপাল ব্লকের গ্রামে গ্রামে 'মরণ সেনা'র গঠন সূচনা করেছে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

'৮৫-র শেষের দিকে কটক থেকে প্রকাশিত ওড়িয়া দৈনিক পত্রিকা 'সমাজ' সর্বপ্রথম সংবাদটি প্রকাশ করে। তাতে স্বাভাবিক কারণেই গোটা রাজ্য জুড়ে তৈরি হয় দুটি প্রতিক্রিয়া—ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির বিরোধিতা এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তাকে স্বাগত জানানো। বস্তুত পরস্পর বিরোধী এই প্রতিক্রিয়া আজও গোটা উড়িষ্যায় রয়েছে। ঐ সংবাদ প্রকাশের কিছুদিন পরেই দুই ব্লকের সাধারণ মানুষ মিলে গড়ে তোলেন 'উত্তর বালেশ্বর ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রতিরোধ কমিটি'। তাছাড়া সংবাদের সূত্র ধরে বিজু পট্টনায়ক এবং নীলমণি রাউতরায়ের মতো উড়িষ্যার বিরোধী নেতারা, প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অরুণ সিং এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে কয়েকটি চিঠি দেন—যা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ক্রমশ জনতা দলই বেনামদারীতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রতিরোধ আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিশেবে দাঁড়িয়ে যায়।

আন্দোলনটা গড়ে ওঠার পেছনে এলাকার মানুষের কতটা স্বতস্ফূর্ততা কাজ করেছিল সেটা এতদিন বাদে আন্দোলনের চেহারা দেখে ধরা মুশকিল হতে পারে কারণ সংগঠন ছড়িয়ে গেছে দুটি ব্লকের লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে এবং অনিবার্যভাবেই সংগঠনের গায়ে লেগেছে হরেক

নৈঘাটি গ্রামে ঢোকার মুখে ব্যারিকেড
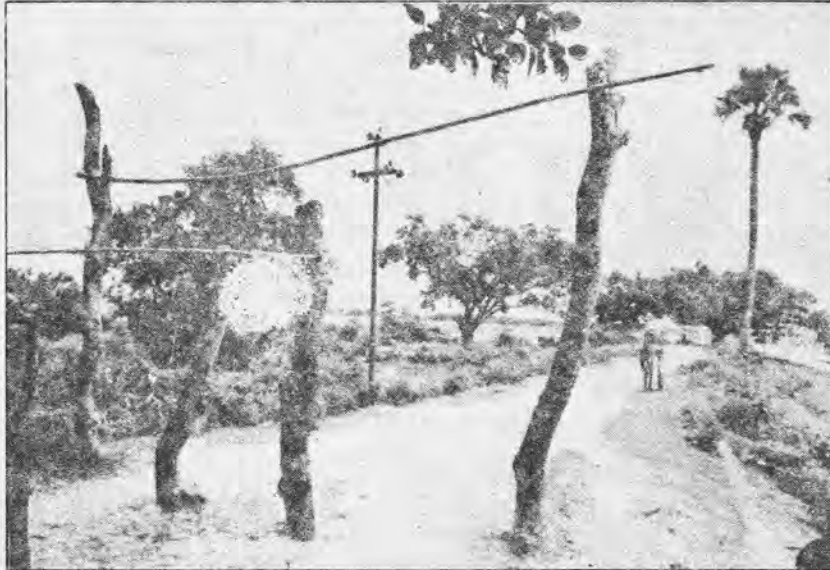
রাস্তা আটকানো হয়েছে গাছ পুঁতে

রাজনীতির ছোপ। তবে ঐ সংগঠন তথা গোটা আন্দোলনটা চালিয়ে নিয়ে যাবার কোনো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব পাওনা হলে তা দিতে হবে বালিয়াপালের প্রাক্তন জনতা এম· এল· এ গদাধর গিরিকে। এই গিরিই 'উত্তর বালেশ্বর ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রতিরোধ কমিটির' সভাপতি। এই গদাধর গিরিই গ্রামে গ্রামে ঘুরে সবার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেন আন্দোলনের গতি প্রকৃতি।

আন্দোলনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে গ্রামে গ্রামে সভা করে সাধারণ মানুষকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছে কমিটি। সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তি করে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তা ক্রমে জোরদার হয়ে উঠছে সংবাদপত্রে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এক একটি নোটিশ বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে। ঐ সরকারি বিজ্ঞপ্তিগুলিতে কোনো কোনো নম্বর মৌজার কত জমি ন্যাশনাল মিসাইল টেসটিং রেঞ্জের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে তা জানানো হয়। প্রথম নোটিশটি প্রকাশিত হয় এবছর মার্চ মাসে এবং শেষটি ১৪ আগস্ট তারিখে।

বালিয়াপালের পান বরোজ

এলাকায় ঢোকার মুখে প্রধান রাস্তার ওপর ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে, কোথাও বাঁশ দিয়ে চেক পোস্টের মতো করে, আবার কোথাও রাস্তার মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছে মোটা মোটা গাছ যাতে কোনো গাড়ি ঢুকতে না পারে গ্রামে। দক্ষিণ বালিয়াপাল অর্থাৎ সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামগুলোতে পৌঁছতে গেলে কালিপাড়া নৈঘাটি গ্রামের হাটের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে সেটিই গ্রামগুলোতে ঢোকার একমাত্র পথ। গ্রামের মানুষ ঐ হাটের পাশে রাস্তার ওপর চেকপোস্ট বসিয়েছে—রাস্তা বরাবর আড়াআড়ি রাখা বাঁশটি আটকানো থাকে তালা চাবি দিয়ে, ফলে কোনো গাড়ি সে পথে ঢুকতে পারবে না গ্রামে। সন্দেহজনক সরকারি গাড়িগুলোকে আটকাতেই এই ব্যবস্থা।

গতমাসে বালেশ্বরের জেলা শাসক আই· সি· দাস এবং তাঁর কর্মচারীদের গ্রামবাসীরা ফিরিয়েদেয়। যে জমিগুলো অধিগ্রহণ করা হবে সেগুলো চিহ্নিত করতে ওঁরা এসেছিলেন। জেলা শাসক জানান, চাষ জমি বা বসত জমি কোনোটাই এখনো চিহ্নিত করা হয় নি। এছাড়া তাঁরা নাকি পুনর্বাসনের জন্য .৬০০ একর জমি কাছাকাছি এলাকা থেকে অধিগ্রহণ করার কথা ভাবছেন। সরকারি গাড়ি গ্রামে ঢুকতে দেখলেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বেরিয়ে পড়ে পথে এবং সারসার দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তা অবরোধ করে আর গ্রাম জুড়ে বাজতে থাকে শাঁখ পাশের গ্রামের লোকদের সচেতন করে দেবার জন্য।

গত ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে নারায়ণপুরের কে· সি· স্কুলের মাঠে ৩৫টি স্কুলের প্রায় ১০,০০০ ছাত্র সমবেত হয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণের বিরোধিতা করে। স্বাধীনতা দিবসকে বেত্রগড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ এভাবেই পালন করলেন—অবশ্য এরকম ছোটখাটো মিছিল-জমায়েত বালিয়াপাল এবং ভোগরাই এলাকায় হচ্ছে মাঝে মাঝেই।

উত্তর বালেশ্বর ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি গদাধর গিরি জানান, 'আন্দোলনের এই জোয়ারকে আমরা কোনোভাবেই সহিংস হতে দেব না।' সত্যাগ্রহই ওঁদের আন্দোলনের রণনীতি প্রশ্ন করেছিলাম, সত্যিই যখন পুলিশ আসবে রাইফেল আর বেয়নেট নিয়ে—তখন আন্দোলনের ধরন কী হবে তা নিয়ে ভেবেছেন?

'অহিংসাদিয়ে হিংসাকে রোধ করবো আমরা। কোনো প্ররোচনাতেই আমরা অস্ত্র ধরব না'

সত্যাগ্রহ বা অসহযোগের প্রথম পর্ব হিশেবে যেমন গ্রামের মানুষ গ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়েছে সরকারি কর্মীদের, তেমনি দ্বিতীয় পর্বে ভোগরাই-বালিয়াপাল ব্লকের মানুষ সমস্ত রকম সরকারি কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এমন ব্যাঙ্ক ঋণগুলোও তারা পরিশোধ করছে না। বেত্রগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কীর্তিচন্দ্র গিরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল নারায়ণপুরে ঢোকার মুখে, তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'ট্যাক্স বয়কট

আন্দোলন কি সফল হয়েছে সর্বতোভাবে।' শ্রীগিরি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান তাঁদের এলাকা থেকে একটি পয়সা করও সরকারের ঘরে যায় নি এবং যতদিন না সরকার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণের প্রস্তাব তুলে নিচ্ছেন ততদিন এই আন্দোলন চলবে।

বস্তুত, বালিয়াপাল-ভোগরাই-এর মানুষ এখন ভিটেমাটি রক্ষার সার্বিক লড়াইয়ে নেমেছেন। দুটি ব্লকের ১৩২টি গ্রামে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন যদি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের ঐ মিসাইল প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়। প্রথমে জানা গিয়েছিল ১৭০ বর্গ কিলোমিটার জমি লাগবে ঐ প্রকল্পটি নির্মাণের জন্য—কিন্তু এই আন্দোলনের চাপেই হয়তো জমির পরিমাণ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১০২ বর্গ কিলোমিটার। এতে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পরিমাণ বিশেষ কমছে না, তবে কিছুটা ধানিজমি অব্যাহতি পেতে পারে।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকে রেখে পাশাপাশি দুটো ব্লকের মাঝ বরাবর রয়েছে সুবর্ণরেখা নদী। অর্থাৎ সুবর্ণরেখার পুবে ভোগরাই আর পশ্চিমে বালিয়াপাল ব্লক। এই দুটি ব্লকের পেট চিরে বেরিয়ে গেছে কোস্ট ক্যানাল, ঐ এলাকার সেচের প্রধান উৎস। ন্যাশনাল মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ-এর জন্য চাওয়া হয়েছে কোস্ট ক্যানাল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত দুটি ব্লকের মোট ১৭০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা।

ন্যাশনাল মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ নিয়ে এত ঝামেলাই হত না যদি না ঐ লক্ষাধিক মানুষের ভিটে ছাড়ার কথা উঠত। সভ্যতার দায় বইতেই হয় সাধারণ মানুষকে। কাজ নিঃশব্দে বিনা বাধায় সম্পন্ন হয়ে যায় যদি মানুষের সংখ্যা হয় কম এলাকা হয় রুক্ষ অনুর্বর বা পাহাড়ি। এখানে বালিয়াপালে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের সংখ্যা এবং জমির উর্বরতা। সরকার প্রথমে বলেছিলেন প্রতি একর জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেবেন ১০,০০০ টাকা, সেটা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৩০,০০০ টাকা। কিন্তু এই টাকা এলাকার মানুষের প্রতিরোধে কোনো ফাটল ধরাতে পারে নি।

বালিয়াপাল-ভোগরাই এলাকায় কেবল ধান বা পাটের মতো সাধারণ ফসলই নয় বাদাম, কাজু, পান এবং নারকেলের মতো অর্থকরী ফসলও হয় প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া আছে সামুদ্রিক মাছ। গিরিধারী পাত্র এলাকার নাম করা পানের কারবারি, জানালেন একটা পান বরজ ১০/১৫ জনের একটি পরিবারকে সারা বছর খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এছাড়া যেহেতু পানের চাষ সারা বছর ধরে হয় এবং প্রতিনিয়ত নজর রাখতে হয় পানক্ষেতে, তাই সারা বছরই কাজ থেকে যায় ক্ষেতে। এলাকার ক্ষেত মজুররা খোরাকি সহ দৈনিক ১০ থেকে ২০ টাকা মজুরিতে কাজ পেয়ে যায় পান ক্ষেতে। আরও আছে চীনা বাদামের জমি তৈরি করা কাজু বাদাম খোলা থেকে ছাড়ানো আর মাছ ধরা। ফলে এখানে কোনো বেকার নেই বললেই

কাটরামহল গ্রামে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বিরোধী জনসমাবেশ

চলে। অবস্থাপন্ন চাষীর সংখ্যা প্রচুর। কেবল গোটা উড়িষ্যায় নয়, বোম্বাই এবং বেনারসেও বালিয়াপাল থেকে পান যায়। ভোগরাই থেকে বালিয়াপাল পর্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার পান বরোজ। কেবল বালিয়াপাল ব্লকেই ৫০০০ হেক্টর জমিতে পানের চাষ হয়। বাদাম চাষ হয় ৪০০০ হেক্টর জমিতে। বছরে ৪০ কোটি টাকা উপার্জন হয় সমুদ্রে মাছ ধরে। পান থেকে আসে ৩৫ কোটি টাকা। এখান থেকে সারা বছরে যা বাঁশ বিক্রি হয় তা ২৩ কোটি টাকার। গ্রামের এক মৎসজীবী নাম দশরথ জানালেন দেশলাই আর কেরোসিন ছাড়া তাঁদের কিনতে হয় না কিছুই।

এখন শস্যশ্যামলা প্রাণদায়ী মাতৃভূমি রক্ষার লড়াই-এ নেমে পড়েছে সবাই—ধনি দরিদ্র নির্বিশেষে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এই বিশাল ভারতবর্ষে লক্ষাধিক মানুষকে উচ্ছেদ না করে এমন উর্বর ভূমি নষ্ট না করে মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ বসানো যেত না? এরকমই প্রশ্ন ছিল প্রধান মন্ত্রীর কাছে লেখা বিজু পট্টনায়কের চিঠিতে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন এই

গদাধর গিরি

নৈঘাটি হাটে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বিরোধী দেয়াল লিখন

উড়িষ্যার জনতা পার্টির নেতারা বালিয়াপালির গ্রামে

প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ বা আন্দামানে সরিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু প্রতিরক্ষা দপ্তর সাগরদ্বীপ এবং আন্দামানের প্রস্তাবদুটি যথেষ্ট অনুসন্ধান না করে নাকচ করে দেওয়া হয়। কারণ হিশেবে দেখানো হয়েছিল আন্দামানে একশো গুণ বেশি খরচ পড়বে এবং সাগরদ্বীপের জমি খুবই নরম। বিজু পট্টনায়ক প্রতিরক্ষা দপ্তরের যুক্তি মানেন নি। তিনি বলেন সাগরদ্বীপের মতো নরম জমিতে যদি এত ভারি ভারি শিল্প এবং ইমারত নির্মাণ করা যেতে পারে তবে তা সাগরদ্বীপে কেন হবে না।

গুজরাটের দ্বারকায় মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ তৈরি প্রস্তাব হয়েছিল একবার কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায় পাকিস্থানের সংলগ্নতার কথা ভেবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ধারণা পাকিস্থান এত কাছে টেলিমেট্রিক ইন্টারভেনশন চালাতে পারে। কিন্তু পাকিস্থানই তো তাদের মিসাইল রেঞ্জ বসাচ্ছে করাচির পশ্চিম উপকূলে তাছাড়া টেলিমেট্রিক ইনটারভেনশন ভারতের যে কোনো প্রান্তেই হতে পারে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা দপ্তর ঠিক করেছে বালিয়াপাল-ভোগরাই অঞ্চলেই বসবে মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ। এবং উড়িষ্যার রাজ্য সরকার রাজি হয়েছে কেন্দ্রকে একাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে। কিন্তু টাকার টোপ, পরিবার পিছু চাকরির টোপ বা যোগ্য পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েও ঐ এলাকার মানুষদের টলাতে পারছে না সরকার। বরং দিন দিন জোরদার হচ্ছে প্রতিরোধ আন্দোলন। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মিসাইল টেসটিং রেঞ্জ হাত না দেবার আশ্বাস দিয়ে জনতা পার্টির সমরেন্দ্র কুণ্ডুকে পরাজিত করেন কংগ্রেসের চিন্তামণি হেনা। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন এখানে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির বদলে তৈরি হবে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রকল্প। এটা ঠিক যে জানকিবল্লভ পট্টনায়কের রাজনৈতিক অবস্থা এতটা পোক্ত নয় যে তিনি কেন্দ্রের এই প্রকল্পকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব দিতে পারেন। তাকে কেবল হাইকমান্ডকে খুশি রাখার জন্যই এই প্রকল্প রূপায়ণের সবরকম চেষ্টা করে যেতে হবে—তা সে যতই হোক অমানবিক বা অযৌক্তিক।

তাছাড়া বহু ঘটনায় পোড়-খাওয়া উড়িষ্যার সাধারণ মানুষ এখন আর সরকারি আশ্বাসে আস্থা রাখে না। কারণ এপর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করতে যত লোককে উচ্ছেদ করা হয়েছে তারা কেউই প্রায় পুনর্বাসিত হয় নি।হালে রেঙ্গালি বহুমুখী বাঁধ প্রকল্পে সম্বলপুর এবং ঢেঙ্কানলের ৬০,০০০ মানুষ তাদের জমি হারিয়েছে। তা আজও কোনো পুনর্বাসন পায় নি, পায় নি কোনো ক্ষতিপূরণ।

এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকারের কোনো আশ্বাসই টিকছে না এলাকার মানুষের কাছে। এবং প্রত্যেক সভা সমিতি আর আলোচনায় যেকোনো মূল্যে 'জন্মভূমি'-কে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হচ্ছে বারে বারে। এই প্রতিজ্ঞা থেকেই তৈরি হল মরণ সেনা। ১৭ আগস্ট কাটরা মহল গ্রামে মন্দিরের পাশে বিশাল গাব গাছের নীচে সভা বসেছিল সকাল বেলায়। সেখানে জড়ো হয়েছিলেন আশপাশের অড়াডিহা, জগতিপুর, সেমনাসুল কালাসিমলি কানিয়াবারা, কোকড়াপাল,. ডোগরা প্রভৃতি গ্রামের হাজার খানেক নারী পুরুষ। সভার শুরুতে গোটা গ্রাম জুড়ে বেজে উঠেছিল শাঁখ। তারপর সার বেঁধে সবাই নাম লেখালেন মরণ সেনায়। 'মরণ সেনা'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে গদাধর গিরি জানালেন, যে কোনো রকম সরকারি হামলার মোকাবিলা করবে এই সেনা অহিংস উপায়ে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জনতা পার্টির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী রবি রায়, জনতা পার্টির এক বিধায়ক এবং জনতা পার্টির রাজ্য সম্পাদক ভাগবত মেহেরা এবং জনতা পার্টির বয়স্ক নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী রবি ভাই। এঁরা প্রত্যেকেই অহিংস কিন্তু শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। পরে আরো একটি সভা হয় নারায়ণপুরের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেখানেও 'মরণ সেনা'-র তালিকায় নাম লেখায় বহু নারী পুরুষ। দুটি সভায় মোট ২,৫০০ মরণ সেনা তালিকাভুক্ত হয়।

প্রতাপপুরের ভেতর দিয়ে ঢুকছিলাম নারায়ণপুর গ্রামে, পথে দেখা হয়েছিল কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে—তারা সবাই জুগুঠিয়ার রামলোচন হাইস্কুলের ছাত্রী। ক্লাস এইটের সুলক্ষণা পাত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বিষয়ে কিছু জানে কিনা। মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিল সুলক্ষণা 'বোম মেরে শেষ করে ফেললেও এই মাটি ছেড়ে যাব না।' ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রতিরোধ কমিটি যতই অহিংস আন্দোলনের কথা বলুক—শেষ পর্যন্ত যদি সরকার তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং প্রশাসন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে জনবসতি উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে, এবং ভিটেমাটি খোয়ানো যদি অনিবার্যই হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ যে অহিংস থাকবেন, এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। □

দেবেশ রায়

প্রেতচ্ছায়ে ঘোরাফেরা

পাঁচ

অফিসে……গত ছমাস-আটমাস ধরে একটা খুব জটিল অঙ্ক কষে যাচ্ছে। অঙ্কটা দুটোই, নাকি আসলে একটা, ছমাস-আটমাস ধরে কষছে, নাকি আসলে ছবছর-আটবছর ধরে কষছে এখন আর তার পক্ষে সে হিশেব রাখা সম্ভব নয়। বোধ হয়, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো রাষ্ট্রীয় কারণে যদি এই প্রশ্নের জবাব খোঁজা অনিবার্য হয়ে পড়ে যে কবে থেকে এই সব অঙ্ক কষাকষি শুরু, তা হলে হয়ত……র সারা ভারতে ছড়ানো অসংখ্য অফিসের নথিপত্র বা বম্বেতে তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের কাগজপত্র ঘেঁটে একটা কোনো আন্দাজি উত্তরে আশা সম্ভব।

কিন্তু সেই আন্দাজটা কী হবে, তা আগেই নির্ধারিত না-থাকলে উত্তরের আন্দাজটার কাছে পৌঁছনো যাবে না। ভারতীয় সরকারের কোনো মন্ত্রী বা কোনো-কোনো রাজ্য সরকারের কোনো-কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে ফেলে দেয়ার দরকারেই মাত্র এই ধরনের ব্যাপক খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হতে পারে। এর চাইতে কম জরুরি কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজনে এত পুরনো নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি চলে না।

সেক্ষেত্রে……র প্রতিষ্ঠানটিকেই যে ধরা হবে, তারও ত কোনো মানে নেই। আজকাল ব্যাঙ্কের দিকেই নজর বেশি, তাঁদের, যাঁদের প্রায়ই এ-রকম নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটা সুবিধে, ব্যাঙ্কে প্রতিদিনের ক্যাশ প্রতিদিন মেলাতে হয়, ঋণের ব্যাপারে প্রত্যেক অফিসারের আলাদা নোট থাকে, শেষ পর্যন্ত ফাইলে নোট না দিয়ে ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারও টাকা দেবার কথা বলতে পারেন না। ব্যাঙ্কের আরো বড় সুবিধে যে হেড অফিসকেও ত কোনো একটি ব্র্যাঞ্চের মারফৎ কাজ করতে হয়। ফলে, যদি কোনো মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে জড়াতে হয় তা হলে ব্যাঙ্কের মারফৎ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। জনার্দন পূজারি—ব্যাঙ্কের মন্ত্রী হয়ে প্রকাশ্য মিটিঙে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, চেয়ারম্যানদের কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছিলেন। তার পরেই তাঁর সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছে—পূজারি কী কী বিধিবহির্ভূত সুবিধে কোন-কোন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছেন। পার্লামেন্টে পূজারি তোতলিয়ে জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে তাঁর দলের কোনো নেতাই এগিয়ে আসেন নি। পূজারিকে মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হয় নি কিন্তু ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর, ম্যানেজারদের নিয়ে শহরে-শহরে আমদবরার বসানো ছাড়তে হয়েছে।

তেমনি, আজকাল আবার লটারিও বেশ জুতসই ফাঁদ। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংকে ইউনিয়ন কারবাইডের মামলায় জড়ানো গেল না, তিনি ফসকে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হয়ে গেলেন। যেখান থেকে কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হতে না হতেই জব্বলপুরের কাছে তাঁর 'মর্মরপ্রাসাদ' ভারতের প্রধান খবর হয়ে উঠল। কিন্তু অর্জুন সিং মার্বেলেও পিছলোন নি। এখন তাঁকে লটারির ফাঁদে ফেলে দেয়া হয়েছে। যদিও এই সব অভিযোগের কোনো সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায় নি কিন্তু এইবার হয়ত সকলেই নড়েচড়ে বসবেন—তা হলে কী? তা হলে কী?

অথচ যে-পদ্ধতিতে অর্জুন সিং-এর ছেলে অজয় সিং লটারির নামে টাকা তুলেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অন্তত আমাদের এই দেশেই একশ বছরের পুরনো, ইংল্যান্ডসহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস যদি দেখা যায় তা হলে হয়ত বেরবে এ-পদ্ধতি অন্তত চার-পাঁচশ বছরের পুরনো। মাল আটকে রেখে বাজারে মালের দাম বাড়ানোর কায়দা যতদিন ধরে জানা হয়ে গেছে, অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, স্বীকৃত পদ্ধতি হিশেবে মান্য হয়ে আছে, বা, লোকজনের কাছে আট আনা-চার আনা, দুটাকা-দশটাকা বা একশ টাকা-দুশ টাকা নিয়ে, প্রায় চাঁদা হিশেবে নিয়ে, একটা কোম্পানি খাড়া করে সেই লোকজনকে কখনো-কখনো নিয়মিত পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকা লভ্যাংশ হিশেবে দিয়ে, শেয়ারের সম্মান বাড়িয়ে নিয়ে, আট আনা দামের শেয়ার আটশ টাকায় বেচার অধিকার যত দিন ধরে আইনসঙ্গত হয়ে আছে, দু-এক টাকায় লটারির টিকিট কিনে দু-এক লাখ টাকা পেয়ে যাওয়ার নেশা, বা অন্তত বাসনা, অন্তত ততদিনের প্রাচীন। মানুষের প্রবৃত্তিকে আইনের সমর্থন দেয়ার নামই ত সভ্যতা। যদি মানুষ লটারির টিকিট কিনে বড়লোক হতে চায় তা হলে তার এই প্রবৃত্তির পক্ষে সরকার আইন করতেই পারে! শুধু আইনই-বা কেন, সরকারের নিজেরই যখন টাকার দরকার তখন

লটারির টিকিট বেচে সরকারও ত প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগাড় করতে পারে, তাতে এক রাজ্য সরকার আর-এক রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেও নামতে পারে। 'ভাগ্যলক্ষ্মী', 'কামধেনু' ইত্যাদি কত নামে লোকজনকে উৎসাহিত করতে পারে। 'আপনি প্রতি সপ্তাহে একবার লক্ষপতি হতে পারেন'—এত সুন্দর কথায় মানুষকে আইনসঙ্গত প্রলুব্ধও করতে পারে। আর, সরকার নিজেই যেখানে ফাটকাবাজির খেলার নেতৃত্ব নিয়ে নেয়, যেখানে জনসাধারণ অন্তত এটুকু স্বস্তি পায় যে অজানা অচেনা সংস্থায় টাকা দিয়ে সব সময় সশঙ্ক হয়ে থাকতে হবে না, বা জেনেশুনে বিষপান করতে হবে না।

অর্জুন সিং-এর ছেলে অজয় সিং-এর একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে—'চুরাহাট চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। এটা মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে—যেখানে এক সময় শাদা বাঘ দেখা যেত ও যেখানে এক সময় একজন মহারাজা থাকতেন। বর্তমানে প্রাক্তন সেই মহারাজা, মার্তণ্ড সিং, একজন এম-পি। চুরাহাটের শিশুদের কল্যাণের জন্যে কোনো সমিতির এঁর চাইতে যোগ্য সভাপতি আর কে হতে পারেন? আর, মুখ্যমন্ত্রীর, তিনিও বর্তমানে প্রাক্তন, ছেলে অজয় সিং-এর চাইতে যোগ্য সম্পাদকই বা কে হতে পারেন?

এ-রকম লটারির প্রাইজ দেয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে হিশেব দিতে হবে, মোট টিকিটবিক্রয়লব্ধ টাকার অর্ধেক প্রাইজ হিশেবে দিতে হবে, সিধি জিলার কালেক্টরের নির্দেশ যে একমাত্র সিধি জিলার মধ্যেই টিকিট বিক্রি করা যাবে, সিধি জিলার কালেক্টর এই সোসাইটিকে অনেক চিঠি দিয়েছেন—মোট একুশটি,—এই সব বিধি বা আদেশ বা অনুরোধ নাকি সোসাইটি অগ্রাহ্য করেছে।

কিন্তু এ-সব অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

আসলে সোসাইটি ১২টি খেলার জন্যে নানা দামের ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি করেছে। বিক্রি করে নি, ছেপেছে। অনেক টিকিটই অবিক্রীত থেকে গেছে—২০ টাকা দরের প্রায় ৪ কোটি টাকা দামের টিকিট বিশেষ করে। সে যাই হোক, হিশেবপত্রে দেখা গেছে টিকিটবিক্রয়লব্ধ ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকাই প্রাইজ হিশেবে দেয়া হয়েছে।

ঘটনা যদি এখানেই শেষ হত তা হলে বলা যেত যে দেশের সমস্ত লটারির দায়িত্ব এই চুরাহাট চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও তার সম্পাদক অজয় সিংকে দেয়া হোক।

কিন্তু এই ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার ঘোষিত পুরস্কারের মধ্যে ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকাই ফাজিল জমায় পড়ে আছে, অর্থাৎ যে-সমস্ত টিকিটে এই প্রায় ৪ কোটি টাকা উঠেছে তার, অর্থাৎ সেই সব টিকিটের কোনো দাবিদার নেই। তা হলে, যে-বিপুল সংখ্যক টিকিট অবিক্রীত পড়েছিল, সেই সব টিকিটে হয়ত এই দাবিদারহীন প্রাইজ অনেকগুলি উঠেছে। পরন্তু, যে-মাত্র ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার প্রাইজ দেয়া হয়েছে, তারও কিছু অংশ প্রকৃত পক্ষে দেয়া হয় নি।

অনেক আইনমাফিক টিকিট-ক্রেতা টিকিট কেনা সত্ত্বেও ও প্রাইজ পাওয়া সত্ত্বেও টাকা পান না। আইন অনুযায়ী খেলার ফল বেরনোর পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে প্রাইজের টাকা দাবি করতে হবে, তার পরে কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না। এক জন দাবিদার টিকিটের ঠিকানা অনুযায়ী চুরাহাটে গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন, যেতে হবে রেওয়া, যেখানে প্রাক্তন মহারাজা ও প্রাক্তন শাদা বাঘ আছেন। সেখানে গিয়ে শোনেন, যেতে হবে ভূপাল, যেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান পুত্র ও সমিতির বর্তমান সম্পাদক অজয় সিং আছেন। সেখানে গিয়ে শোনেন দিল্লিতে সমিতির প্রধান এজেন্টদের কাছে যেতে হবে।

গোটা চোদ্দ-পনের শনি-রবিবার ও আরো দু-চারটি স্থানীয় ছুটির দিন সহ মাত্র পঁয়তাল্লিশটি দিন পার করে দিতে আর কটা দিনই-বা লাগে? পঁয়তাল্লিশ দিন পর ত আর কোনো প্রাইজের দাবি আইনত গ্রাহ্য নয়।

কিন্তু এ-সব কায়দাকানুন ছাড়াই কিছু লোককে ত প্রাইজের টাকা সত্যি-সত্যি দিতে হয়েছে। তেমন সত্যিকারের প্রাপকদের তালিকায় দেখা যায়, প্রথম তিনটি খেলায় প্রাইজ পেয়েছেন, এই লটারির বর্তমান সেক্রেটারি অজয় সিং-এর বর্তমান পিতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং, বর্তমান মাতা শ্রীমতী অর্জুন সিং, ও তাঁদের এক বর্তমান পুত্র।

অভিযোগে নাকি বলা হয়েছে যে এই প্রাইজের ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে অর্জুন সিং ভোপালের কাছে তাঁর রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন বলে ইনকামট্যাক্স রিটার্নে হিশেব দিয়েছেন।

কিন্তু, ভারতের পার্লামেন্টের রাজ্যসভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জবাব পাঠানো হয়েছে যে সমিতি সব কাজই আইন-অনুযায়ী করেছে। এই সমিতি এখন, এই সমস্ত অভিযোগ সত্ত্বেও, তাদের কাজের সীমানা বাড়াচ্ছে। ভোপালেও একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। আশা করা যায়—অজয় সিং তাঁর সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে পারবেন।

যে-চার-পাঁচশ বছর আগের কথা উঠেছিল, তখন হয়ত, এই সামাজিক কর্মসূচির প্রয়োজন এত ব্যাপক হয় নি, বা, কারো মাথাতেও আসে নি। ব্যবসা করতে হলে টাকা দরকার আর টাকাও সত্যি আকাশ থেকে পড়ে না। সুতরাং টাকার দরকার হলে যে-ভাবেই হোক টাকা সংগ্রহ করে নিতে হত—চুরি-জোচ্চুরি, ডাকাতি-জালিয়াতি, লুঠ-তরাজ যে-ভাবেই হোক।

ইতিমধ্যে চার-পাঁচশ বছর পেরিয়ে গেছে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র, কল্যাণরাষ্ট্র, ফেডারেশন, রিপাবলিক ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের দেশ বা সরকার বা রাষ্ট্র হয়েছে। অথচ, টাকার দরকার ত আগের মতই আছে। দরকারে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতিও আগের মতই আছে। টাকা ত আর সত্যি আকাশ থেকে পড়ে না। টাকা যাতে তোমার কাছে পৌঁছে যায়, সে-রকম খাল কাটতে হয়। অথবা তুমি যাতে টাকার কাছে পৌঁছে যাও, সে-রকম পথ তৈরি করতে হয়। চার-পাঁচশ বছর আগেও সেই খাল বা পথ, যে-ভাবে কাটা বা তৈরি হত, আজও তাই হয়। মাঝখানে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে বলে ত আর টাকার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বদলায় নি।

শুধু হিশেব আরো দক্ষ হয়েছে, আরো কৌশলী, আরো কুটিল।

......এ-রকমই একটা কুটিল হিশেবের কৌশলী সমাধান খুঁজছে গত মাস ছয়-আট বা তার আগে থেকেই।

......যে-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেটা আইনত সরকারি, কার্যত বেসরকারি।

সারা দেশের সব মানুষের কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠান কিস্তিহারে টাকা আদায় করে, শুধু এই প্রতিশ্রুতিতে যে মরে গেলে মৃত ব্যক্তির পুরো জীবনের যে-দাম সাব্যস্ত হয়েছিল, সেই দামটি কোম্পানি দিয়ে দেবে।

কোন মানুষের জীবনের দাম কত, সেটা নিশ্চয়ই সরকার আইনসঙ্গত হিশেবে বের করতে পারে না, বা, বের করার জন্যে কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারে না। কারণ সংবিধান-অনুযায়ী প্রত্যেক ভারতীয়েরই জীবনের মূল্য সমান। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্টের আইন-অনুযায়ী পরিচালিত এই সংস্থাটি পরিচালিত হয় একমাত্র এই নীতির দ্বারা যে প্রত্যেক মানুষের জীবনের দাম আলাদা ও সে দাম তাদের লিঙ্গ, শ্রেণী, জাতি ও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

একজন চাকরিজীবী পুরুষ, যিনি দু হাজার টাকার ওপর মাইনে পান, যাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চার-এর অধিক নয়, তিনি অনেক কম টাকার কিস্তিতে তাঁর সারা জীবনের একটা উঁচু দাম স্থির করতে পারেন। কিন্তু, তাঁরই স্ত্রী, তিনি যদি চাকরি না করেন ও তাঁর প্রথম প্রসব যদি না ঘটে থাকে জীবনের কোনো দামই পাবেন না। কিন্তু তিনি যদি চাকরি করেন, তাঁর জীবনের এক রকমের দাম সাব্যস্ত হবে। তিনি যদি চাকরিও করেন ও তাঁর প্রথম প্রসব যদি ঘটে গিয়ে থাকে, স্বাভাবিক ভাবে, তাঁর জীবনের আর-এক রকমের দাম সাব্যস্ত হবে। তাঁর প্রসবে যদি সিজারিয়ান করার দরকার হয়ে থাকে, বা, অন্য কোনো গোলমাল হয়ে থাকে, তা হলে, তাঁর জীবনের দাম সাব্যস্ত হবে আরো এক রকমে। যিনি কোনোদিন রিক্সা চড়েন না, এমন-কি, হয়ত নিজের গোটা চার-পাঁচ গাড়িও চড়েন না কাজের জায়গাগুলোতে যাতায়াত [illegible], যিনি হাঁটেন স্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেনে, তাঁরই সামনে বা পেছনে দাঁড়িয়ে, পাড়ায় মোড়ের রিক্সাওয়ালা পাঁচ বছর পর-পর ভোটের সময় ভোট দিয়ে আসে যদিও, কিন্তু ঐ রিক্সাওয়ালা......র প্রতিষ্ঠানের কাছে তার জীবনের কোনো দাম পাবে না। ব্যক্তি হিশেবে, বা ভারতীয় নাগরিক হিশেবে ঐ রিক্সাওয়ালার ত

কোনো মূল্যই নেই, বা, অস্তিত্বও নেই। সে ত রিক্সা কার্ট ভ্যাও চালাতে পারে—তা হলে ? তার ত অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, সে অ্যাকসিডেন্টে রিক্সা বা/ও সে চিরতরে বাতিল হতে পারে—তা হলে ? বা, গুমটি ঘরে যে-দোকান দিয়েছে, বা, নিজেই একটা ছোট কারখানা চালাচ্ছে—না, এদের কারোরই জীবনের কোনো দাম স্থির করা যায় না। অথচ, সেই নিজের মোটর গাড়িতেই চড়া না-চড়া ভদ্রলোক যদি ডায়াবেটিসে ভোগেন আর তৎসত্ত্বেও নিজের জীবনের দাম স্থির করতে চান, তা হলে তিনি উঁচু দাম পাবেন। কে না জানে, তাঁর ডায়াবেটিস আছে বলেই তিনি সব সময় ডাক্তারের হেফাজতে থাকবেন, বিদেশের শেষতম ওষুধ দিন-দুয়েকের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন ; তাঁর মূত্রের শর্করার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে বাড়িতে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটারিও বসে যেতে পারে বই কি। অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসটা কোনো রোগ নয়, জীবনযাপনের একটা ভঙ্গি—যেমন, মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ যাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে দিন কাটাতেন তাঁদের একটু খঞ্জতা ছিল একটা ভঙ্গি, জীবনযাপনের ভঙ্গি।

গত ছ-মাস-আট মাস ধরে……কে এই জটিল অঙ্কটাতেই ঢুকতে হয়েছে। শুধু তাকে নয়, তাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আঞ্চলিক সদর দপ্তরে ও কেন্দ্রীয় অফিসে অথচ জনা আটেক লোক এই হিশেব নিয়ে ব্যস্ত। সে এই পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে আছে। তাকে এখানকার হিশেব দিয়ে কেন্দ্রীয় অঙ্কটাকে মেলাতে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টে কবে নাকি কোনো একজন বিরোধী সদস্য জানতে চেয়েছিলেন যে সমাজের সুস্থ অংশের আর্থিক উন্নয়নের জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা গত আর্থিক বৎসরে ঋণ দেয়া হয়েছে, এবং বীমা প্রতিষ্ঠান এই অংশের যারা বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত তাদের জন্যে কী ব্যবস্থা নিয়েছে!

তার একটা জবাব অবিশ্যি পার্লামেন্টে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে, ব্যাঙ্ক এ-বিষয়ে সত্যি ভাল কাজ করেছে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হয়েছে, এমন-কি সুন্দরবনে নৌকোতে করেও ব্যাঙ্ক ভাসানো হয়েছে। পরন্তু এই দুস্থ অংশের যাঁরা ব্যাঙ্কের ঋণ পেয়েছেন, তাঁরা খুব নিয়মিত ভাবে সব টাকা যথাসময়ে শোধ করেছেন (একমাত্র কৃষি ঋণ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা বাদে, কিন্তু তাঁদের সবাই 'দুস্থ' অংশের অন্তর্ভুক্ত নন ; বস্তুত 'দুস্থ' অংশের অন্তর্গত যাঁরা তাঁরা কৃষি ঋণ পেতেই পারেন না)।

ব্যাঙ্কের এই হিশেবটা বেশ লাগসই হওয়ায় জীবন বীমার কথাটি আর আলাদা করে কেউ তোলেন নি। বরং জীবন বীমার প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে পার্লামেন্টের জবাবে বলা হয়েছিল, পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্প জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

কিন্তু এবার পাশ কাটানো গেলেও, ভবিষ্যতে গোলমাল বাধতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্দেশ এসেছে যে—জীবন বীমাতে অন্তত একটি বা কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করতেই হবে যেখানে সমাজের এই 'দুস্থ' অংশের জীবনের নিরাপত্তা ও, বিশেষত, বিপজ্জনক কাজে যারা স্বনিযুক্ত তাদের জীবনের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়।

অঙ্কটা এখান থেকেই শুরু।……কে শুধু পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে সেই অঙ্কটা প্রয়োগ করতে হয়। সমাজের 'দুস্থ' অংশ বলতে কী বোঝায় সেটা নির্ধারিতই আছে সরকারেরই নিজস্ব ও সমর্থিত নানা গবেষণায়। 'দারিদ্র-সীমা' নামে তার একটা কাল্পনিক পরিবর্তনশীল রেখাও আছে। দেশলাই, কেরোসিন, বছরে একটা গামছা, লবণ—এই চারটি জিনিশও কিনতে পারে না ভারতের ২৭ কোটি মানুষ। 'দুস্থ' অংশ বলতে এদের নিশ্চয় ধরা হচ্ছে না। বা, এদেরও 'দুস্থ' ধরা যায় সরকারের অন্য কোনো কর্মসূচিতে। কিন্তু জীবনের বীমা করা যে-প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা, তারা এমন কোনো জীবনকে জীবন বলে কি স্বীকার করে নিতে পারে যে জীবনের স্বত্বাধিকারীর কোনো 'আর্থিক কাজকর্ম', ইকনমিক অ্যাকটিভিটি, নেই। এ-প্রতিষ্ঠানের কাছে 'জীবন'-এর অর্থ, জীবিতাবস্থায় একটি মানুষের আর্থিকমূল্য নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তার মৃত্যু হলে, প্রত্যাশিত সময়ের আগেই তার মৃত্যু হলে, সেই আর্থিকমূল্য—অস্থায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়। তা হলে, ……র এই প্রতিষ্ঠানের কাছে দুস্থতার একটা নিম্নতম সংজ্ঞা আছে—নিজের ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রেখে কোনো অবস্থাতেই এই প্রতিষ্ঠান সেই সংজ্ঞা অতিক্রম করতে পারে না।
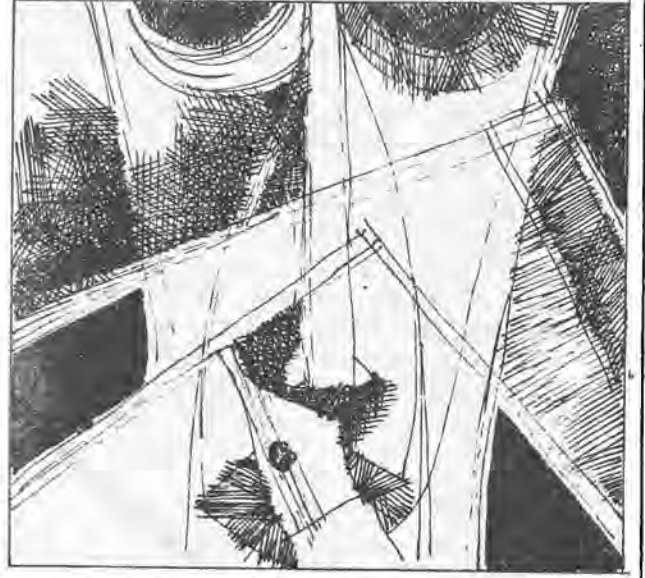
……যে অঙ্ক নিয়ে গত ছমাস-আটমাস ব্যস্ত তার প্রথম কাজটিই ছিল তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার নীতির মধ্যে এই দুস্থতার সংজ্ঞা ঠিক করে ফেলা। আর, সেটা ত এক-এক জায়গায় এক-এক রকম হতে পারে না। নানা জায়গার ভিতরে চিঠিপত্র লেনদেনের মধ্য দিয়ে এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে স্বনিযুক্ত যাদের মাসিক আয় তিনশ টাকার বেশি নয়, তাদের এই দুস্থ অংশের অন্তর্গত ধরা হবে এবং তাদের জীবন ও আয়ের নিরাপত্তা যাতে রক্ষিত হয় সে-রকম কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

এই অঙ্ক কষতে-কষতে……সব সময়ই একটা কৌতুকনাট্যের একক অভিনেতা হয়ে যায়। তাদের এই ব্যবসার মূল ভিত্তিই হল ব্যক্তির জীবনের অর্থমূল্য। সেই অর্থমূল্য ব্যক্তির জীবনকে ছাপিয়ে পরিবার, পরিবার ছাপিয়ে সমাজ, সমাজ ছাপিয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে বটে, কিন্তু, ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক উপাদান যে-ব্যক্তিজীবনের অর্থমূল্য তাকে ত অপরিবর্তিত রাখতেই হবে। সেটা অপরিবর্তিত থাকলেই আগুন, বৃষ্টি, দাঙ্গা, চুরি-ডাকাতি—এই সব সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে খদ্দেরকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া যায়, অর্থের বিনিময়ে। সেই ব্যবসার মধ্যে কল্পনাশক্তি আছে, কিছুটা দুঃসাহসিকতাও। যেমন, সম্প্রতি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হল—ক্যানসার বীমা। ক্যানসারের আক্রমণ আর চিকিৎসা এমনই অনিশ্চিত যে সেখানে জনসাধারণের সেবা আর জনসাধারণের কাছ থেকে মুনাফা একই সঙ্গে লুটে নেয়া যায়। যারা ক্যানসারকে ভয় পায়, ক্যানসার হলে চিকিৎসার খরচা বইতে পারে—তাদের কাছে এ বীমা কিছুটা স্বস্তিকর। অন্তত ঐ খাতে নিয়মিত টাকা জমা দিলেই নিশ্চিন্ত। এবং যে-অঙ্কের ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে যারা বীমা করবে তাদের শতকরা দুই ভাগও ক্যানসারে আক্রান্ত হবে না, সে অঙ্কে……র কিছু অবদান আছে।

কিন্তু সে অঙ্কেরও কিছু মানে আছে। এ-অঙ্কের কোনো মানেই নেই। 'স্বনিযুক্ত' মানে ত আর ব্যবসায়ী শিল্পপতির কথা কেউ ধরছে না। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ছোট পানের চায়ের দোকানি—এ-সব লোকদের বীমা হবে কোন ভিত্তিতে ? তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা নেই, শরীরের নিশ্চয়তা নেই, জীবনের নিশ্চয়তা নেই। যে-কোনো একটা জীবিকা অবলম্বন করে জীবনধারণ করতে যে-বাধ্য, তার জীবনের কোনো গ্যারান্টি কি কোম্পানি নিতে পারে ?

গত কয়েক মাসের চিঠিপত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই তালিকাটি ক্রমেই বাড়ছে। এক-এক অঞ্চল থেকে এক-এক রকম তালিকা আসছে। পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিতে যারা নিযুক্ত, তাদের কি এই প্রকল্পে আনা যাবে ? নাকি, তাদের জন্যে 'আর্টিজান' গ্রুপ বলে আলাদা একটা শ্রেণী করা হবে ? যারা রং করে—জাহাজ, কিংবা মাল্টিস্টরিড বিল্ডিং, বা ডিপ-টিউবওয়েলের

জলের ট্যাঙ্ক, বা, হাই টেনশন বিদ্যুতের টাওয়ার—তাদের কি এই প্রকল্পের ভিতর নেয়া যাবে ? যারা 'এক্সপ্লোসিভ', বাজি বানায়, তাদের ? কোনো এক জায়গা থেকে প্রশ্ন এসেছিল—পুরোহিতরাও ত স্বনিযুক্ত, তা হলে তাদের কি গ্রহণ করা হবে ?

এই সব অঙ্কের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, সেই নিয়মে অঙ্ক মিলে যায়। মেলানোর সূত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে আসে না, সমস্যার ভিতর থেকেই আসে। ধীরে-ধীরে……-কে ও অন্যান্য অঞ্চলে তার মতই অন্যদের বুঝে নিতে হয়েছে এই প্রকল্পটি তাদের কোম্পানির নিয়মিত প্রকল্পের কোনো অংশ নয়, বরং, আশঙ্কা আছে, এতে ক্ষতিই হতে পারে। সরকারের অর্থবিভাগ থেকে আদেশ এসেছে—সেই আদেশ মেনে একটা প্রকল্প নিতে হবে। প্রকল্প নেয়াটাই বড় কথা, যাতে পার্লামেন্টে আবার কোনো দিন প্রশ্ন উঠলে, মন্ত্রীর পক্ষে, সে যে-পার্টিরই মন্ত্রী হোক, জবাব দেয়া সহজ হয়ে যায়। এই প্রকল্পে কেউ আসুক চাই না আসুক সেটা সবচেয়ে বড় কথা নয়। আপাতত প্রকল্পটাই বড় কথা। ভবিষ্যতে কখনো অবিশ্যি আবার প্রশ্ন উঠতে পারে মোট কত লোকের কাছে এই প্রকল্প পৌঁছে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। আর 'জনসাধারণ' যেখানে জড়িত সেখানে সব হিশেবই কী এক পদ্ধতিতে মিলে যায়।

……-র কৌতুক এই জায়গায় যে এই প্রকল্পটি কী ভাবে তাদের মত জনা পাঁচ-ছয়ের বুদ্ধিতে একটা বেশ বৈজ্ঞানিক আকার নিচ্ছে। এই ধরনের জীবিকায় নিযুক্ত মানুষরা এত তাড়াতাড়ি জীবিকা বদলায় যে তাদের হদিশ রাখাই সবচেয়ে কঠিন। এমন-কি তাদের স্থায়ী কোনো বসত-বাড়িও নেই। এদের একটা প্রকল্পের মধ্যে আনা যাবে কী করে ?

এখন এই প্রশ্নের একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠিক উত্তর পাওয়া গেছে।

এদের ব্যক্তিগত জীবিকা ও জীবনের নিশ্চয়তা যেহেতু নেই, এদের ব্যক্তিগতভাবে বীমার ভিতরে আনা সে-কারণে সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার ও কোম্পানির উদ্দেশ্য এদের জীবিকার নিশ্চয়তা দিয়ে জীবনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বীমার বদলে গ্রুপ বীমা চালু করা উচিত। গ্রুপের প্রতিটি লোক, প্রতিটি লোক সম্পর্কে দায়ী থাকবে। একজন যদি প্রিমিয়াম দেয়া বন্ধ করে, তা হলে কোম্পানি দায়িত্ব নেবে না। প্রত্যেককে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রত্যেকে ঠিক মত প্রিমিয়াম দিচ্ছে।

অঙ্কটা এই পর্যন্ত মেলার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন তৈরি হয়, তা হলে কি শুধু বীমা করার জন্যে একটি জীবিকার কিছু লোক একত্রিত হয়ে গ্রুপ তৈরি করতে পারে ? যেমন, সমবায়ে করে ?

……ও তার অন্যান্য পাঁচ-ছয় সহকর্মীর মধ্যে অনেক চিঠি পত্র বিনিময়ের পর এই অঙ্কটারও একটা সমাধান মেলে।

এটা হতে পারে কিন্তু এতে একটু ভয় আছে। নানা জায়গার নানা লোক একই বৃত্তির সুবাদে একত্রিত হলে—তাদের পরস্পরের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে কী করে ? কে প্রিমিয়াম দিল ও কে দিল না, সেটাই-বা অন্যেরা জানতে পারবে কী করে ?

সুতরাং ভৌগোলিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে, উৎপাদনগত কারণে বা বসবাসের কারণে যদি এই বৃত্তির লোকরা কোনো একটি সংগঠন তৈরি করে থাকে, তা হলে কোম্পানি সেই সংগঠনকেই গ্রুপ হিশেবে মেনে নেবে কিন্তু বীমা করার জন্যে কোনো গ্রুপ তৈরি করলে তাকে মানবে না।

তার মানে কি কোম্পানি ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশনকে কার্যত স্বীকৃতি দিচ্ছে ?

হ্যাঁ। কার্যত। কারণ, ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন হলে কোম্পানি একটা মোটা-মুটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে। না। আইনত না। কারণ, তা হলে ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন কর্মচারী বা সদস্যদের ওপর তার প্রভাব আরো গভীর ও বিস্তৃত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। কোম্পানি সে-রকম কোনো সুযোগ দিতে পারে না। সুতরাং ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশনের সংহতিকে কাজে লাগানোর জন্যে সেটাকেই গ্রুপে বদলে নিতে হবে। অর্থাৎ, লেখা না-থাকলেও প্রকল্পটি এই রকম হবে—যেখানে একটি বৃত্তির লোক রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন তৈরি করেছে একমাত্র সেখানেই এই প্রকল্প কার্যকর করা যাবে।

কিন্তু যদি কোথাও এক বা একাধিক ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন থাকে ?

ঐ সব গোলমালে কোম্পানি ফাঁসবে না। যে-ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন নিজেদের গ্রুপে বদলে নিতে রাজি থাকবে ও বদলাবে—সেখানে এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে, অন্যত্র নয়।

এই পর্যন্ত ঠিক হওয়াই অনেকটা।

এখন ……-কে তার এই পূর্বাঞ্চলের সমস্ত ডিভিশনকে চিঠি লিখে জানাতে হবে, সাধারণ যে-সব বৃত্তিতে স্বনিযুক্ত লোকজন থাকে, তার বাইরে কোনো জায়গায় কোনো বিশেষ বৃত্তি আছে কিনা, যেমন পুরুলিয়ায় কুয়ো খোঁড়ার বৃত্তি।

অফিসের এই সব হিশেব-নিকেশ অফিসের মত করেই এগোয়। কিন্তু……-র কাজের ধরনটাই এই যে অফিসের দৈনন্দিন কাজে জড়িত না থেকে, তাকে শুধুই ভবিষ্যতের কাজের ক্ষয়ক্ষতির বা লাভ-মুনাফার হিশেব কষে যেতে হয়। সে হিশেব এই সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই বিস্তৃত বটে কিন্তু……আসলে কাজ করে কেন্দ্রীয় অফিসের প্রয়োজন অনুযায়ী, আঞ্চলিক অফিসের প্রয়োজন অনুযায়ী নয়। যেমন, কোনো সৈন্যবাহিনীর একটা অংশের দায়িত্ব নিয়ে কেউ-একজন কোনো এক অঞ্চলে থাকে।

ফলে, এই অফিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটু শিথিল। সেই শিথিলতার অবকাশ দিয়েই তার কাছে প্রায় সকলেই আসে, একটু-আধটু গল্পগুজব করে, এক-আধ কাপ চা খায়, চলে যায়। কিন্তু সেই সূত্রে……-র জানা হয়ে যায় এই অফিসের স্রোত-বিপরীত স্রোত-উপস্রোতের ঠেলাঠেলি।

সেই ঠেলাঠেলির স্রোতের ভিতর সে কোথাও নেই কিন্তু সে-কারণেই বোধহয় এই এত বড় অফিসের এত লোকজনের মধ্যে তার একটা একটু আলাদা গ্রাহ্যতা আছে—এ-সমস্ত অফিসে তেমন যেটুকু গ্রাহ্যতা সম্ভব। এমন-কি, ইংরেজিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট বাংলায় কেরানিদের মধ্যেও কেউ-কেউ তাকে অন্তত পরিচিতির খাতির দেয়, এমনই এক উদারতা থেকে, অফিসার বা একটু বড় অফিসারই হওয়া সত্ত্বেও, তাদের চাকরির উন্নতি অবনতির সঙ্গে, প্রাপ্য পাওয়া না-পাওয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

অথচ……-র সমস্ত কাজটাই ত শুধু তাই নিয়ে। শুধুমাত্র অঙ্ক কষে যাওয়া, অঙ্ক কষে-কষে কোম্পানিকে জানানো যে কোন জীবন কোন বীমার পক্ষে কত নিরাপদ, কোন জীবনের বীমামূল্য কতর বেশি হলে বিপজ্জনক।

শুধু তাই নয়, অঙ্ক কষে-কষে কোম্পানিকে এ কথাও তাকে জানাতে হয়—এখন এই এক-একটি অঞ্চলে, বা বিভাগে, যত কাজ যত হাতে হয়, তার আনুপাতিক উৎপাদন ক্ষমতা কত দাঁড়ায় ; সে-উৎপাদন ক্ষমতা যন্ত্র দিয়ে বাড়ানো যায় কিনা ; তাতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সংখ্যা কমে যেতে পারে কিনা ; কমে গেলে কত দিনে কত কমবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই নিয়েই তার দ্বিতীয় অঙ্কের আধুনিক ব্যস্ততা। তাতে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টের কোনো ওভার টাইমের বিল আটকে দেবার মত খারাপ কাজ হয়ত তাকে করতে হয় না, কিন্তু, সেই অ্যাসিস্ট্যান্টের পনের-বিশ বছরের অতীত চাকরি, আর, আরো হয়ত পনের-বিশ বছরেরই আগামী চাকরি মিলিয়ে একজন গড় বাঙালির, বা ভারতীয়ের, গড় ষাট বছরের জীবনের, গড় ত্রিশ-চল্লিশ বছরের সাবলকতার সবটা এখন তাকেই,……কেই, অঙ্কের নির্বস্তুক সূত্রের ছাঁদে ফেলতে হয়, ফেলতে হচ্ছে, যে একটা লোক আরো পনের-বিশ বছর যদি কাজ না করে, অর্থাৎ, যদি তাকে কাজ করতে দেয়া না হয়, অর্থাৎ, এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে লোকটির যদি কোনো অস্তিত্বই না থাকে, অর্থাৎ, লোকটি যদি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কার্যত একটা মৃত লোক হয়ে যায়, এবং, এটাকে একটা নীতি হিশেবে গ্রহণ করে যদি হাজারে-হাজারে কর্মীকেই মৃত ধরে নেয়া যায়, তা হলে যন্ত্রের সাহায্যে কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা কত বাড়ানো যায়। কর্মীর, সে একটা মানুষও বটে, সুতরাং মানুষের 'মৃত্যুতে' কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, অনেক কর্মীর 'মৃত্যুতে' আরো অনেকগুণ বেড়ে যায়—এই সব হিশেব মেলানোর কাজে তার দ্বিতীয় অঙ্কের গোপন ব্যস্ততা, ভবিষ্যতের এক পাঠ সংখ্যার গোপনলিপির ভিতর সেঁদিয়ে দেয়া, বিজ্ঞানের সূত্রকে মানুষের দৈনন্দিনে ব্যবহারের এক নির্বস্তুক, নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানে……শুধু, সেই অপরিহার্য ব্যক্তিটি, যাকে ছাড়া বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হতে পারে না।

ধারাবাহিক

স্মিতা দত্তরায়-ই এখন এশিয়ার সেরা তীরন্দাজ

যেদিন থেকে ভারতবর্ষের ক্রীড়া জগতে তীরন্দাজীর সূত্রপাত সেদিন থেকেই বাংলার মেয়েরা নিখুঁত তীর ছোঁড়ায় সবার ওপরে। কিংবদন্তীর কৃষ্ণা দাস, বা রুমা দে-র পর বাংলা আরও একজন ভারত-সেরা তীরন্দাজকে তুলে এনেছে। স্মিতা দত্তরায় এই মুহূর্তে শুধু ভারত-সেরা তীরন্দাজ-ই নয়, এশিয়াতেও ওর সমকক্ষ খুব কম তীরন্দাজ-ই আছে।

বাবা শৈলেন দত্তরায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী এবং গুণী সঙ্গীতশিল্পী। চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা শুধু পড়াশুনোতেই নয় অন্য ব্যাপারেও পারদর্শী হোক। সেই সুবাদে স্মিতা ছোটবেলাতেই পাড়ায় তালতলা উন্নয়ন সমিতিতে ভলিবল খেলার জন্য ভর্তি হয়। হঠাৎই আলাপ হয় রথীন দত্তের সঙ্গে। উনি ওকে তীরন্দাজীতে ভর্তি করে দেন প্রায় জোর করেই। প্রথম প্রথম টালিগঞ্জ বন্দীপুর রোড থেকে সিঁথিতে কলকাতা আর্চারি ক্লাবে এসে অনুশীলন করতে খুবই অসুবিধে হত, কিন্তু যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোচ চন্দ্রকুমার দাসের হাতে পড়ল, সেদিন থেকেই পথশ্রম ভুলে শুধুই তীর আর ধনুক নিয়ে মগ্ন। ১৯৮০-তে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বসেছিল এশিয়ান তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা। আঠার বছরের স্মিতা প্রায় শেষ সময়ে দলে ঢুকে সবাইকে অবাক করে রীতিমত ভাল তীর ছুঁড়েছিল। তার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের অভ্রান্ত নিশানা দেখে চীনের কোচ আলাদা করে বলেছিলেন 'ফাঁকি দিও না। তুমি আরও ভাল করবে।'

তারপর থেকে সিওল, মস্কো, জাকার্তা বা দিল্লি এশিয়াড যেখানেই ভারতীয় দল গেছে স্মিতা সেখানেই ভারতীয় দলভুক্ত। আর গত বছর দিল্লির জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে বাংলার তীরন্দাজদের জয়জয়কার। এ ব্যাপারে স্মিতার ভূমিকা ছিল সবার ওপরে। তিনটে সোনা সহ মোট আটটি পদক পশ্চিমবাংলাকে তার উপহার।

বর্তমানে লেকভিউ ক্লাবের সদস্যা স্মিতার এখন একটাই চিন্তা—আগামী এশিয়াডে ভাল ফল করা। পাতিয়ালায় ক্যাম্প শুরু হয়ে গেছে। স্মিতা [illegible] এ· পরীক্ষা দেবার জন্য রয়ে গেছে কলকাতায়। □

শুধু নিজের জন্যে নাচতে চাই না

অমিতা দত্ত

নৃত্যশিল্পী হিশেবেই স্বদেশে আজ আমার পরিচয়। বিদেশে গমন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে নাচকে পেশা বলে মনে করতে আমার অস্বস্তি লাগে। পেশার মধ্যে দৈনন্দিন উপার্জনের ইঙ্গিত থাকে। যে নাচের মধ্যে আমি মানসিক তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই—তাকে পেশা বলি কি করে? কিন্তু নৃত্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি পেশাদারী মানসিকতা আমার কাজ করে। মনে হয়, সেটাই উচিত। তবে কি নেশা? না, তাও নয়। নেশার মধ্যে এক ধরনের অচেতন আনন্দ-বিলাসিতা কাজ করে বলে আমার মনে হয়।এই মনে-হওয়াটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা। এখন ভুরু কুঁচকিয়ে কেউ যদি এই প্রশ্ন রাখেন, 'পেশাও নয়, নেশাও নয়, তবে কি?'—আমি সবিনয়ে উত্তরে বলব, আমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় নাচি। নৃত্যের কাছে ভালোবেসে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। অর্থ উপার্জন বা অবসর-বিনোদনের জন্যে এই মহৎ কলাবিদ্যাকে বেছে নিই নি।

'বেছে নেওয়া' কথাটা যখন বললাম, তখন আরো একটু পরিষ্কার করে বলি, কোনো দিন পেশাদারী নৃত্যশিল্পী হব, এমন আকাঙ্ক্ষা আমার আদৌ ছিল না। গান শিখতাম, পিয়ানো বাজাতাম। ছবি আঁকতাম। যে গানের স্কুলে গান শিখতাম, সেখানেই নাচের ক্লাসে গিয়ে মাঝে মাঝে বসতাম। যিনি নৃত্যের শিক্ষক ছিলেন তিনিই একদিন বললেন, তোমার যখন এ ব্যাপারে এত আগ্রহ আছে তখন নাচটা শেখোই, না কেন?

আমার আগ্রহ এই ভাবে গড়ে উঠলেও বাড়ির লোকজনদের আগ্রহ কিন্তু ছিল না। গান-ছবি আঁকা-পিয়ানো শেখা—এসব করে সময়ই বা কোথায়? আর ভবিষ্যতে নাচকে পেশা করার ব্যাপারটা যেহেতু ছিল না, বাড়ির আপত্তিটা সেক্ষেত্রে আর একটু জোরালো হল। কিন্তু কথায় বলে, ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে? এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই ধরনের হয়ে গেল। বন্দনাদি (প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বন্দনা সেন) বাড়ির লোকজনদের বোঝালেন। এক সময় শুরু হল তালিম নেওয়া। তারপর ভারতের প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজ, বেলা অর্ণব ও বিজয় শঙ্করের কাছে নাচ শিখেছি। ধীরে ধীরে নিজেকে গড়েছি। নৃত্যগুরুদের শিক্ষা, পারিবারিক অনুপ্রেরণা, আত্মীয়-বন্ধুদের শুভার্থী ভূমিকায় অমিতা দত্ত কথ্থক নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্তয় রূপান্তরিত হয়েছে।

গান এখন গাই না। বসি না পিয়ানোর সামনে। শুধু মাঝে-মধ্যে ছবি আঁকি। কিন্তু গান বা ছবি আঁকা আমার নাচকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। নাচে আছে দৃষ্টি আকর্ষক ভঙ্গি আর চিত্তাকর্ষক সুর। আসলে সব সুন্দর কলাবিদ্যাও গিয়ে নাচে মিলিত হয়। এ-সব কথা বলে নাচের প্রতি অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছি না। নাচের মধ্যে আছে ভাব, সুর, তাল, গতি ও ব্যাপ্তি। এগুলির মিলিত রূপ চোখ আর কানের মাধ্যমে আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করে।

আজ নৃত্যশিল্পীরূপে আমি যদি সামান্য স্বীকৃতি পেয়ে থাকি সেই প্রাপ্তির মধ্যে নিশ্চয়ই আমার পরিশ্রম আর নিষ্ঠা যুক্ত রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা লোকের অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যও আমাকে কষ্ট দিয়েছে। খাজুরাহো উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বপ্রথম আমিই প্রতিনিধিত্ব করি। শুধু বাংলা কাগজ নয়, অন্যান্য ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাতেও আমার সম্বন্ধে প্রশংসা করা হয়েছে। এই আমন্ত্রণ এবং প্রশংসাকে আমার সাধনার স্বীকৃতি হিশেবে মনে করি।

বলতে দ্বিধা নেই, আমার সামান্য পারিবারিক অর্থকৌলিন্য থাকলেও, বাড়ির আবহাওয়া আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো। সেই সঙ্গে খুব বাস্তব কথাটা হচ্ছে যে আমার বাবা বা স্বামী নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদে আমাকে উৎসাহ দিলেও কখনোই আমার অনুষ্ঠান পাওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ভূমিকা নেন নি, নেবেনও না। আর তার প্রয়োজনও হয় নি। বড়ো বেশি গুরুগম্ভীর কথাবার্তায় চলে যাচ্ছি। এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

যদিও গবেষণার কাজ চলছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়াশোনা ছেড়েছি। তাও এই নৃত্যের জন্যে। সে ক্ষেত্রেও কেউ-কেউ প্রশ্ন রেখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ ছাড়লাম কেন? বলে রাখি, বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্মানিত সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি কোনোরকম ভাবে ছোটো না করেই বলছি— নাচে যে পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা বোধ আমি পেয়েছি, তা অধ্যাপনায় পাই নি। বিদ্যাদান নিঃসন্দেহে এক মহৎ পেশা কিন্তু আমার কাছে নাচই অনেক বেশি মনে সাড়া তুলেছে। আর সেই কারণেই নৃত্যের ক্ষেত্রে যুক্ত থাকব বলে আমি অধ্যাপনার কাজ থেকে সরে এসেছি। এই প্রসঙ্গে কারো কারো প্রশ্ন ছিল ছাত্র-ছাত্রীরা কী ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। একজন পরিচিত নৃত্যশিল্পী এম-এ ক্লাসে কী রকম ইংরেজি পড়াচ্ছেন আর ছাত্রছাত্রীরাই বা কেমনভাবে অধ্যাপিকাকে গ্রহণ করছেন? এ প্রশ্নর একটাই উত্তর—আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমি সম্মান পেয়েছি, শ্রদ্ধা পেয়েছি। আমিও শুধু শিক্ষক ছিলাম না, তাঁদের বন্ধু ছিলাম। দিদি ছিলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই জানতেন আমি নৃত্যশিল্পী। অনুষ্ঠানে গিয়েছেন, সমালোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে জানিয়েছেন। আজও দেখা হলে ছুটে এসে আমার খবর নেন। প্রণাম করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উৎসবের সময় আমি অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুষ্ঠান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইংরাজি বিভাগ ছাড়াও অন্য বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিলেন। আমার অনুষ্ঠানে তাঁরা গর্ববোধই করেছেন।

দর্শকদের কথাই বা বাদ দিই কেন? আমি যখন যেখানে অনুষ্ঠান করি, সেখানে দর্শকদের কথা মনে রেখেই নাচটাকে সহজভাবে উপস্থিত করি। তার বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে দিই। আমি চাই যে দর্শকরা আকৃষ্ট হয়ে নাচের সঙ্গে একাত্ম হোন। সেইজন্যেই সংগীত সম্মেলন ছাড়া আমি আসরে গুরুগম্ভীর লয়কারী বা জাতি বিচার দেখাই না। বোল আসে গানের মধ্যে, নাচের বর্ণনার মাধ্যমে বা তারানার এবং যন্ত্রসংগীতের

সঙ্গে যুগলবন্দীর সময়ে। অনুষ্ঠানের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি মূর্ত করি। যেমন সীতাহরণ বা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এ-সব গল্প তো সকলেরই জানা। তার ফলে দর্শকরা সহজেই নৃত্যের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে নিতে পারেন! দর্শকদের ক্ষেত্রে আমার কোনো অভিযোগ নেই। দু-একজন অতি-উৎসাহী অনুরাগীর দর্শন যে মেলে নি, তা নয়। কিন্তু তারজন্যে কোনো অসুবিধা হয় নি। আবার ছোটো ছোটো কিছু স্মৃতি মনে দাগ কেটে দিয়েছে। মনে পড়ছে একটি বাচ্চা ছেলে এক অনুষ্ঠান-শেষে আমাকে এসে বললে, তোমার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনকে আমার মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল। দ্রৌপদীর কী দুঃখ বলতো! মনটা সেদিন ভরে গিয়েছিল আমিই প্রত্যেকটি চরিত্রে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটি নাচের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে সে দ্রৌপদীর দুঃখে দুঃখী হয়ে দুঃশাসনকে মারবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল।

বিভিন্ন দর্শকের মুখে একটা কথা বার বার শুনি। তাঁরা বলেন, "আমরা তো নাচের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আপনার নাচ ভীষণ ভালো লেগেছে।" এত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁরা মন্তব্য করেন যে মনে হয় না কোনো আতিশয্য আছে। আমার কাছে কিন্তু এই উপলব্ধি করা, একাত্মবোধ করাটাই মুখ্য। নৃত্য এবং অন্য সব কলাবিদ্যাকে গ্রহণ করতে হয় মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। না বুঝে যদি ভালোলাগানো যায় তা হলে বোঝার প্রয়োজন কি। আমরা নাচের অনুষ্ঠানে বসে বসে কেবল যদি মাত্রা গুণি আর বিশ্লেষণ করি, তা হলে তো অনুভূতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হাঁ, নাচের তত্ত্ব জানা থাকা ভালো, কিন্তু কেউ যদি সেটা না জেনে, নাচকে উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তাঁর অনুভূতির মাত্রাও কোনো অংশে কম নয় বলে ধরতে হবে।

আমার নাচের প্রতি অনুরাগ দেখে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, ভবিষ্যতে কোনো ভালো চাকরি পেলে আমি করব কি না কিংবা অধ্যাপনায় ফিরে যাব কি না? আমার চাকরি করার ইচ্ছে নেই। অন্তত এখন তো নেই। আসলে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। কলাবিদ্যার মধ্যে আত্মস্থ থাকলে অন্য কোনো কাজে সময় দেওয়াতে বেশ অসুবিধা হয়। তবে সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা তো করতেই হবে। সাহিত্যে মানুষ, জীবন, সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা আসে, অভিজ্ঞতা বাড়ে। সাহিত্যের মধ্যে অনেক কিছু পেয়েছি যা আমার নৃত্যের ক্ষেত্রে সব সময়ই কাজে লাগে। লাগবে।

কতদিন নাচের জগতে থাকব?—যতদিন ক্ষমতা থাকবে। যতদিন দর্শকরা চাইবেন। তার পরে হয়ত প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চে নয়, কিন্তু নৃত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখব, আলোচনা করব। আর তৈরি করব ভবিষ্যত নৃত্যশিল্পীদের। আসলে এই জগতে থাকব।

আমার জীবনে নাচের ভূমিকা একটা ব্রত পালনের মতো

দেয়ালা

উদয় ভাদুড়ী

॥ বিশালাক্ষী ॥

শুঁড়ার এই ব্রহ্মডাঙায় তিথি নক্ষত্র দেখে প্রথম কোপ দিয়েছিল খোঁদন ভল্লা। পুরুত তখন ঘণ্টা নাড়ছিল। ন-তরফের কাছ থেকে ধার করা জোড়া বলদ গলায় জবার মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাঙ্গলটি চালু হবার আগে মন্ত্রপূত খোঁদন বয়সের ভার টের পায়।

তিন দিন তিন রাত ক্রমান্বয়ে বৃষ্টিতে এই টাঁড় জমিও কিঞ্চিৎ সরস। কোথাও কোথাও মাটি ফেটেছিল—শিসল, মোথা ঘাসের মাথা উঁকি দেবার সবুজ সম্ভাবনা ঘন হয়েছিল। মাটিতে জো এসেছিল, ঘ্রাণ এসেছিল।

কিন্তু গগনমুখো এই কচি হাত, যা কিঞ্চিৎ পুব দিকে হেলে সূর্যোদয়ের দিক নির্দেশ করে, তা ভেতরে ভেতরে চল্লিশ চাষার বুক কাঁপিয়ে দেয় যেন রাতে খোঁদনের তো কাঁপ ধরেই ছিল। সে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, "হেই মা বসুমতী, কুথাকে লুক্কায়ে রাখিলছিলি আমার দুখিনী মায়েরে—হেই সীতা মাই গো!"

সমবেত চাষা এবং যাদের এয়োতীরা তখনও পবিত্র ছিল, তারা একযোগে উলু দিল। পাঁচু বায়েন কখন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল—তার ঢাকে যেন বলে ওঠে, কাছ থেকে যারা সেই গলিত শব প্রত্যক্ষ করে, তাদেরই কেউ "বিটি ছাওয়ালই বটে হে···।"

চল্লিশ চাষার হাহা ধ্বনি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছায়। খোঁদন আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, শুদ্ধলয়ে বুকে চাপড় মারে। এই শোকের মূলে নাদনঘাটির আগমার্কা আরকের প্রভাব ছিল। ফলত তার বুক ফাটা কান্না ব্রহ্মডাঙার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। আকাশে তার ঢেউ লাগে—দুলে দুলে বিশালাকৃতির মেঘের সঞ্চার হয়।

শুঁড়ার ব্রহ্মডাঙা অন্ধকার করে, চরাচর অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টিতে খোঁদন ভল্লা ভেজে। সদ্যোজাত এক শিশুর গলিত শব ভেজে। চল্লিশ চাষা আকাশের দিকে একপলক তাকিয়ে কোদাল, দাবড়ী, শাবল লাঙ্গল হাতে তুলে নেয়। তারাও ভেজে। "জয় মা বিশালাক্ষী" ধ্বনিতে শুঁড়ার টাঁড় জমিতে ক্রমে ফাটল ধরে। এ সেই প্রত্যাশিত ফাটল—এর

কোদাল—যাতে লাল টকটকে করে তেল সিঁদুর মাখানো ছিল, কপালে ঠেকিয়ে "জয় মা বিশালাক্ষী" বলে শুঁড়ার এই টাঁড় জমিতে প্রথম কোপ দিয়েছিল খোঁদন ভল্লা। সেই কোপে আড়াই হাত দূরের একটা পাথুরে চাঙড় চড়াৎ করে ফেটে যায় আর মা বসুমতীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে একটি কচি হাত।

সেই কাক-ডাকা ভোরে শুঁড়ার জনা চল্লিশ মানুষ হা হা করে আর্তনাদ করে ওঠে। সাতসকালে ব্রহ্মডাঙায় অহল্যা ভূমিতে কোদালের পয়লা কোপ চোপানোর আগে খোঁদন দু-পাত্তর চড়িয়েছিল। খালি পেটে গেঁজিয়ে ওঠা সেই অমৃত—তার হাঁটু, কব্জি আর কনুই-এর অন্ধিসন্ধিতে কেমন যেন চারিয়ে পড়েছিল। বর্ষার সোঁদা লেগে ছিল। কাঠি পড়ে ঢাকে আওয়াজ উঠল ঢ্যাব্-ঢ্যাবা-ঢ্যাং-ঢ্যাং-ঢ্যাবা-ঢ্যাব্। তখন খোঁদন ভল্লা, মাটিতে মুখ গুঁজে হাঁটু গেড়ে চিত্রার্পিত। যতক্ষণে আশপাশের লোক নখে-কোদালে, পাথরের চাঙড় সরিয়ে আলগা মাটি খামচে ধরে, অনেকটা সেই ভয়াবহ গর্ভগৃহ থেকে আলোতে টেনে আনার নিপুণ জটিল কায়দায় সদ্যোজাত এক শিশুর গলিত শব টেনে বের করে—ততক্ষণে খোঁদনের ফিসফিস গুজগুজ করে মাটির কানে কানে ফুস্‌মন্তর পড়া শেষ। পুবদিগন্তের চাপা লাল আলোর সামনে কালো মেঘের আঁকিবুকি মাঠে এক স্তব্ধতার সঞ্চার করে। সকালের পাখিরা ডাকতে ভুলে যায়। কে সঙ্গে আমন ধানের স্বপ্ন, জাউভাতের গন্ধজারিত হয়।

[পবিত্র এয়োতীদের উলুধ্বনিতে বৃষ্টি পড়ে।

এখন খোঁদন ভল্লা কী করে মৃত্যুর একমাস পরের গলিত শব দেখে সেটিকে আপন বংশজাত, রক্তের আত্মীয় নিজের নাতনী বলে সনাক্ত করে; সেটির সদ্‌ব্যাখ্যা ভল্লাদের গাঁয়ের কেউ দিতে পারে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা খোঁদনের আতঙ্কের শরিক ছিল নির্ঘাত। কারণ ওই গলিত শিশুর শব দেখে তারাও একযোগে আর্তনাদ করে উঠেছিল। কারণ শুঁড়াতে এই ব্রহ্মডাঙা এতকালে জমিদারবাবুদের তৌজিতে পতিত বলে পড়েছিল। বড় বড় পাথরের চাঙড়, লাল কাঁকরে এ জমিতে

দুপাশের নদী পেরিয়ে...., থাক সে হলো গিয়ে মানুষের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস, যা এসব সমীক্ষায় নিতান্তই কর্মাবশে, ভূমিকা হিশেবে ব্যবহৃত হয় বা হতে দেখা যায়।

১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এতদঞ্চলে প্রতি একশ পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৮৩। একারণে পঞ্চাশ সালে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের গণিকাপল্লীতে এসব এলাকা থেকে যে পরিমাণ নারীদেহ যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, পরবর্তী দশকে তা পাঁচ, দশ শতাংশ হারে, অনিবার্যভাবে কমতে থাকে। এবং ১৯৭১ সাল নাগাদ অসমর্থিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে ওইসব অস্ট্রিক নারী অধ্যুষিত পল্লীগুলি ক্রমশ আর্যাবর্তের এবং সংশ্লিষ্ট বিহার এলাকা থেকে যোগান দেওয়া নারীদেহে প্লাবিত হয়েছে।

ফলত শুঁড়ার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমগ্র বিক্রয়যোগ্য নারী সমাজের ডিভ্যালুয়েশন্ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এর পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ১০২৪ টি পরিবারের কুড়ি শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ খনিতে, অ্যাসিড্ কারখানায় কাজ পায়। ফলত শুঁড়ার চতুষ্পার্শে এই বাঁধা মজুরির পুরুষদের কদর বাড়ে। আর তার ভয়াবহ প্রতিফলন ঘটে বিয়ের বাজারে। এখানকার যে দুই তিনটি সমাজে গণবিবাহ প্রচলিত ছিল তা উঠে যায়। এবং এই সমাজের পুরুষরা আর্যাবর্ত আগত ভিন্ন গোত্রের নারীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে অধিকতর আগ্রহ দেখায়। শোনা যায় এই সমাজের তিনজন সীতারামপুরবাসী যুবক চাকরির সুবাদে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে শাদাকালো টি ভি যৌতুক হিশেবে পেয়েছে। এদের টানে টানে ভল্লা, ঘাটি এবং আদি ক্ষত্রিয় আরো আরো সমাজে বিয়ের বাজারে পুরুষ ক্রমশ দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। একটি তালিকা থেকে চলতি বাজার দামে বিভিন্ন ক্যাটিগরির বিবাহযোগ্য পুরুষের মূল্যমান স্পষ্টতই বোঝা যাবে—

১। সরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্প শ্রমিক : ন্যূনপক্ষে ৩০ হাজার টাকা

২। বেসরকারি কিন্তু স্থায়ী শিল্পশ্রমিক : ন্যূনপক্ষে ২০ হাজার টাকা

৩। ক্ষুদ্র সংস্থায় শ্রমিক কিংবা পিওন দারোয়ান গোষ্ঠীভুক্ত : ন্যূনপক্ষে ১৫ হাজার টাকা

৪। ঠিকা শ্রমিক, ঠিকাদারি সংস্থায় নিযুক্ত : ন্যূনপক্ষে ১০ হাজার টাকা

৫। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে নিযুক্ত ক্ষুদ্র সংস্থা এবং সমমানে বিড়ি বাঁধা কারিগর, শালপাতার যোগানদার ইত্যাদি : ঐ

৬। খেতমজুর কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষপাতে অন্তত ২৪০ দিনের ন্যূনপক্ষে ৫ হাজার টাকা মজুরি প্রাপক

৭। সম্পূর্ণত বেকার, বয়স্ক, বৃদ্ধ, কিঞ্চিত অকর্মণ্য : ন্যূনপক্ষে ৫ শত টাকা এমতাবস্থায় একাধিক কন্যার কথা তো ভাবাই সম্ভব নয়, একটি কন্যার দায়ভার বহন করাও কোনো সুস্থ

ফনীমনসা, কাঁটা ঝোপ, শিয়ালকাঁটা, কিছু খেজুর গাছ ছাড়া আর কোনো সবুজ সম্ভাবনা কস্মিনকালেও ছিল না। আর সবাই জানে ভল্লাপাড়া, বায়েনপাড়া, এমনকি দূর দূর গাঁয়ের রাজবংশী, কাঁড়ার, ঘাটিদের সবাই জানে শুঁড়ার এই ব্রহ্মডাঙা সবকটি গাঁয়ের শিশুমেধ যজ্ঞের সদ্যোজাত সমস্ত বিটি-ছাওয়ালের গণকবর। ব্রহ্মডাঙায় বাস করেন সেই ব্রাহ্মণ, যাঁকে কেউ দেখে নি, শুধু তাঁর কথা শুনেছে, অথবা ভাগ্যে থাকলে এই পাথুরে মাটিতে তাঁর 'শিমুল কাঠের খড়মের চটাস্ চটাস্ শব্দ শুনেছে।' আর আছেন মা বিশালাক্ষ্মী। তিনি তাঁর কন্যাসন্তানদের এই প্রান্তরে স্থান দেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত এই টাঁড় জমিতে, বনবিভাগের অর্থানুকুল্যে যখন "সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প" গৃহীত হয়, তখন ফিসফিস গুনগুন করে এই বার্তাটি সব মহলেই আলোচিত হয়েছিল। আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, যারা মাটির নীচে অনন্তকাল ধরে স্বপ্নে বিশালাক্ষ্মীর সঙ্গে নানাভাবে দেয়ালারত, এই প্রকল্প তাদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে। খোঁদন ভল্লাই জানে প্রত্যন্ত দেশের সতেরটি গাঁয়ের এক হাজার চব্বিশটি পরিবারের অধিকাংশ নারী গত দশ বছরে প্রাকৃতিক নিয়মে রজঃস্বলা হয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে গেলেও আদমসুমারির হিশেবে তাদের কারো ঘরে একটির বেশি কন্যা সন্তান নেই—কারো কারো আবার তাও নেই। সেই সব নবজাতরা—বিটি ছাওয়ালেরা জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাটির নীচে গাঢ় অন্ধকারে, বিশালাক্ষীর কোলে ঠাঁই পেয়েছে। তারা সবাই হাসিতে কান্নাতে মা বিশালাক্ষীর সঙ্গে দেয়ালায় মেতে রয়েছে।

॥ একটি সমীক্ষা ॥

শুঁড়াকে কেন্দ্র করে সাড়ে পাঁচ কি. মি. ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকলে—সে বৃত্তের পরিধি কোনো নদীমাতৃক এলাকার স্নেহ থেকে কমপক্ষে দুকোশ দূরে পড়ে থাকবে। ফলত চাষ আবাদের স্বর্ণিল সম্ভাবনা এখানে ক্ষীণ। এরা কোথাও, কোনো এক সময়ে চোয়াড় বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় নদীমাতৃক পলিগঠিত সমভূমিতে বাস করত। তারপর চাপ খেতে খেতে এক সময়

স্বাভাবিক দম্পতির পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু যেহেতু প্রাকৃতিক ভারসাম্যে পুরুষ ও নারী শিশুর জন্মহার ৫০:৫০, ফলত অধিকাংশ নারী শিশুর ভবিতব্য শুঁড়ার ভুষুণ্ডী প্রান্তরে বিশালাক্ষীর আদিগন্ত কোল।

১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে অবশ্যই এখনও অসমর্থিত যে শুঁড়া ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নারী শিশুর জন্মহার আরও দশ শতাংশ কমে প্রতি একশ পুরুষে ৭৩-এ দাঁড়িয়েছে।

বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেত, একবিংশ শতকের দরজা যখন অল্প অল্প করে ফাঁক হবে—তখন শুঁড়া ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিবাহযোগ্যা নারী বলে কোনো পণ্যই আর পাওয়া যাবে না এবং দুশ বছরের তেরটি কৌম সমাজ জ্যামিতিক হারে বর্ণসংকর সৃষ্টি করে এক মহান ভারতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে তুলবে।

প্রকৃতির ভারসাম্য অর্থাৎ কিনা ইকোলজিক্যাল ব্যালান্সের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে মানুষের শিকড় সম্পর্কিত এই সমস্যার স্থান পাওয়া উচিত কিনা, তা এখন বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখছেন। সময়ান্তরে সে- সম্বন্ধে সমীক্ষাও প্রকাশিত হবে।

॥ ধুতুরা রহস্য ॥

শুঁড়ার মাঠে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে সেদিন নেতাদের মধ্যে যেমন তফসিলী সম্প্রদায় নিবন্ধন সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যও ছিলেন, তেমনি চল্লিশটি চাষার ভিড়ে গা ঘষাঘষি করে দাঁড়িয়েছিল সুফল কাঁড়ারও।

সুফল গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদিত "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পের নিয়মিত তালিকাভুক্ত শ্রমিক। কারণ অর্ধাহার অনাহার সত্ত্বেও তার শরীরে সেই ভাস্কর্য প্রোথিত, যা কাস্তে অথবা লাল পতাকা হাতে মিছিলে অগ্রবর্তী হলে বিদ্রোহ কায়া পায়—শাল- পিয়ালের বন থেকে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি শোনা যায়। ফলত সুফল স্নেহধন্য স্থানীয় নেতৃত্বের এবং সেই সুবাদে গ্রামসমাজের।

সে সমাজের মানুষেরা জানে সুফলের বৌ বড় ফলবতী—জন্মের পর দুটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও মাত্র বার বছরের দাম্পত্যে সুফলের জীবিত সন্তানের সংখ্যা তিন—বড়টি কন্যা, ন-বছরের। তারপর পুত্র একটি, পাঁচ। একটি তিন। ভগবানকে সুফল কটি ফল দিয়েছিল, এবং কি কি ফল দিয়েছিল তা সঠিক না বলতে পারলেও পুজোর শেষাশেষি সুফলের বউ আতর জানাল সে গর্ভবতী হয়েছে।

গ্রামসমাজে প্রসব বেদনা উঠলে আজকাল আর চাঁপাবালার ডাক পড়ে না, কিন্তু গর্ভের প্রথম অবস্থার লক্ষণ নির্ণয়ে চাঁপাবালা এখনো অপরিহার্য। আর না ডাকলেও চাঁপাবালা এ ব্যাপারে নিদান হাঁকতে কার্পণ্য করে না। বরাত জোরে ছেলে হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেলে চাঁপার কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগও ঘটে যায় কখনো সখনো।

চাঁপার বয়স চার কুড়ি হয়ে গেছে। সুফলের ঠাকুর্দার কথা চাঁপা বলতে না পারলেও সুফলের বাপ আর সুফল যে তার হাতেই হয়েছে একথা চাঁপাবালা সুফলের বউ আতরকে অনেকবার শুনিয়েছে। ফলত শুঁড়ার চাপড়া ভাঙার আগের সন্ধ্যায় চাঁপা যখন পূর্ণগর্ভার লক্ষণ নিরীখে নিদান দিল "রাজকন্যে হবে গো, লিচ্চয় [illegible] লিও"—তখন সুফল ফ্যালফ্যাল করে আতরের চোখের দিকে তাকিয়েছিল রক্তাল্পতা হেতু আতরের চোখ ইতিমধ্যেই মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

সুফলের বুকের কাছে মত্তমাদলের টোকা তো গোটা বর্ষার রাত ধরে জেগেই ছিল, তারপর খোঁদন ভল্লার বুকফাটা আর্তনাদ তাকে সেই তাণ্ডবের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

"গাজন হে, গাজন—শিবের নাচন। পাগলা শিব, বুড়া শিবের নাচন" হাজার ঢাকে কাঠি পড়ে, হাজার ঝাঁঝ বেজে ওঠে। শুঁড়ার মাঠ থেকে দ্রুত দৌড়ে আসতে গিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় এই প্রথম বর্ষাতে সে ধুতরা ঝাড়ের বাড়-বাড়ন্ত লক্ষ্য করে।

আতর সেদিনই সন্ধ্যায় মহুনীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয় এবং পুরো একটা দিন গর্ভযন্ত্রণার শেষে পরদিন বেলা তিনটেয় একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়।

আতরের গর্ভের সুবাদে সুফল সরকারি প্রকল্প থেকে দুদিনের জন্য মোট আট কেজি গম পায়। তা থেকে ছ কেজি সদা ময়রার দোকানে ঝেড়ে দিয়ে সুফল নগদ সাতটাকা পঞ্চাশ পয়সা পেয়ে যায়। নতুন চকচকে পঞ্চাশ পয়সার একদিকে ইন্দিরা গান্ধীর মুখ ছিল। আধুলিটি মোহর বলে ভাবতে সুফলের ভালো লাগে; এবং হাসপাতাল মুখো যেতে যেতে এই মোহর দিয়ে কন্যাসন্তানের মুখ দেখতে বাসনা হয়। বিশালাক্ষীকে স্মরণ করেই সুফলের বুক থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ বেরিয়ে আসে, "মাগো, মা বিশেলক্ষী।"

কন্যা শিশুটি তখন নিদ্রিত ছিল। আতরের একচিলতে কাপড়ের সিক্ত প্রান্তদেশ বুকের দুধে আর্দ্র ছিল।

"দুধ দেইলছিস ?" সুফল কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আতর মাথা নাড়ে। স্তনাগ্রে সেই মমতা থাকে, শিশুর ঠোঁটের স্পর্শে যা বত্রিশটি নাড়ীতে দোল দেবার ক্ষমতা রাখে। সুফল তাই নিজের দিব্যি দিয়েছিল, "কাঁন্দুক, কেইন্দি মরি যায়, আপদ যাক, দুধ দিইলহ, ত—তুর সোয়ামীর মরা মুখের দিব্যি।"

তিনদিন হাসপাতালে থেকে ছাড়া পাবার পর বাচ্চা নিকেশ করতে হাত কাঁপে। এর আগের একটার বেলায় তাই হয়েছিল—তো সেটি তিন বছর বয়েসে জলে ডুবে সেই শুঁড়ারে টাঁড়মাটিতে নিজের জায়গা করে নিল। সুফল জানে, তিনদিনের বাচ্চার মুখে বিষ দেওয়া দুরূহ কাজ, এমনকি মধু মেশালেও সে তফাত ধরে ফেলে। সে অমৃতের স্বাদ পেয়েছে—মায়ের শরীরের তাপ পেয়েছে।

ফলত,ঠিক হয় সেদিন রাত্তিরেই সুফল বৌকে নিয়ে পালাবে। ব্যাপারটা সহজ নয়। এক তো আতরের শরীর, তারপর হাসপাতাল জুড়ে হৈ হৈ শুরু হয়ে যাবে। একটু দূরে কয়লা গুদামে সারা রাত ঘণ্টা পড়ে। রাত দুটোর ঘণ্টার দিকে আতরকে কান রাখতে বলে সুফল চলে গেল।

বাড়ি ফেরার পথেই, বাড়িতে নয়—শুঁড়ার ব্রহ্মডাঙায় কাজ শেষ করে মা বিশালাক্ষীর কোলে নবজাত কন্যাকে সঁপে দিয়ে পুকুর ঘাটে একটা ডুব দিয়ে ভোর হবার আগেই সুফল আর আতর ঘরে ঢুকবে—ঠিক হয়।

তিনকোশ দূরের পথে আজ আর বাড়ি ফেরা নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশপাশের ঝুপড়িতে দুদণ্ড একটু পিঠটাকে ঠেকিয়ে নেওয়া—চার আনায় একটা চারপাই পাওয়া যায়। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে ওই চার আনার অপব্যয়কে প্রশ্রয় দিতে বড় বাসনা হল সুফলের। জীবনে সে ভাড়া করা চারপাইয়ে শোয় নি।

শোয়ামাত্র ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা টাঁড় অঞ্চলে ধুতুরার বিশাল বিস্তার লক্ষ্য করে সুফল একটু মুখ টিপে হাসল। সতেজ পুরু

ধুতরোর পাতা। ধুতরোর শাদা, একটু বেগুনী আভা যুক্ত ফুল—নীলকণ্ঠের কানে দোলে। বিষে বিষে নীল নীলকণ্ঠ হে-গাজন হে, গাজন হে—বাজনার তালে তালে স্বপ্নে দোলে সুফল। একটা শিশুরই মতো দোলনায় দোলে। ঘুম গাঢ় হয় কারণ স্বপ্নে ধুতুরা বীজের ঘন আঠা লেগে থাকে।

॥ দেয়ালা ॥

দমকা ঠাণ্ডা বাতাস দ্রুত একপশলা বৃষ্টি সুফলকে আচমকা জাগিয়ে দেয়। চারপাইয়ে শুয়ে সুফল প্রথমে আকাশ দ্যাখে এবং স্পষ্টতই বোঝে মেঘ একটা কালো চাদরের মতো প্রায় মাথার কাছে নেমে এসেছে। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।

আকাশে চাঁদ নেই। ফলত রাত ঠাহর করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সুফল ঝোলানো ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে দ্রুত হাসপাতাল-মুখো হাঁটা দেয়। তার মধ্যে দ্বিধা ছিল—দুটোর ঘণ্টা পড়েছে কি পড়েনি।

হাসপাতালে মেয়েদের ওয়ার্ডে দোরগোড়ায় দুটি কুকুর কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। একটু এগিয়ে ডানদিকের কোনা ঘেঁষে পাতা খাটটির দিকে তাকিয়েই সুফলের বুক ধক্ করে উঠল। আতর নেই।

সুফল সামনে কাউকেই পায় না—কিন্তু যেহেতু এ নৈশ অভিযান গোপন, অভিসন্ধিমূলক সুফল কাউকে ডাকতে সাহসও পায় না। তাছাড়া বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। রাত পাহারার কুকুরও এখন এই আকাঙ্ক্ষিত ঠাণ্ডায় ঘুমে কুণ্ডলী—সেখানে শাদা বকের মত সেইসব সুখী সুখী নার্সেরা, কিংবা আয়ারা—পাহারাদারটিকেও সুফল কোথাও দেখতে পেল না।

দুবিঘের চৌহদ্দিতে বাথরুম, পায়খানা—আউটডোর; এমনকি পাকুড়তলাতেও যে গুটিকয় দোকান ঘর আছে সর্বত্র শিকারি হায়েনার মতো ঘুরে এল সুফল। বৃষ্টির ছাঁটে এখন তার শীত বোধ হচ্ছে। জামাকাপড় ভিজে জবজবে—তবু কানের ভেতরে, মাথার ভেতরে একটা গুমোগুমো আগুনের আঁচ বোধ করে সুফল। মাথার ওপর থেকে একফালি মেঘ সরে যেতেই পাণ্ডুর শীর্ণ চাঁদ বেরিয়ে আসে। বৃষ্টিটা একটা ভেজা দমক তুলে সহসাই থেমে যায়। আর তখনি কোল মাইনসের রাত পাহারা ঢং ঢং করে দুটো ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

এরপরে সুফল তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটি নিয়ে—ধুতরার নির্যাসে প্রস্তুত ঘন দুধের মত ভয়ঙ্কর এক বিষের বোতল নিয়ে—সে বোতলে স্থিরভাবে রাখা পুপ্‌সি কোম্পানির রবারের স্তনবৃন্ত নিয়ে হন্যে হয়ে খোঁজে। শিশুমেধের প্রবল তাড়না রক্তে ঢাক বাজায়।

সাড়ে ছটাকার মূলধন নিয়ে বিনা টিকিটে প্রথমেই সে অণ্ডাল যায়। কোলিয়ারির কাছে ধাওড়ায় আতরের এক মাসি থাকে। মাসি আর তার দুটি মেয়ে গতর বেচে। সেখান থেকে সীতারামপুর—পাটুলি এদিকে খয়রাসোল, দুবরাজপুর—পায়ে হেঁটে, বাসে ট্রেনে কোশ কোশ রাস্তা পার হয় সুফল। আতরের দেখা পায় না। শেষ দুদিন ভীমগড়ের রেল স্টেশনে স্পেশাল চেকিং-এ ধরা পড়ে সিউড়িতে জেল খাটে। মুক্ত সুফল নিঃস্ব হয়ে সিউড়ি কোর্ট প্রাঙ্গণে ভিক্ষা করে। সেই থলিটি সুফল যা হোক করে বাঁচিয়ে রাখে এবং তার সঞ্চয় বলতে প্লাস্টিকের শিশিতে সযত্নে রাখা ধুতরার আরক ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

সুফল হতাশ হয়ে ভাবে এ একরকম ভালোই। মা-বিটি একসঙ্গে হারিয়ে গেছে, হয়তো মরেছে, রেলে, অতলস্পর্শী কোনো গভীর কূপে। তবুও এক সংশয়।

ধুতুরার নির্যাস ভর্তি শিশিটিকে যত্নে আগলে রাখে। তের দিনের দিন সুফল তার পরিচিত আঙিনায় ফেরে।

তখন বিকেলের শেষ আলো মরে গেছে। সুফলকে দেখে তার তিন কচি কাচা আদুড় গায়ে ছুটে আসে। আর সেই সময়ই বাঁশের চ্যাঁচাড়ির বেড়া সরিয়ে আঁতুড়ের পরিচিত গন্ধ উড়িয়ে সুফলের ঠিক তিন হাত সামনে এসে দাঁড়ায় আতর।

এক ঝটকায় আতরকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢোকে সুফল। হাতে ধুতরার নির্যাস—প্লাস্টিকের শিশির মুখে পুপসি কোম্পানির রবারের নিপ্‌ল লাগিয়ে বাঁশের দোলনায় ন্যাকড়া জড়ানো সদ্যোজাত কন্যার দিকে এগিয়ে যায় সুফল।

তের দিন বড় বেশি সময়—এ শিশু তার শিকড় গেড়ে ফেলেছে মাটির ভেতরে। সুতরাং সমগ্র ঘরে সঞ্চারিত ধুতুরার নির্যাস সম্পর্কে সে আশ্চর্য নির্বিকার। ভয়, ক্ষুধা, মৃত্যু সম্বন্ধে সে আশ্চর্য নির্লিপ্ত।

দোলনায় মৃদু দোলা লাগলে সুফলের তের দিনের রাজকন্যা হাসে। দোলনার ওপারে এসে আতর নিবিষ্ট শিশুর মুখ দ্যাখে। সুখে দুঃখে সম্পৃক্ত এক ভয়ঙ্কর দম্পতির ছায়া পড়ে বাঁশের দোলনার ওপর। দোলনা দোলে, এই পুরুষ নারীও দোলে—শিশুটিও দোলে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে।

আতর ফিসফিস করে বলে "কী কইরব বল্। নাড়ীতে টান লাইগল—পালায়ে গেলাম।"

সুফল শুকনো একটু হেসে বলল "দেয়ালা করছে, স্বপনে মা বিশেলক্ষীর সঙ্গে বিটি আমার কথা বইলছে।"

ভাঙা চালার দরমার বেড়া নড়িয়ে সুবাতাস বয়।

শুঁড়ার টাঁড় মাটির কবরে শায়িত নারী শিশুরা পাশ ফেরে। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। এ তাদের দেয়ালার সময়।

এ বড় নিশ্চিন্ত সময়। দোলনার দু পাশে ঘন হয়ে এইসব ভয়ঙ্কর দম্পতি যখন দাঁড়ায় তখন দেয়ালারত শিশুর সে বড় সুখের সময়।

বেঁচে থাকবই এমন প্রত্যয় পেলে গর্ভস্থ শিশুও বড়ই সুখী হয়। সুফল ও আতর জানে। □

কবিতার দশক নিয়ে আর [illegible] বলার আছে। কোন্ লেখক কো[illegible] আমার তা নিশ্চয় যে-কোনো সময় উল্লেখ [illegible]র, পারে। কিন্তু সাধারণভাবে সে-উল্লেখ নি[illegible]তঁার জন্মকালেরই উল্লেখ যদি তা কোনো ব্যাপক লক্ষণে এক-লেখকের গণ্ডি না ছাড়ায়। তার কোনো সাহিত্যিক তাৎপর্য নেই। এবং কার্যত প্রয়োজনও নেই, কারণ লেখকের জন্মসালই বলে দেয় তিনি কোন্ দশকের। আর এক কথা : এমন যদি ঘটে যে, কোনো সাহিত্যে প্রতি দশ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে নতুন যৌথ প্রবণতার দেখা মিলছে তাহলে সে-অবস্থাটা আমার মোটেই স্বস্তিকর মনে হয় না, কেননা তখন সেই সাহিত্যের চরিত্র সম্বন্ধেই প্রশ্ন এসে যায়। অবিশ্যি আমার ধারণা, বাংলা কাব্যে সেরকম কিছু ঘটেনি বা ঘটছে না।

২-১৬ আগস্ট সংখ্যায় পত্রলেখক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য কবিতা-সম্পাদকের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ করেছেন নির্বাচিত কবিতা অনালোচিত থাকছে বলে। এ-বিষয়ে আমি যা বলতে চাই তা যত-না আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তার চাইতে বেশি সমস্যা ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্যে। 'নির্বাচিত কবিতাগুলির সম্পর্কে বিশেষভাবে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা জুড়ে' দিতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এক-একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা নিয়ে কিছু বলা অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না কবির সমগ্র মনোগতি ও প্রকাশপদ্ধতিকে পৃষ্টপটে রাখি। এবং তা করতে হলে কবির আরো রচনাকে আলোচনায় জড়িয়ে নিতে হয়। তা কী করে সম্ভব যেখানে অনেকের একটি করে কবিতা একসঙ্গে ছাপা হচ্ছে ? প্রথম দিকে আমি বিশেষভাবে যে মন্তব্য করেছি তার বিচ্ছিন্নতা আমাকে পীড়িত করেছে। সুতরাং ঐভাবে আমি আর অগ্রসর হইনি। তবে নির্বাচিত কবিতার কোনো-না-কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য যে আমার উপেক্ষণীয় মনে হয়নি, নির্বাচনেই তা প্রকাশ। এতগুলি কবিতার উপস্থিতি যেখানে, সেখানে কাব্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে চিন্তাভাবনা জানানো আমার বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমাদের কাব্যিক ধারণা ও সৃষ্টিকে এক বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপন করা, আমাদের দৃষ্টি ও উদ্যমকে প্রসারিত করে সার্থকতার সন্ধান করা। আমার অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি সেই লক্ষ্যের দিকেই ঘোরানো। পৃথিবীকে আমরা যেন গোষ্পদ না মনে করি। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য সৃজনের ও উপলব্ধির জগতে আত্মতুষ্টির মতো মারাত্মক আর কিছু নেই।

অরুণ মিত্র
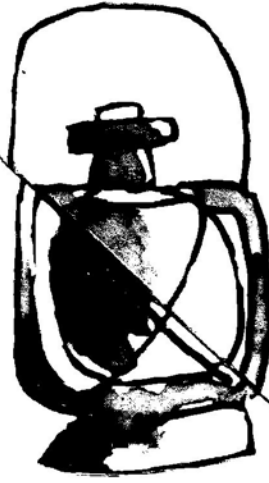
শিবশম্ভু পাল

শিল্পদ্রোহ

দারিদ্র বিষয়ে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প শিল্প নয় জেনে
হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যায় বাড়ন্ত ভাতের হাঁড়ি, হাওয়াই চপ্পল
সেলাইয়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে হেসে ওঠে সহজ সরল
কত রঙ্গ জানে জাদু শিল্পদ্রোহী দুস্থ হারিকেনে !

সুতরাং অব্যাহত বলিভুক সংহতির করণকৌশল
মুখোশ ছেঁড়ার নামে অলীক কুনাট্য রঙ্গে কলকাতাসমেত
রাঢ়বঙ্গ মজে যায়, করতালি দিয়ে ওঠে শ্রেণীচ্যুত আকাশকুসুম
ছেঁড়া জামেয়ার ভাসছে সাগরসঙ্গমে।

[illegible]গরও সরলীকৃত, ঘর হতে শুধু দুপা ফেলতে যতটুকু।
আ[illegible] খুঁজি না কোনো পূর্বাপর, বরং কোথায়
জেরি[illegible] নিয়ে যাব বেলা আর অবেলায়—সেই অনুকূল
জলবায়ু খুঁ[illegible] দেখি মহামান্য শিল্পহীনতায় !

অমিতাভ গুপ্ত

অভিজ্ঞান

হঠাৎ কখন পুরোনো সেই লোকগীতির ফণায়
ঝরে পড়ল আমার
আশৈশবের বিষ
জেগে উঠল ভাটিয়ালির চর

শিকড় ছুঁয়ে রাঙা দোয়েল ওড়ে

জ্বলে উঠল আকাশ, যেন ভস্মরেখার অবশেষের মতো
নৌকো ভাসালাম
একটি পালে ঝড় নিয়েছি তুলে

অন্যপালে মা-মনসার গান

সাজিয়ে নেওয়ার সুপণ্য আর মেলে না, দুই রক্তমাখা তীর
মড়কে উন্মূল
ভেঙে পড়ছে পোড়ামাটির ছবি

স্রোতের বাঁকে তীব্র চোরাটান

মধ্যপ্রহর রাতের শেষে ছন্নছাড়া প্রতিপদের চাঁদ
অনুসরণপ্রিয়
দুলে উঠছে ভাঙা ঢেউয়ের বুকে

এই কি আমার বাংলাদেশের ভোর ?
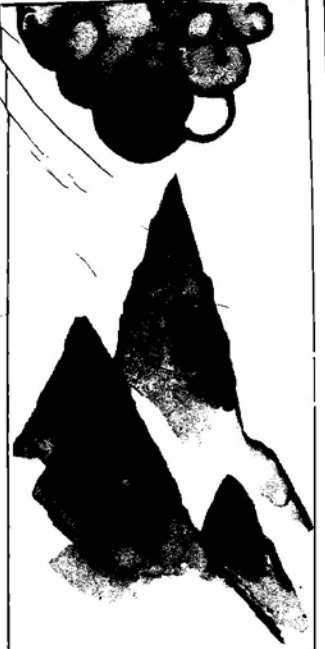
নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়

ভীমসেন যোশী

সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাব আর,
দূর থেকে হাল্কা পাহাড়
চোখের আভাস ছুঁয়ে যাবে ;

ততক্ষণে আল্‌গা রেখে দ্বার
দেখবো ক্লান্ত সরাইখানায়
টোড়ি বাজছে ঢিমে ঝুমরায় ;

ফিরে আসতে মৃদু দেরী হলে
মেঘ নামবে পাহাড়ের কোলে।

তুষার দাশ

শব্দের দুর্দান্ত দারুণ রাত

কী যে রাত, দুর্দান্ত রাত নেমেছে শব্দের
তুমুল হল্লার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শত শত ভায়োলিন,
ড্রাম আর বঙ্গোর নিনাদ, খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে
সমস্ত দেয়াল, জ্বলে উঠছে ক্রমাগত নেভা দীপগুলো
ভেঙে যাচ্ছে অন্তরঙ্গ কলরোল, সব শব্দ মিশে যাচ্ছে
শূন্যে দ্যাখো ভাসমান অস্থির শব্দের সাথে—
ঢেউ উঠছে, ঢেউ শুধু চারিদিকে তরঙ্গ তুমুল।

এই দীর্ঘ দৃঢ় দীপ্র শব্দমালা ক্রমাগত খুলে দিচ্ছে
প্রকৃতির সাজসজ্জা, অন্তর্গত নিপুণ দরোজা
হা-হা বহমান শব্দে ভেসে উঠছে পৃথিবীর
ভেতরের আগুন-মৃত্তিকা, ধাতুর কঠিন রাশি
লুকোনো স্বপ্নের সারি, পরিচিতিহীন দৃশ্যাব ।

খনির নিকষ কালো কয়লার কর্কশ স্তূপের মধ্যে
গুটিশুটি পড়ে থাকা হীরকের ধারালো বিদ্যু
অনিরুদ্ধ আলোর জোয়ারে দ্যাখো কেমন মধুর জ্বলে,
সোনার রেণুর সাথে কী অবাক নির্বিশেষ অবিমিশ্র
মিশে আছে মিয়ানো ধুলোর রাশি, প্লাটিনাম, তামা—
গুহার ভেতর থেকে অভঙ্গুর উঠে আসে দ্যাখো
প্রাগৈতিহাসিক সব দৃশ্যসহ আঁকা ছবি, মূর্তির মমতা,
শিল্পের উত্থানে দ্যাখো চরাচর জুড়ে সে কী অনিন্দ্য সুন্দরকান্তি
দিব্য বিভা জ্বলে ওঠে জীবনের দীপ্ত জয়শ্রীর।
শব্দকে থামিয়ে দিতে পারে না তো কাল-রথ কোনো,
মনোরথে চৈতন্যের সারি সারি চাকার ওপর
মননের তীব্র তেজী বাহু তুলে শব্দরাজি যায়।

ঝলমলে হয়ে ওঠে এই রাত দিনের মতোন
শব্দের শুশ্রূষা পেলে, শুধুমাত্র সংস্পর্শ পেলে
কী দারুণ রাত জ্বলে ওঠে, জ্বলে ওঠে দ্যাখো
জ্বলে ওঠে ক্লান্তিহীন মানবিক, আণবিক রাত।

মলয় রায়চৌধুরী

প্রত্যক্ষ

সম্বিত ফিরে পাচ্ছি ক্রমে ।ছি রেলের লাইনে
হাত পা ও মুখ বাঁধা প
চারিদিক খাঁখা ।ভিজে গেছে
শিশিরে কাপড় আওয়াজ
একটানা ঝিঁ ভরা গেঁয়ো অন্ধকার
ঠাণ্ডা ভেতর তুলো ঠোসা তাই চিৎকার করতে পারছি না
মুগুর মারের চোটে পায়ের বুকের হাড় ভেঙে গেছে—নিজেকে নড়ানো যাচ্ছে না
।পঠে ফুটছে শক্ত পাথর
কি সুন্দর এ-পৃথিবী কোথাও অশান্তি নেই সবকিছু দিব্বি চুপচাপ
অন্ধকার ফঁড়ে বেগে আলোকবিন্দু এক এগিয়ে আসছে এই রেলপথ ধরে

সুব্রত সরকার

বাড়ী নয়, জাহাজ

বাড়ী নয়, জাহাজে থাকতাম আমরা,
নোনা জল লেগে বুড়ো আঙুলটি খেয়ে গেছে—
আর দুটি চোখ উড়ে থাকা গাংচিল,
ডানায় রোদের বদলে কিছু স্বপ্ন রঙ করা।
তবু কোনো পূর্ণিমায় মনে হত অপরূপ
রাজহংসে আছি।
স্মৃতির অতল ঢেউ ধাক্কা দিতো জোরে,
মাথায় মাস্তানের মত আকাশের নীল টুপি
মেঘের ছিন্ন পালক উড়ছে—
বৃষ্টি এসে পা ধুইয়ে যেতো যত্নে।
যখন মানুষের কষ্টের মত অন্ধকার নেমে আসতো
আমরা দরোজা বন্ধ করে কেবিনে বসে অনন্ত কৌতুকে
রহস্যের গল্প বলতাম, কোথায় নিশির গান শুনে
মানুষ পাথর হয়ে যায়, আমাদের সুবর্ণ আনন্দ
তারা হয়ে আলো দিতো ডেকে, তারপরে
ঝড় উঠলো একদিন, প্রতিটি অনুনকরণীয় মুখ
ভেঙে গিয়ে রক্ত মাংস শিরা দেখা দিলো
শিল্পের নিহত নুন জলে ও ফেনায় মিশে গেছে।

জিয়া হায়দার

রক্তকরবী, বাংলাদেশ

কিশোরের ভাল লাগে রক্তকরবীর রৌদ্র, তাই
কিশোর অমন করে ডাক দিয়ে ফেরে : নন্দিনী, নন্দিনী

ছিন্নবাস উন্মাদিনী নন্দিনীর নিতেল কুন্তল
বিশ্বাসের পৃথিবীতে বিশাল আঁধার,
ক্রন্দনে নিরুদ্ধ কণ্ঠ নিরন্তর ডেকে যায় : রঞ্জন, রঞ্জন

বর্তমান রাজা তাঁর স্বর্ণগুহা থেকে,
সঙ্গী ক্রূর অন্ধ অপচ্ছায়া,
দাঁড়ালেন তাঁরি সৃষ্ট মরুর সিঁড়িতে ;

বিশু পাগলা, ফাগুলাল, মৃত আত্মাদল
আশ্রয় সন্ধান করে রক্তকরবীর নষ্ট-রৌদ্রের ভেতরে

রামচন্দ্র প্রামাণিক

বর্ষার কবিতা

গঙ্গাপারে কারখানার ঘাঁড়-কাঁধে যে ভর দিয়ে দাঁড়ানো
তার ওই ঝলমল ভারি নীলবর্ণ মুখ দেখে ভেবেছে,
আজ তবে আষাঢ় ? পয়লা ? দ্যাখো দ্যাখো এ্যাদ্দিনে এসেছে
কি মাহেন্দ্রক্ষণে ! আর কলকাতার সব্বাই বাঁকানো

গ্রীবায় ওপারে দেখলো, খোলায় খই-এর মতো জলে
বৃষ্টি ফুটছে। শাঁখ বাজছে আকাশে। আজ বুক-পিঠ টনটন্
করা কার কোন্ বার্তা বয়ে আনলো নীল মেঘ ? এমন
দিনেই বলা যায় ? আহা আইবুড়ো বোনটাকে যদি বলে !

ফটো : ধ্রুব রায়

মাটি মানুষের রং

বিশ্বজিৎ রায়

শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো, একটি ভ্রমণকাহিনী লেখার পক্ষে আমার অভিজ্ঞতাটি নিতান্তই আটপৌরে। অপরদিকে রাহুল সংস্কৃত্যায়ন বা বিনয় ঘোষের চেলা হয়ে আধুনিক দ্রোহের সাথে প্রাচীন ভারত-মননে দাহের কোনো নাড়ীর যোগাযোগ খুঁজে বের করার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না, গিয়েছিলাম একটি সংগঠনের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, ব্যক্তির উদ্দেশ্যের চেয়ে যেটা স্বাভাবিকভাবেই অনেক অবিশুদ্ধ এবং আশু প্রয়োজনকেন্দ্রিক। তাছাড়া পথ চলতে চলতে বুঝলাম প্রচার এবং অনুসন্ধান দুটি বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া। বিহার, উত্তরপ্রদেশ তথা উত্তরভারত সম্বন্ধে যে সব চাঞ্চল্যকর এবং

অসংলগ্ন সংবাদ আপনারা পান দৈনিক ও সাপ্তাহিক সাংবাদিকতার কল্যাণে, পেশার বিচারে তা লোভনীয় হলেও তাতে হামলে পড়ায় আমার রুচিতে বেধেছে। কিন্তু লোকে খায় এমন সব খবরের আশেপাশে সামনে পেছনে আরো বহু ঘটনা, তথ্য, তাৎপর্য এবং মানুষ বসবাস করে। আমি যতটা সম্ভব তাদের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। মেপেজুপেই ভ্রমণ শব্দটি ব্যবহার করছি। এ যেন ঘোড়ায় চড়ে ফুল দেখা। ঘোড়া থেকে নামতে গেলে যে সময় এবং সম্পর্ক দরকার তা গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না। নিত্যকর্মের ফিরিস্তিটা পেশ করলেই তা বোঝা যাবে। সকালে সাতটা সাড়ে সাতটায় উঠে ময়দান যাত্রা, কলা পাউরুটি গেলা (আক্ষরিক অর্থেই), সাইকেলটাকে তেলে ন্যাকড়ায় চাঙা করে তোলা। এর মধ্যেই ছিল আর্লি রাইজার ও লেট রাইজারদের টানাপোড়েন, বাথরুমে লাইন ম্যানেজ, তারপর রেডি সেডি গো। এইসব নেহাৎ অভ্যাসগুলো সফরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছিল টেনসনের ঘনঘটায়—বয়স্কাউট ক্যাম্পের শৃঙ্খলা আর টুরিস্টদলের বৈচিত্রের টানাপোড়েনে যা প্রতিদিনই পয়দা হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়েছে আমাদের দেখা ও শোনায়। মানসিক শক্তির অনেকটাই চলে যেত একদিন-প্রতিদিনের ছন্দটাকে বজায় রাখতে এবং মনগুলোকে ভারমুক্ত করতে। সে যাই হোক, প্রতিকূল পরিবেশে নানা ধরনের ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যৌথ জীবনযাপনের এই জটিল অভিজ্ঞতাটি কলকাতা-দিল্লি সাইকেল যাত্রার মধ্য দিয়ে পাওয়া। জাতপাত বা সাম্প্রদায়িকতা দীর্ণ এবং জমিদার-পুলিশ-অধিকারী চক্রের শাসনাধীন উত্তরভারতকে জানার জন্য সাইকেলে ১৬০০ কিলোমিটার যাত্রার থেকেও আমাদের দুরূহ ও দুর্গম যাত্রা ছিল এমন কিছু সুষম সম্পর্ক ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার দিকে যাতে অন্তত সফরের কটা দিন আমাদের কাজ ও বিশ্বাসের সঙ্গে একদিন-প্রতিদিনের জীবনের ফাঁক থাকলে থাক, ফাঁকি যেন না থাকে।

তারপর শুরু হল পথচলা তথা সাইকেল চালানো। নটা নাগাদ কোনো গঞ্জে থেমে চা খাওয়া। দুপুর একটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে সাইকেল চালাতাম। মাঝেমধ্যেই সঙ্গের রেসকিউ ভ্যান থেকে গ্লুকোজ, জল, লজেন্স ইত্যাদির সরবরাহ। যেখানেই গাঁ-গঞ্জ পড়েছে সেখানেই নাড়া লাগানো, পরচা বিলি আর অচানক্ সংক্ষিপ্ত পথসভা। সাইকেলে কোনো উৎসাহী সহযাত্রী পেয়ে গেলে তার সাথে কথা বলা। দুপুরে পথের ধারে ধাবায় খানা। বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটেয় আবার পথে নামা। গন্তব্যস্থলে আবার ছটা সাড়ে ছটায় পৌঁছনোর বেপরোয়া চেষ্টা। কেননা সূর্য ডোবার পরই জি টি রোড এই গ্রহের শৈশব দশায় ফিরে যায় কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর আর ভীমকায় ট্রাকগুলোর সৌজন্যে। রোজ ৭০ কিলোমিটার গড়ে চালানো। শুনশান গঞ্জে গিয়ে পৌঁছলে সন্ধ্যায় কিছু প্রচারের প্রচেষ্টা, সাহায্য সংগ্রহ ছাপিয়ে রাতের আশ্রয় খোঁজার এবং যা হোক ডালচাল বসিয়ে দেবার তাড়নাটা এত প্রবল হয়ে উঠত যে প্রচারটা প্রায় দায়সারা হয়ে যেত। সত্যি কথা বলতে কী, শেষের দিকে এ ধরনের পথসভায় বলতে ক্লান্তি বোধ করতাম। কিছু উটকো লোক এসে একটা জগাখিচুড়ি ভিড়কে হকচকিয়ে দিয়ে কিছু বলে গেল তাতে কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই এমন কোনো আন্তরিক আলাপ সম্ভব হত না যার সূত্রে আমরা ধর্ষণ, হত্যা, বস্তি জ্বালানো আর দুর্নীতির গভীরে উত্তর-ভারতীয় সমাজের গভীরতর অসুখগুলিকে নির্দিষ্টতররূপে শনাক্ত করতে পারি। সব সময়েই

পরিসংখ্যানের কঙ্কাল

ফটো : দীপক ভট্টাচার্য

মনে হত যতটুকু জেনেছি ততটা যাচাই করতে পারছি না। যতটা দেখেছি ততটা গভীরে যেতে পারছি না। সঠিক পারম্পর্যে ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বিচার করতে পারছি না।
প্রিয় পাঠক, ভ্রমণকাহিনীতে তত্ত্বের আমদানি বেশক্ নাপসন্দ আমারও। কলকাতায় ফেরার পর এক ধীমান বন্ধুও কড়কেছিল, "সাইকেলে সমাজতত্ত্ব, বিয়েবাড়িতে প্রেম!" কিন্তু যতই পথ চলেছি, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা দিল্লিতে, ততই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বাঙালি সংস্কৃতির আত্মশ্লাঘার সঙ্গে মানানসই মধ্যযুগীয় উত্তরভারতের কল্পনাটি খোয়া গেছে। কেননা আধুনিকতা বলতে যা যা বোঝায় সে-সবই তার অবিচ্ছেদ্য ভণ্ডামিসহ এই ভূখণ্ডে বর্তমান। সুতরাং আবার রাস্তা থেকে প্রশ্ন উঠে এসেছে, আমরা কী জানতে এসেছি? কীভাবে জানতে এসেছি? মোটাদাগের, মোটামাপের ঘটনা ও তথ্য সম্বন্ধে জানবার জন্য সরকারি কাগজপত্র আছে। আর দগদগে ধর্ষণ খুন, লুঠতরাজ, দাঙ্গা, বস্তিজ্বালানোর খবরের জন্য আছে দৈনিক বা সাপ্তাহিকের চাঞ্চল্যকর তদন্ত রিপোর্ট। কিন্তু আসল দেশ আর মানুষও আছে এই দুইয়ের মাঝখানে—সরকারি পরিসংখ্যানের কঙ্কাল আর খবরের কাগজের নাটকের মাঝখানে।

শেরশাহের প্রতি আগেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি, কেননা তিনি গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড না বানালে আমাদের পথ এত সরল হত না। যদিও প্রথমদিকে এই শাহী সড়ক ছিল তার দূরত্বের বড়াই নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু যত দিন গেছে ততই সে আমাদের সাইকেলযাত্রার এক শরিক হয়ে গেছে। তার মাইলস্টোন, বিভিন্ন পথনির্দেশ, পথের ধারের ধাবা, চড়াই-উৎরাই এবং অ্যাসফল্টের লাবণ্য ও রুক্ষতা—সব জড়িয়ে থেকেছে আমাদের উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তি, আত্মবিশ্বাস আর তৃপ্তি। ১৬০০ কিলোমিটার ভূত্বককে সাইকেলের চাকায় গুটিয়ে ফেলার ছন্দে এই অমানবিক নির্ভরতা ছিল একান্ত জরুরি। হুগলি পুলিশ বালি ব্রিজ থেকেই আমাদের এসকর্ট করে নিয়ে আসে, বাংলা-বিহার সীমান্ত পর্যন্ত আমরা বেশ ভি আই পি মর্যাদায় সাইকেল চালিয়েছি। এ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক উঠেছে। আমরা যেভাবে পুলিশি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বলতে নেমেছি সেখানে আমাদের পেছনেই পুলিশের প্রহরা জনসাধারণ কীভাবে নেবে? আমরাই বা কীভাবে নেব? এমন কী আমাদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা পুলিশের বা হাইওয়ে পেট্রোলের সাহায্য নেব কিনা এ নিয়ে বিতর্ক চলে। পরে অবশ্য ঠেকায় পড়ে আমরা বারকয়েক সাহায্য নিয়েছি কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ব্যাপারটায় মীমাংসা শেষ পর্যন্ত হয় নি। সে কথায় পরে আসব।

চুঁচুড়ায় সে রাত্রে দেখা স্থানীয় রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারের সাথে। তিনি আমাদের অভ্যর্থনাকারীদের একজন। আমাদের দিল্লি অভিযানের উদ্দেশ্য জানতে চাইতেই মহোৎসাহে শুরু করি। কিন্তু আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি যেখানে শেষ করলেন তার মোদ্দা ব্যাপার হল 'চরিত্র গঠনই আসল কথা', 'মেয়েরা এত স্বাধীনতা পেয়ে যাওয়াই যুবচেতনার এ হেন অবক্ষয়ের কারণ' ইত্যাদি। ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই এসব কথা বলছিলেন একজন সৎ উদ্যোগী কর্মী মানুষ। কিন্তু তাঁর কাছেও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা 'সমস্ত মানুষই চোর হয়ে গেছে।'

বর্ধমানে থানায় যেতে হয়েছিল। আমাদের জন্য বড়বাবু থেকে সেজবাবু সবাই খুব দরাজ। সব জায়গাতেই প্রায়। আসলে কলকাতা থেকে দিল্লি সাইকেলে করে কষ্টসাধ্য যাত্রা যথেষ্ট সম্ভ্রম আদায় করেছে। কনৌজে কয়েকজন কনস্টেবল রাত্রে আমাদের জন্য উত্তরপ্রদেশ সেচ বিভাগের বাংলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেদিন সেখানে ইউ পি বিধানসভার বিরোধী দলনেতার রাত্রিবাসের কথা ছিল। পুলিশ এসেছিল তার সিকিউরিটি হিশাবে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম বাংলো আমাদের কপালে নেই। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে কনস্টেবল দুটি আশ্বাস দেয়, "ঘাবড়াইয়েঁ মৎ। আপলোগকি ব্যবস্থা হো যায়েগা। এ হামারি কনৌজকী ইজ্জত কী সওয়াল হ্যায়। আপলোগ ইতনা কষ্ট উঠাকে আয়া।" বস্তুতপক্ষে এই 'কষ্ট উঠাকে আয়া'র প্রতি সহানুভূতি আর সম্ভ্রমই ছিল আমাদের বিপত্তারণ মধুসূদন। অন্যদের কথা পরে বলব, অন্তত নিউ দিল্লি স্টেশনে আর· পি· এফের মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত যদি না পাঞ্জাবি অফিসারটি 'খিলাড়ি লোগ'দের প্রতি দুর্বলতা ও সম্ভ্রম না দেখাতেন। আরেকটা ব্যাপার দেখেছি, পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের চেয়ে (কনৌজ বাদে) শিক্ষিত অফিসারদের মধ্যেই আমাদের এই লংমার্চ প্রয়োজনীয় কদর পেয়েছে। সেটা আমাদের ইংরেজি বলার গুণেই হোক অথবা তাঁদের গণতান্ত্রিক চেতনার বৃদ্ধির কারণেই হোক।

দুর্গাপুরের পথে দৌড়চ্ছি গলসি-পাণ্ডুয়া হয়ে। মাটির রং ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। ধূসর ধুলোটে রং ভেঙে ক্রমশ উঠে আসছে লালচে ল্যাটেরাইট। শুরু হল নিগ্রো মাথার চুলের মতো কোঁকড়ানো ঘন ঝোপের নিসর্গ। এমন নিঃশব্দ খাঁখাঁ আশ্বিন কখনো দেখি নি। ভেবেছিলাম গাঁয়ের পথে ছিটের বা সেলের জামাকাপড় পরা শিশুদের দেখতে পাব। নেই, কোথাও নেই। কিন্তু এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ, কানপুরে দশেরা ছট অথবা দেওয়ালির দিন কিন্তু উত্তরভারতের গ্রামের পথে পথে মায়েদের হাত ধরে শিশুদের

ফটো : দীপক ভট্টাচার্য
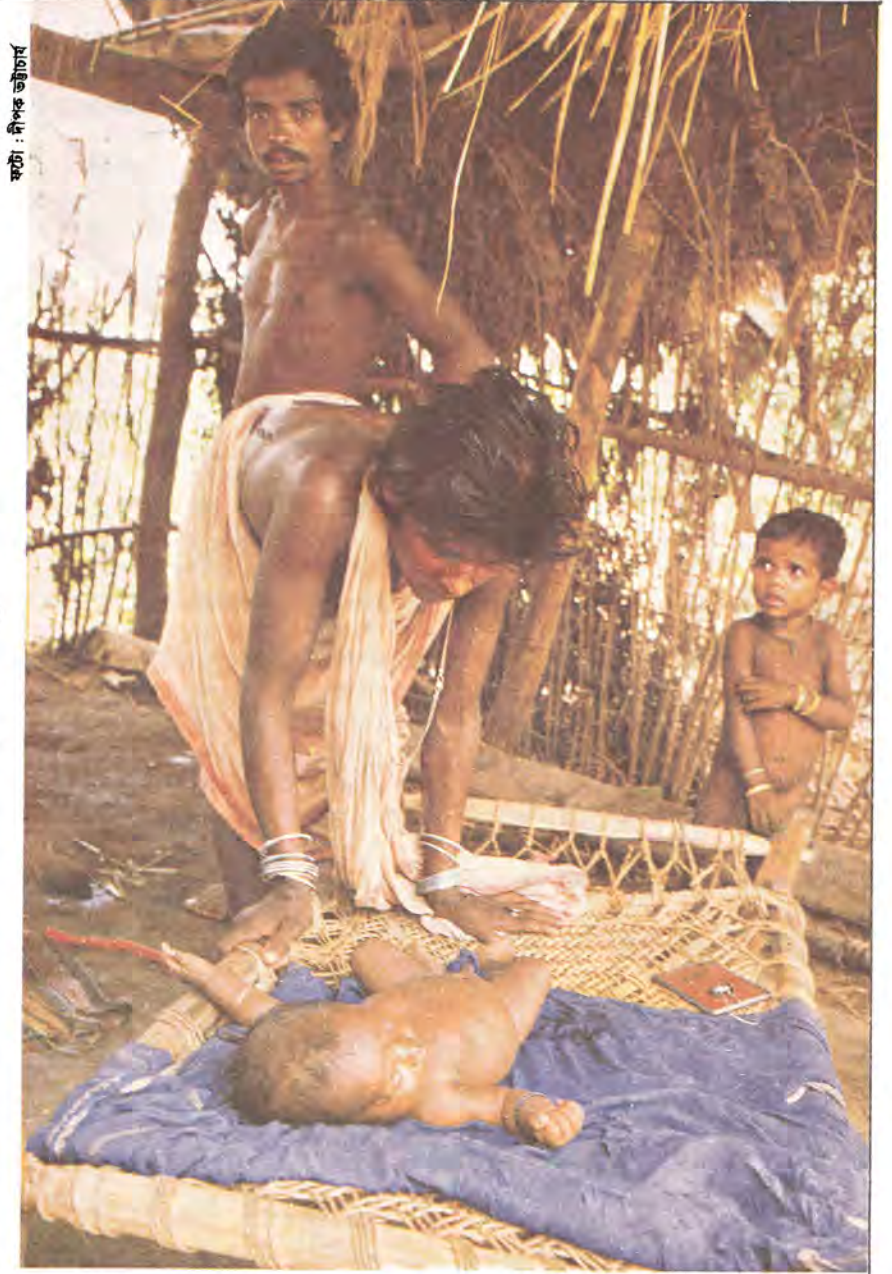
এই শিশুটিও বড় হবে

রঙিন মিছিল দেখেছি। তবে কি বন্যা খরা টুংরোর ধকল এখনও সামলে উঠতে পারে নি গ্রাম বাংলা ? কিন্তু এবার তো ভালো ফসল হয়েছে। মনে পড়ল মেমারির ভিখু শেখের কথা। বাম সরকারের দৌলতে প্রান্তিক চাষী (১ একর পর্যন্ত জমি) বনেছিল। কিন্তু খরা আবার তাকে কাজের বদলে খাদ্যের খাদকে পরিণত করেছে। তাতেও দিন গুজরান না হওয়ায় সে ফিরেছিল পুরনো বাবুদের বাড়ির দিকে। বিনিময়ে তার ধান ওঠার আগেই অভাবী বিক্রির বন্দোবস্ত পাকা। ভিখু এখন ক্ষেতমজুরির রেট নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে।

দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে শুরু হল সত্যিকারের কষ্টকর রাস্তা। চড়াই-উৎরাই, পাকদণ্ডি, খাদ, জঙ্গল। বিহারের কোডারমা পর্যন্ত পথ ছিল মাস্‌ল টাটানো, ফুসফুস ফাটানো। রানীগঞ্জ আসানসোলের পর পার হচ্ছি বরাকর। গোটা রাস্তাটাতেই কোলিয়ারি সংস্কৃতির একটা চলন্ত কোলাজ আমাদের সাইকেলের পাশে পাশে সরে সরে যাচ্ছিল। লাল-গোলাপি হলুদ নাইলনের শাড়ি, ফিতেবন্দী পরিপাটি চুলে তেলের স্বচ্ছলতা, বোম্ভার রং শরীরে উল্কির কারুকাজ। কোলে কাঁকালে ন্যাটাপোটা চেপে ধরে মুগ্ধচোখে মনিহারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। আর চকিতে নথ ঘুরিয়ে সামনের কল্কাপাড় ধুতি আর পাঞ্জাবি কাটিং জামাকে ঠোনা মারে। মেলায়

পালকের ময়ূর, রোল্ড গোল্ডের গয়না, ঘর সংসারের টুকিটাকি, আখের রস, জিলাপি-নিমকি নাগরদোলা সার্কাস সব আছে। দরদস্তুর শুরু হয়। লরি ভরে ভরে বিভিন্ন কোলিয়ারিতে সবাই দুর্গাঠাকুর দেখতে চলেছে। অধিকাংশই বিহারের মানুষ। এরই মধ্যে দীর্ঘ পতাকায় চাঁদ ওঠে। মহরমের চাঁদ। এপারে দুর্গাপূজার ভিড়ের পাশে ওপারে মহরমের প্রস্তুতি। গাঙ্গেয় অঞ্চলের মতো বুকচাপড়ে নয়, শান্ত ছন্দময় দৌড়ে শহিদ রাজপুত্র হাসানহোসেনকে স্মরণ করছে তাদের শ্রমজীবী আত্মীয়েরা, কোমরে ও মাথায় গোঁজা ময়ূরের পালক। করুণ ও একঘেয়ে সুরে একটা ধ্বনি তুলছে। অন্যেরা ধুয়ো দিচ্ছে। দূর থেকে মিছিলের শ্লোগান মনে হচ্ছে। এদিকে অস্থায়ী বেশ্যাপট্টীও খোলা হয়েছে। চ্যাংড়ারা মুখভর্তি পানের পিক নিয়ে দরাদরি করতে গিয়ে জামাকাপড় রঙিন করে ফেলছে। চলছে ফস্টিনস্টি। আজ বোনাসের আর বখশিসের টাকা সব উড়ে যাবে।

১৫ অক্টোবর/নিরসা, ধানবাদ

নিরসায় যখন ঢুকলাম তখনও দৃশ্যাবলি একই থেকে যায়। খাদান ও খাদান মজুরদের জেলা ধানবাদের সদর দরজা এই শহর। এখানে সিনেমাহল, সরকারি অফিস, গুরুদোয়ারা, পার্টি-অফিস, স্কুল সব আছে। কিন্তু সরকারি কোনো টিউবওয়েল নেই। কুয়ো নেই। দুটো মজাহাজা পুকুর আছে। তাতে গরুবাছুর থেকে মানুষ সবাই স্নান করে। ঐ জলেই প্রাতঃকৃত্য। ওতেই কাপড় সাফা। দেড়-দুই কিলোমিটার দূরের থেকে জল আনতে হয়। রাতে এক ভদ্রলোক অতিথিজ্ঞানে আমাদের দু বালতি জল দেন। তৃতীয় বালতি চাইলেই তিনি বিব্রত ও অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

বস্তুত বিহারের সর্বত্রই পানীয় জলের সমস্যাটা আজও নিদারুণভাবেই রয়েছে, যদিও শীতের জন্য আমরা এর তীব্রতাটা অনুভব করি নি। উত্তরপ্রদেশে যেখানে দশহাত অন্তর কুয়ো, ডিপ টিউবওয়েল চলছে সর্বত্র, ধাবা-মালিকরা পর্যন্ত শ্যালো বসিয়ে নিয়েছে, সেখানে বিহার তা উত্তরই হোক বা দক্ষিণ, দিকে-দিকে শুধু নাই নাই। আমাদের রাস্তায় পড়েছে ধানবাদ গিরিডি হাজারিবাগ ইত্যাদির মতো ছোটনাগপুর রেঞ্জের অনুর্বর জেলা থেকে নালন্দা নওয়াদা পাটনা আরা রোহতাসের মতো সমতল দুফসলি কখনো বা তিনফসলি এলাকা কিন্তু এই জল সংকট কোনো অর্থনৈতিক গোত্রবিচার মানে নি। কিছুদিন আগেই মধ্যপ্রদেশের চম্পা বলে একটা ছোট শহরে পানীয় জলের সুব্যবস্থার দাবিতে শহরের নাগরিকরা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করলে পুলিশ গুলি চালায়। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা দেশেই লক্ষ লক্ষ চাতক গ্রাম ছড়িয়ে আছে স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও। অবশ্য এটা কোনো নতুন কথা নয়। নেহরুর পর পদযাত্রী চন্দ্রশেখর ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করতে গিয়ে পানীয় জলের অভাবটা টের পান। আমরা সেই পুনরাবিষ্কারের পুনরাবিষ্কার করতে চাই না। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল, পানীয় জলের অধিকার আজ শুধু একটি মানবিক অধিকার নয়, এমন কী একটি রাজনৈতিক অধিকারও হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত জীবনযাত্রার জন্য যেসব দাবি মেট্রোপলিটান শহরগুলোতে তোলা হয়, আপাত বিচারে নির্মল পানীয় জলের দাবি তার থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া নিরামিষ দাবি বলে বোধ হতে পারে। ব্যাপকতম মানুষের ন্যূনতম অধিকারগুলিকে গণতান্ত্রিক শাসকেরা কী চোখে দেখে থাকে এবং কীভাবে জলকে কেন্দ্র করে শ্রেণীসংঘাত স্পষ্ট রূপ নেয়, 'তান্নির তান্নির'-এ সেই জলছবি আমরা দেখেছি এরপরেও কি জলের দিকে আমরা নতুন চোখে তাকাব না!?

১৬ অক্টোবর/ইসরি ডুমরি, গিরিডি

হি হি শীত। ভোরবেলায় দেখি সামনে পেছনে

তানির তানির-এর নায়িকা

ফটো : কুণাল গঙ্গোপাধ্যায়

দুদিক দিয়েই ধোঁয়া বেরচ্ছে। সারা রাস্তা এরকম হলেই গেছি।

১৭ অক্টোবর/ বারহি, হাজারিবাগ

এবার আমরা শাহীসড়ক থেকে ৩১ নং রাঁচি-পাটনা রাজ্য সড়কে ঢুকে পড়লাম। শুরু হল পাটনার দিকে ৩০০ কিলোমিটার ঘুরপথ। শত হলেও পাটলিপুত্র তো। চন্দ্রগুপ্ত অথবা চন্দ্রশেখর, হাজারিবাগের জঙ্গলহাঁসিল মানুষের কাছে চিরকালই সবাই দূরঅস্ত। পাটনা যাব শুনে এগিয়ে এল একটি 'দেখি কী ব্যাপার' ভিড়। তাদের মধ্যে ছিল যুবক মুন্না। ছোট স্টেশনারি দোকানের মালিক। সে জানাল গত একবছর আগে এখানে একটি হরিজন শিশু ট্রাকের তলায় পিষে যায়। পুলিশ সেই ট্রাকমালিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের তদন্ত-রিপোর্ট অথবা চার্জশিট দেয় নি। উল্টে মুন্না ইত্যাদি স্থানীয় যুবকদের এ ব্যাপারে উৎসাহ কমাতে নানা ঝুটা কেসে জড়িয়ে হয়রান করছে। ঘটনার দিন পুলিশ এসে কোডারমায় লাশ নিয়ে যেতে চায়। উদ্দেশ্য মহৎ, পোস্টমর্টেম। মহল্লার জনতা রাজি হয় না। কারণ লাশ ফেরৎ আনার জন্য ট্রেনের কামরা রিজার্ভ করতে হবে, যার পয়সা তাদের পকেটে নেই। হরিজনটোলার সবাইকে বেচলেও তা উঠবে না। উল্টে তাদের দাবি ছিল যেখানে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই সেখানে লাশ নিয়ে এই অহেতুক এবং ব্যয়সাপেক্ষ টানাহেঁচড়া কেন ? বিহার পুলিশ বেশি কথা পছন্দ করে না। শুরু হল লাঠি।

জনতা অ্যামেচার ইটে প্রত্যুত্তর দেওয়ায় প্রফেশনাল পদ্ধতিতে পুলিশ তাদের ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করে। গুলিতে একজন মারা যায়। এ নিয়ে হইচই হলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সেকুলার বিবৃতি দেন : পুলিশকে উত্তেজিত করা হয়েছিল। যার জের চলছে এখনও। কিন্তু যে পোস্টমর্টেম ঘিরে এই ঘটনা, সেখানে প্রশ্ন থেকে যায়, স্বাভাবিকভাবে আমরা সবাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু যেখানে ময়নাতদন্ত হচ্ছে তদন্তে টালবাহানার আইনি উপায়মাত্র সেখানে নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোর অবস্থান কী হবে ? তার থেকেও বড় কথা, সাধারণ মানুষের পক্ষে ময়নাতদন্তের পর লাশ ফিরিয়ে আনার পয়সা জোগাড় করা সম্ভব না যখন, তখন এমন কী শাদা কানুনগুলোও জুলুমের উৎস নয় কি ? বারহিতেই শুরু হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক। প্রচারের সময় আমরা হরিজন এবং অন্যান্য নিচুজাতের উপর অত্যাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বর্ণহিন্দু তথা ক্ষমতা ও বিত্তে বলীয়ান জাতিগুলোকে চিহ্নিত করব এবং জাতপাতের প্রথাটিকেও আক্রমণ করব, না কি সাধারণভাবে গরিবদের উপর আমীরদের অত্যাচার বলেই

ফটো : সোমনাথ ঘোষ

জলে-জঙ্গলে, খাদ্যের খোঁজে

ব্যাপারটাকে হাজির করব ? তর্কটার ফয়সালা ডায়েরির পাতাতেই করে ফেলার ইচ্ছে নেই। বদলে এই প্রশ্নে আমাদের অভিজ্ঞতাটা লেখা যাক। নওয়াদাতে দেখলাম আমাদের অভ্যর্থনা সভায় এক বক্তা ভাষণ শুরু করলেন ফরাসি বিপ্লব থেকে, কিন্তু অন্য একজন তার বক্তব্যে জাতপাতের উল্লেখ করলে সেই বক্তাই তাকে পাজামা টেনে ধরে থামিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারটা সব জায়গাতেই ঘটেছে নানাভাবে। লক্ষণীয়, ছুয়াছুঁত বা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বলা যাবে, বিহারের রাজনৈতিক কালচার সেই পর্যন্ত সহনশীলতা দেখাতে রাজি। কিন্তু তা বাদ দিয়ে বর্তমান জাতব্যবস্থাটা টিকে থাক, এটাই হল সাধারণ মানসিকতা। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশের গ্রাম বলে কিনা জানি না, আমরা কোনো গ্রামেই বিশেষ বর্ণের জন্য সংরক্ষিত কুয়ো দেখি নি। এমন কি পরস্পরের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও যাতায়াত বাড়ছে। কিন্তু তা বলে গ্রামের ভূগোলে জাত বা বর্ণভিত্তিক বসতি সংস্থানটা একই আছে। গ্রামের মাঝে উঁচু জায়গায় সেই গ্রামের প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী উঁচু বর্ণের তথা ব্রাহ্মণ, ভূঁইহার, রাজপুত ইত্যাদিদের বসবাস। আশেপাশে এবং পরিধির দিকে কুর্মি, যাদব, বানিয়া ইত্যাদি মধ্যম বর্গীয়দের ঘর। পরিধি জুড়ে হরিজনটোলা ও অন্যান্য নিচু জাতদের ঝুগগি বা ঝোপড়ি। যদিও বেশির ভাগ গ্রামেই সব জাতি বা বর্ণের লোক একসাথে থাকে না। কোনো না কোনো বর্ণের পাল্লা সেখানে ভারি। কিছু নিতান্ত পশ্চাৎপদ এলাকা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বর্ণভেদের উগ্রতাটা চোখে পড়ে নি। কিন্তু জাতিব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ণ ও বহু গভীরে তার শেকড়। বেশ কিছুদিন আগে লিলুয়ায় রেল শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল সত্যনারায়ণের পুজো। ত্রিবেণী টিটাগড় থেকেও দেহাতি দোস্ত রিস্তেদার আসছিল, ফ্যাক্টরির নামে কেউ কারো সাথে পরিচিত হচ্ছিল না। সব জেলা বা গাঁয়ের নামে। কেউ ছাপরা, কেউ আজমগড় গাজীপুর। সত্যনারায়ণের কথা শুনছিল সবাই একসঙ্গে বসেই, কিন্তু খাবার সময় দেখা গেল কুর্মিরা একদিকে যাদবরা আরেক সারিতে। কেউ এটাকে খারাপ মনে করে না। জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন বাঙালিরা বিয়ে পুজো শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার মেনে নিয়েছে। তাদের প্রতি অতীত সম্ভ্রম, ভীতিটাকে বাদ দিয়ে। তা বলে কেউ হরিজনদের সাথে বসে খাবে না, যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি আজও বাড়ির বাথরুম ধুতে আসা ধাঙড়-মেথরানিকে ছোঁয় না। সংস্কারের উগ্রতার বদলে অভ্যাসের ঐতিহ্য সেখানে মূল্যবোধের গঠন নির্ণয় করে। যেমনটা 'সদগতি'তে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটার চরিত্রটাই যায় পাল্টে যখন দেখা যায় হরিজন তথা রবিদাস, হাজাম, পাসি, আহির ইত্যাদি জাত বা বর্ণগুলো বানিহার তথা ক্ষেতমজুর বাহিনীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ! এবং মধ্যবর্তী কুর্মি যাদবরা (সাধারণভাবে) এখন বিত্তে ও বিশ্বাসে রাজপুত, ভূঁইহার ও ব্রাহ্মণ তথা জমিদার ও কুলাক শ্রেণীর কাছের লোক। যদিও আমরা বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক ইত্যাদি অর্থনৈতিক গোত্রে বিভিন্ন বর্ণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে সার্ভে করার সুযোগ পাই নি, তবু এক কথায় হরিজন জোতদারের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে হইচইয়ের মানে হয় না। উত্তরপ্রদেশে যেভাবে শহুরে ধাঁচের মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে তার প্রধান উপাদান হল বেকারি আর যে কোনো সূত্রে শহরের সাথে গা ঘষাঘষি। এদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার ব্রাহ্মণ থেকে পি অ্যান্ড টিতে চাকরি করা যাদব সবাই আছে। তা সত্ত্বেও একজন ক্লাশ ফোর কর্মচারী যখন গ্রামে ফিরে জাতের গৌরবে হরিজন ও অন্যান্য অন্ত্যজদের উপর ছড়ি ঘোরানোর আন্তরিক আহ্লাদ পায়, তখন শ্রেণীসংগ্রাম নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনও হয়েছে দু বিঘে জমির মালিক ব্রাহ্মণ জাতিকৌলীন্যে হাল-লাঙলে হাত দেয় না। হরিজন ক্ষেতমজুরদের সাথে বড় বড় জোতের মালিক ব্রাহ্মণ রাজপুতদের লড়াইতে কৃষক সংগঠন ঐ গরিব ব্রাহ্মণটিকে ছাড় দিয়েছে। তবু সে স্বজাতির পক্ষে লাঠি ধরেছে সমান আক্রোশে।

ধারাবাহিক

মৃত্যু শিবিরের শিল্প

উলফগাং স্নাইডার

অনুবাদ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ও সৌমেন ভট্টাচার্য

পাঁচ

বাধ্যতামূলক শিল্পকর্মকে বন্দীরা কতভাবে নিজেদের পরিকল্পনার কাজে লাগাতেন তার প্রমাণ একটি উদাহরণ থেকে পাওয়া যায়। বন্দীদের গোপন সামরিক পরিকল্পনা বিভাগ 'রোহলিং'-এর নির্দেশে উঁচুমানের ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয় চিঠি খোলার ছুরি, এরপর গ্যালভানাইজিং বিভাগের শান দেবার মেশিনে এগুলিকে ধার দিয়ে তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরধার করে তোলা হয়। ছুতোরখানা থেকে তৈরি হয়ে আসে ছুরিগুলির হাতল। শক্ত এবং ধারালো এই ছুরিগুলিকে 'রোহলিং'-এর নির্দেশে বন্দীরা লুকিয়ে রাখেন আগামী সেই দিনের জন্যে, যেদিন বন্দীরা নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

গোড়ার দিকে হস্তশিল্পের যে ভূমিকা ছিল পরবর্তীকালে তা অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে ওঠে। শিবিরের গোটা সাংস্কৃতিক জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে প্রাক্তন চেক বুখেনওয়াল্ড বন্দী ডিওনাইজিউস পোলানস্কি লিখেছেন

"অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা দিত এক অবসাদ ভরা হতাশা। এর মোকাবিলা করার জন্যে দাবা খেলা ছিল এক আদর্শ অস্ত্র। এই খেলাকে কেন্দ্র করে বন্দীরা নিজেদেরকে নানাভাবে মগ্ন রাখতেন—দাবার ঘুঁটি তৈরির কাজে নতুন জিনিশের প্রতি উদ্দীপনায়, দাবা খেলার তত্ত্ব, প্রয়োগ এবং ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনায়, দাবার প্রতিযোগিতায় এবং শেষ পর্যন্ত দাবার অলিম্পিয়াড নিয়ে।

"গোড়ার দিকে ঘুঁটিগুলি তৈরি করা হয় পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে। সামান্য যেটুকু রুটি জুটত তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। পরের দিকে সেগুলি কাঠ কেটে বানানো হয়, এগুলি ছিল আংশিকভাবে কারুকার্য করা খোদাই কাজ

গরুর হাড় থেকে তৈরি লকেট

বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য কিছু বন্দী ছিলেন 'কিছুটা সুরক্ষিত'। এঁদের সব সময়েই নাৎজীদের কারখানায় বিভিন্ন মেশিনে কাজ করতে হত। এঁরা পরবর্তীকালে তৈরি করে দিতেন ধাতুর ঘুঁটি ও দাবার ছক। অবশ্যই গোটা ব্যাপারটা ঘটত গোপনে। এস. এস. এর নজর এড়িয়ে।

"দাবাখেলা আমাদের ব্লকের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত হয় শিবিরের প্রথম দাবা-অলিম্পিয়াড। ১৯৪২ ও ১৯৪৪ সালে পরবর্তী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে বন্দীদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কেবল সম্ভবই নয়, প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন দেশের ও জাতির মানুষ—সোবিয়েত, জার্মান, ফরাসি, ইটালিয়ান, ডাচ, বেলজিয়ান, পোলিশ, চেক এবং অন্যান্যরা। প্রথম অলিম্পিকের উদ্বোধনী সংগীত আমারই লেখা। প্রতিযোগিতার আসল উদ্দেশ্য ছিল খেলা নয়, গোপন রাজনৈতিক মন্ত্রণা।"

আর্ট ওয়ার্কশপ, মেকানিকাল বিভাগ, ও ছুতোর খানার পাশাপাশি বই বাঁধাই লাইব্রেরি বিভাগও হয়ে ওঠে শিল্পকর্মের আর এক কেন্দ্র। বুখেনওয়াল্ডের প্রাক্তন বন্দী আলফ্রেড ওট-এর জবানিতে

"১৯৩৭-এর নভেম্বরে যখন আমাকে

বুখেনওয়াল্ড শিবিরে চালান দেওয়া হয়, তখন সেখানে ছিলেন প্রায় ২০০০ বন্দী। বই বাঁধাই (লাইব্রেরি বিভাগে) সে সময় কাজ করতেন তিন জন ; লেখক/করণিক রুডলফ্ আপিৎজ, ছাপার কাজের জন্য ফ্রিৎজ বোগাডেন এবং লাইব্রেরিয়ান ওয়াল্টার ইজেমান। তিনজনই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে আমাকে পাঠানো হয় এঁদের সঙ্গে বুকবাইন্ডার হিশেবে কাজ করতে।

"বই বাঁধাই কারখানাটি ছিল ১ নং ব্লকে। সাথেই ছিল বন্দীদের লেখার ঘর, পোষ্ট অফিস এবং নির্মাণ সংক্রান্ত অফিস, আমাদের কারখানার সাজসরঞ্জাম ছিল একেবারে আদিম। যন্ত্রপাতি বলতে ছিল একটি হাতে চালান ছোট প্রেস, ছুরি, কাঁচি আর কাগজ ভাঁজ করার একটি যন্ত্র। আমি আসার আগে এখানে তৈরি হত শুধু শিবির চালক এবং ক্যাপোদের জন্য নোটিস বুক আর গেট পাশ ইত্যাদি। আমাকে বুক-বাইন্ডার হিশেবে নিয়োগ করার পর আদেশ আসে উঁচুমানের কাজ করার জন্য। হুকুম হল শিবিরের মোট ৪০ জন অফিসারের জন্য ক্যালিকো আর কৃত্রিম চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা পকেট ডায়েরি তৈরি করার। তাছাড়া শিবির প্রধান কোখ-এর আদেশে তৈরি করা হল কোখ-এর নিজস্ব ভিলার জন্য একটি গেস্ট বুক শুয়োরের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা খাতাটির মলাটের উপর রুপো দিয়ে স্বস্তিক চিহ্নখচিত, খাতার চার পাশ পাতলা-সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। গেস্ট বুকের প্রথম পাতাটি ছিল নানান কারুকার্য করা লিথোগ্রাফি দিয়ে ভর্তি। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় ছাপাখানার নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। এই থেকেই তৈরি হয় বন্দী শিবিরের লিথোগ্রাফিক প্রেস।

"এই কাজগুলি শেষ করার পর শিবির কম্যাণ্ডার এবং অন্যান্য অফিসারদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কাজের আদেশ আসতে লাগল। যেমন, নির্দেশ এল শুয়োরের চামড়া দিয়ে মোড়া বেশ কয়েকডজন ফটো অ্যালবাম তৈরি করার। এছাড়া শিবিরের এস. এস. কম্যাণ্ডোর সান্ধ্য বৈঠকের একটি পত্রিকা ছাপার আদেশ এল। পত্রিকাটিতে নানা ধরনের ছবি ছাপা হয়েছিল, এর নাম ছিল 'পেলিক্যান'। তাছাড়াও এস. এস. এর রাজনৈতিক বিভাগ এবং রেজিষ্ট্রি অফিসের নির্দেশে বাঁধাই করা হত নানান আকারের রেজিষ্ট্রি খাতা। এসবের ফলে ছাপাখানার এবং বই বাঁধাইয়ের কাজ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং বিভাগটি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের বিভাগের 'ক্যাপো' কিছু মেশিনপত্র এবং লোকজন চেয়ে দরখাস্ত করলে তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মঞ্জুর হয়ে যায়। চলে আসে একটি কাগজ কাটার মেশিন। একটি বোর্ড কাটার মেশিন এবং একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস। ১৯৩৮ সালে বই বাঁধাই তথা লাইব্রেরি বিভাগের কর্মীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় এগারোয়। দুজন বুক বাইণ্ডার, একজন কেরাণী, দুজন লিথোগ্রাফার, একজন লিথোপ্রেস অপারেটর, একজন গ্রাইণ্ডার, একজন প্রেস অপারেটর, দুজন লাইব্রেরিয়ান এবং একজন কাপো।

কলমদানি : এমন সূক্ষ্ম কাজও বন্দীদের হাত দিয়ে হতো

"শিবিরের লাইব্রেরিটিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ইতিমধ্যে বুখেনওয়াল্ড শিবিরে ফ্যাসিস্টরা দশ থেকে এগারো হাজার বন্দীদের ধরে আনে। ফলে মোট বন্দীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় পনেরো হাজারে। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ছেঁড়া ফাটা বইগুলি বন্দীরা নিয়মিত মেরামত করতেন।

"এই ছাপা-বাঁধাই বিভাগের কর্মীদের একটা বড় অংশকে এস এস অফিসারেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করত। যেমন নির্দেশ আসত কারুকার্য করা জন্মদিনের কার্ড ছাপবার বা কোনও ফ্যাসিস্ট অফিসারের বংশবৃক্ষ ছেপে দেওয়ার। কখনও বা ছাপতে হত এস. এস. এর কোনও অফিসারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি উৎসর্গ করা কার্ড। একবার নির্দেশ এল এক এস. এস. ডাক্তারের ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লেখা থিসিসটি ছাপবার। থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'উল্কি' (TATOOING), ছোট বইয়ের আকারে প্রায় এক হাজার কপি ছাপাও হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সেটিকে ডক্টরেট স্বীকৃতি না দেওয়ায় নির্দেশ আসে বইগুলিকে কাগজের মন্ড তৈরি করার কাজে চালান দিতে। "এক নং ব্লকে জায়গার অভাবের জন্য ১৯৩৯ সালের গোড়ায় আমাদের বই বাঁধাই তথা লাইব্রেরি বিভাগটিকে ৪ নং ব্লকে নিয়ে আসা হল। ঐ বছরের শেষে প্রায় তিরিশজন বন্দী এখানে কাজ করতেন। বেশিরভাগ কাজই হত এস. এসদের ব্যক্তিগত শখ পূরণের জন্যে। যেমন শিবির কম্যাণ্ডার কোখের পরিবারের প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব ফটো অ্যালবাম ছিল। এমন কি এই পরিবারের কোলের শিশুটিরও নিজস্ব অ্যালবাম ছিল। কয়েক সপ্তাহ অন্তরই নতুন নতুন অ্যালবামের জন্যে আদেশ দিত তারা।"

এই বই বাঁধাই-লাইব্রেরি বিভাগের বন্দী সদস্যরা কিন্তু শুধু এস. এস-এর জন্যই কাজ করতেন না। এ ক্ষেত্রেও বৈধ সুযোগগুলিকে কাজে লাগানো হত, বন্দীদের স্বার্থে কিছু করার জন্যে। যেমন সুযোগ বুঝে গোপনে ছাপানো হত নানা জাতির সহবন্দীদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড, কারু কার্য করা শ্রদ্ধানিবেদন ইত্যাদি।

এসব থেকে বুখেনওয়াল্ড শিবিরে বন্দী মানুষগুলির বহুমুখী প্রতিভার একটা সার্বিক ছবি পাওয়া যায়। এস. এস. কর্তৃক জোর করে আদায় করা শিল্পকর্মগুলি ছাড়াও বন্দীরা নানান শিল্পসৃষ্টিতে লেগে থাকতেন। সেসবই তাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে গোপনে তৈরি করতেন, এই শিল্পকর্মগুলি বন্দীদের সংগ্রামী মনোভাবের এবং অন্তরের দৃঢ়তার বিশ্বস্ত সাক্ষী। এদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বন্দীদের শিল্পপ্রীতি এবং বীরত্বের। এমন কি ফ্যাসিস্টদের জন্য তৈরি শিল্প কর্মগুলিও প্রমাণ করে যে, "হীনতম, অমানবিক নির্যাতনের মধ্যেও বন্দীদের সুন্দর শিল্প সৃষ্টির মানসিকতাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় নি। এস. এস. বন্দীদের বাধ্য করে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের জন্য শিল্পসৃষ্টি করতে। বন্দীরাও লেগে যান কাজে। ফলে কিন্তু এস. এস. এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দীদের হাতে আসে নিজেদের গড়ে তোলার এক সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বন্দীরা তাঁদের নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাসকে বজায় রেখেছেন, পঙ্গু হতে দেন নি। তাঁদের সৃজনশীল ক্ষমতার সাক্ষী এই শিল্পকর্মগুলিকে এস. এস ছিনিয়ে নিত বিনা পারিশ্রমিকে। এগুলি ছিল ফ্যাসিজমের রাজত্বে নিপীড়িত মানুষগুলির উন্নততর সাংস্কৃতিক মানের জীবন্ত প্রমাণ।" (ইলসে শুলৎজ)

খুন : পিয়েরে মানিয়া

এই সব শিল্পসৃষ্টির পেছনে যে দাসশ্রম, নিজেদের ভাষায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুখেনওয়াল্ডের দুই বন্দী। এরপর আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। শিবির কম্যান্ডার কোখ-এর বাড়ি তৈরির সময় তাঁরা বাড়ির ভিতের মধ্যে একটা শিশি পুঁতে দেন। তার ভেতরে একটা কাগজে লিখেছেন : অক্টোবর ১৯৩৭, বুখেনওয়াল্ড শিবিরের বন্দীদের দ্বারা নির্মিত। তারপরেই তাঁদের ঘোষণা 'কমপেল্ড বাট নট কনকার্ড' বুখেনওয়াল্ড বন্দী শিবিরে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক এবং হস্তশিল্পের পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নানা দেশের বেশ কিছু বিখ্যাত শিল্পী এখানে বন্দী ছিলেন, মাত্র কয়েকজনের নামই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন চেক শিল্পী জোসেফ চ্যাপেক, পোল্যান্ডের ক্যারল কনিএকজ্নী, ফ্রান্সের পিয়েরে মানিয়া, হল্যান্ডের হেনরী পীক, এবং জার্মানির হ্যাবার্ট স্যান্ডবার্গ, এঁদের পাশে বহু অজানা শিল্পী চেষ্টা করতেন তাঁদের আঁকা ছবি বা স্কেচের মধ্যে অতীতের আনন্দ-স্মৃতিকে ফিরে পেতে। ফুটিয়ে তুলতেন বন্দী-জীবনের বর্তমানের জীবন-যন্ত্রনাকে। ভাষা দিতেন ভবিষ্যতের আশাভরা স্বপ্নকে। এই মানুষগুলির শিল্পতন্ময়তা আর নির্ভীক ত্যাগের কথা লিখেছেন প্রাক্তন ফরাসি বন্দী আগস্ট ফেবিয়ার

"অনেক সময় এক টুকরো রুটি বা একটা সিগারেটের টুকরোর বদলে পাওয়া যেত কাগজ আর পেন্সিল। এদুটি হাতে থাকলে যখনই সম্ভব হত আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তাম ছবি আঁকার কাজে, ধরে রাখতাম বন্দী জীবনের বিভিন্ন মুখ আর দৃশ্য। অবশ্য আমাদের এই সৃষ্টিবাসনা এবং জীবনতৃষ্ণাকে চুরমার করে দিতে এস. এস. বাহিনীর লোকেরা লেশমাত্র দ্বিধা করত না।... বন্দী শিবিরে অসংখ্য স্কেচ আঁকা হয়। শত শত কমরেডদের ছবি আঁকা হয়েছিল। ফরাসি, জার্মান, সোবিয়েত, পোলিশ, চেক, ইটালিয়ান, তুর্কি ও আরও বহু জাতের মানুষের স্মারক। বেশ কজন পেরেছিলেন এই স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে ঘরে ফিরতে। এর বদলে তাঁরা আমাদের দিতেন হয়তো একটু তামাক বা একটা সিগারেট। কখনও বা বন্ধুত্বের করমর্দন।"

গ্রাফিক বা চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও এস.এস. বন্দীদের দিয়ে তাদের হুকুম মতো ছবি আঁকিয়ে নিত। তাই এক্ষেত্রেও গোপন শিল্পের অর্থ ছিল একটাই—বন্দীদের প্রাণ বিপন্ন করা। তবুও বহু গোপন স্কেচ আর ছবির মধ্যে দিয়ে বন্দীরা প্রকাশ করতেন তাঁদের আসল সত্তা, স্বাধীন শিল্পের প্রতি তাঁদের গাঢ় ভালোবাসা। পাশবিক এবং নিকৃষ্টতম পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মসম্ভ্রম বোধের জীবন্ত সাক্ষী এই শিল্পকর্মগুলি। ওলফ্ গাঙ্গ লা হোফের ভাষায় এই ছবিগুলি হল "গতকালের, আজকের এবং আগামী দিনের বিজয়ী মানুষের সংগীত"। এই সত্যিকারের শিল্প এবং তার স্রষ্টাদের অন্তরের অজেয় শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন বুখেনওয়াল্ড বন্দী হ্যারবার্ট গুটে তাঁর প্রখ্যাত 'পার্টিজান—উইদাউট আর্মস' বইয়ে লিখেছেন

পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের রূপটা কিরকম এ বিষয়ে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে যোগাযোগ হবে এটা বিশ্বাস করতাম। শিবিরের শ্বাশরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যেও আমরা নিশ্বাস নিতাম। ছেঁড়া মলিন কাপড়ে জড়ানো কঙ্কালের মতো শরীরগুলি চলে বেড়াত শিবিরের জলকাদা ভরা মেঠো রাস্তা দিয়ে। কোটরে ঢোকা চোখগুলি এক মনে মাটির দিকে তাকিয়ে খুঁজে বেড়াত—একটা কাপড়ের টুকরো, একটা ফেলে দেওয়া দড়ি, একটা তুবড়ে যাওয়া টিনের কৌটো, এক টুকরো কাগজ—সবকিছু তুলে নিয়ে জহুরির মতন পরীক্ষা করে দেখা হত কোনও কাজে লাগবে কিনা।

ধারাবাহিক

বৈরাগীতলার পথে

রামকিঙ্করের শেষ পর্যায়ের কিছু ছবি

রবি পাল

একটি পরিপূর্ণ মহাজীবনের যে কোনো একটি খণ্ডিত অংশ নিয়ে আলোচনা করা অনেক সহজ, কেননা খণ্ড, খণ্ড অংশই পূর্ণতার আভাস দেয়। আবার রামকিঙ্করের মতো বিশেষ ব্যক্তিত্ব হলে তো কথাই নেই।

ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পীজীবন নানান সংঘাতময় ঘটনায় একদিক যেমন পরিপূর্ণ তেমনি অন্যদিকেও বৈচিত্রে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এই বৈচিত্রময় স্বাদ আমরা আস্বাদন করি তাঁর বাল্যকালের কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই। দেবদেবীর চিত্ররচনা, মাটি দিয়ে লৌকিক মূর্তি বা পুতুল বা থিয়েটারের পশ্চাৎপট দৃশ্য আঁকার মধ্য দিয়ে কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু সে বিস্তার-বৈচিত্রের মধ্যে ছিল খানিকটা বালকসুলভ চাপল্য ও সারল্য, কিন্তু আবেগ ও উপস্থাপনায় তাঁর সততা সন্দেহাতীত। আর তার প্রমাণ কোনো মূর্তি বা পুতুলের মধ্যে না পেলেও থিয়েটারের পশ্চাৎপট দৃশ্যে ও উদ্ধারপ্রাপ্ত কয়েকটি তৈলচিত্রের মধ্যে দেখতে পাব। এ সবই কিন্তু একমুখী আবেগ উৎসারিত রূপ ও অশিক্ষিত-পটুত্ব। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে শান্তিনিকেতন রামকিঙ্করের মনে লালিত্য আবেগ ও নানা আঙ্গিকে পটুত্ব অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াল।

আজকের আলোচনা মূলত জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আঁকা কয়েকটি নির্দিষ্ট ছবির উপর সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এই সুসংবদ্ধ রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে রামকিঙ্করের মনের তাৎক্ষণিক আবেগ কীভাবে, কোন ধারায় প্রকাশিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই আলোচনার ভিতর দিয়ে শিল্পরসিকবর্গ ও সাধারণজন জানতে পারবেন যে অতি তুচ্ছ ঘটনা

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত গর্ভবতী গাইগরু

রামকিঙ্করের অতি স্পর্শকাতর দরাজ মনকে কতটা ব্যথিত, উল্লসিত বা উদ্বেলিত করত প্রাত্যহিক জীবনের প্রবহমান আনন্দ, বেদনা বা উল্লাস রামকিঙ্করের মতো প্রকৃত শিল্পীমনকে অভিভূত করতে পারে নি। কখনও বা কোনো ঘটনা চাক্ষুষ ঘটতে দেখে উদ্দীপ্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিজেকেই রোমন্থন করে সর্বসাধারণের মাঝে উজাড় করে ব্যক্ত করেছেন।

শেষ কয়েক বছরে আঁকা ছবিগুলির কথ আলোচনা করতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী শিল্পভাবনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যৎসামান্য রেখাপাত করা সমীচীন বলে মনে করি। শিল্প রসিকজন বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন যে রামকিঙ্কর ছাত্রজীবনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের একান্ত স্নেহভাজন হয়ে উভয়ের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে ছবি আঁকায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং সফল উত্তরসূরীর মতো রোমান্টিক, পৌরাণিক, লৌকিক বিষয় ভিত্তিক ছবির সার্বিক পরিবেশ রচনায় যে চরম সার্থকতা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রায় এক দশকের কিছু কম কালসীমা পর্যন্ত তাঁর ছবির জগতে ওই সব পৌরাণিক, রোমান্টিক, লৌকিক কাহিনীর কুশীলবরা ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর আপন পথ খুঁজে নিয়ে অতি সাধারণজন, বিশেষ করে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টিগত বহুমখী ধারায় আকৃষ্ট ও একাত্ম হয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন এবং সেই চর্চা আমৃত্যু চালিয়ে গেছেন। পিছন ফিরে আর তাকিয়ে দেখেন নি। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে "এই একটি সাধনাই ঠিকমতো করতে পারলে কি সাধারণ কি অসাধারণ, পৌরাণিক বা লৌকিক বিষয়বস্তু মিলে একাকার হয়ে যাবে, অসীম আনন্দে ভেসে যাবে।"

আধুনিক সমাজ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত বহু বিষয় নিয়ে যে সব শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে সে বিষয়ে রামকিঙ্করের মতামত জানতে চেয়ে একবার প্রশ্ন করেছিলাম আপনি কি মনে করেন পৌরাণিক বিষয়বস্তু ও প্রথাগত শিল্পানুশীলনের প্রয়োজন আছে? উত্তরে বলেছিলেন "নিশ্চয়ই দরকার আছে। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের কথা না জানলে ভারত-আত্মার নিগঢ় শাশ্বত বাণী জানতে পারবে না। আমিও শিক্ষার শুরুতে সীতা ও লবকুশ, নলদময়ন্তী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় ও ভাব নিয়ে প্রথাগত পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছি।"

এই বক্তব্যের আলোকে আমাদের কাছে এই ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে এই মূল্যবোধ নিয়ে রামকিঙ্করের শিল্পচেতনার শিকড় গভীরে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করেছিল। যদিও সৃষ্টির ক্রমপর্যায়ে তিনি কখনো সনাতন ও প্রাচ্যভাবের রূপকার, আবার কখনো বা আধুনিক শিল্প সৃষ্টিকারে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি চিত্র ও ভাস্কর্যের ভাষা দিয়ে সমাজের ও দেশের চরম অবক্ষয়ের প্রতি জাতিকে সচেতন করতে চেয়ে সোচ্চার হয়েছেন। মুখের ভাষা যেখানে সহজে প্রবেশ করে না সেখানে চিত্রের ভাষা অতি সহজে প্রবেশ করিয়েছেন। চিত্রভাষা যে কত শক্তিশালী সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯২০ সালে ভারত-প্রবাসী রুশী শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ'কে লিখেছিলেন "শব্দ কেবল সত্যের একটি বিশেষ দিকই প্রকাশ করতে পারে, যেখানে শব্দবাহিত ভাষা প্রবেশ পায় না, চিত্রের ভাষা সেই বিশেষ সত্যে যেতে পারে।"

পোষমেলার নহবৎখানা

রামকিঙ্করের শেষজীবনে আঁকা ছবিগুলি আমাদের সেই বিশেষ সত্যে পৌঁছে দেবে, তা সামাজিকভাবেই হোক আর রাজনৈতিকভাবেই হোক। প্রথম জীবনে কিছু রাজনৈতিক পোস্টার আঁকা ছাড়াও রামকিঙ্কর মোটামুটিভাবে ত্রিশ দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত নিজেকে রাজনৈতিক ভাবনায় সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। এ ছাড়া সামাজিক দুঃখ-সুখের ভাবনা তো তাঁর চিরসঙ্গী হিশেবে জন্ম থেকে লালিত হতে শুনেছি।

রামকিঙ্কর জীবনের শেষ চার-পাঁচ বছরে যেসব ছবি রচনা করেছেন তার সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। যে মহাশিল্পী জীবনের বেশ কিছুটা সময় চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যে ইজম্ বা মতবাদ নিয়ে কাজ করলেন, সেই শিল্পী অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি আঁচড় বা কয়েকটি রেখার ভাষায় কী বললেন, তা বিস্তৃতভাবে জানতে পারলে আমাদের মনের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হবে।

আলোচনার প্রথমে ধরা যাক অন্নপূর্ণা চিত্রমালার কথা। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে চিত্রমালার রচনার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। ভারতের আপামর জনসাধারণ চুলচেরা ধর্মীয় বিচার না জেনেও জানে যে অন্নপূর্ণা খাদ্যদ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কাজেই চিত্রমালার সব ছবিগুলিকে দৃষ্টিগোচরে নিয়ে এলেই সব চিন্তনের উত্তর এক লহমাতেই পেতে পারি। ছবির সফলতা এখানেই বলে মনে করি।

এবার ছবিগুলি রচনা করার সময় ও পরিবেশের দিকে তাকানো যাক। নবান্নউৎসব রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ লৌকিক উৎসব। বিশেষ করে বীরভূম অঞ্চলে। এই উৎসব পাঁজি-পুঁথির বিশেষ চিহ্নিত দিনে অনুষ্ঠিত না হয়ে অগ্রহায়ণ মাসের যে কোনো শুভ দিনে

বলাৎকার

অনুষ্ঠিত হতে পারে। ছবিগুলি আঁকার পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের অন্য কিছু রাজ্যেও যখন খরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল ঠিক তখনই রাজনৈতিক ঝড়, জরুরি অবস্থা সারা ভারত জুড়ে বয়ে গিয়েছিল। খরার দাপটের ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ সাময়িকভাবে খাবারের জন্য হাহাকার করে বেরিয়েছিল দুয়ারে দুয়ারে। রামকিঙ্কর ছবিগুলি রচনা করার আগে হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি "অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে এ বড় মায়ার পরমাদ।" মনে-পোষিত এমনি এক অবস্থায় অন্নপূর্ণা পূজার দিনে শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে জনৈক চাষী ভক্তের (মানুষ হিশাবে রামকিঙ্করের ভক্ত) বাড়ি গিয়েছিলেন। সঙ্গী হিশাবে আমিও ছিলাম। প্রথমে পূজা মণ্ডপে গিয়েই দেখলেন, কতকগুলো অর্ধ-উলঙ্গ আর উলঙ্গ ছেলে ভাঙাচোরা অ্যালুমিনিয়মের থালা বাটি হাতে আনন্দে লম্ফঝম্প করেছে সম্ভবত প্রসাদের আশায়। স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "চল, ওই পুকুর পাড়টায় গিয়ে বসি।" একটা সিগারেট মুখে ধরিয়ে অনেকক্ষণ কী জানি ভাবলেন, তারপর নিত্যসঙ্গী সাইডব্যাগের ভিতর থেকে পেনসিল, স্কেচ পেন, কিছু শুকনো জমানো জলরঙের টুকরো বের করলেন ও ফেল্টপেন দিয়ে ড্রইংটা সেরে এক-আধ জায়গায় প্রয়োজনমতো জল রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে ছবির বাহার খুলিয়ে দিতে লাগলেন। পূর্ববর্তী সব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দিষ্ট দিনটি এই ধরনের ছবি আঁকতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এবার ছবিগুলির ভাবগত, আঙ্গিকগত ও বিষয়গত দিকে একটু গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাক। অন্নপূর্ণা চিত্রমালার সৃষ্ট ছবিগুলির বিষয়বস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাব যে, পথে-পড়া-থাকা অনাহারক্লিষ্ট উত্তোলিত ক্ষীণ হাতে মুমূর্ষু পিতার 'অন্ন দাও' 'অন্ন দাও' আবেদনে সাড়া দিয়ে মুকুট-পরিহিতা দেবীসদৃশ নারী দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজের খাদ্যভাণ্ড থেকে খাদ্য বিতরণে উদ্যত, পশ্চাৎপটে ধান-ঝাড়াইয়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। রামকিঙ্কর এই সব শয়িত মৃতপ্রায় ক্ষুধিত মানুষের মধ্যে শিবত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। দেবীসদৃশ নারীকে কোনোক্রমেই দেবী বলব না এই কারণে যে, দেবীত্ব আরোপে ব্যবহৃত যে-সমস্ত চিহ্নাদি মূর্তিকারেরা ব্যবহার করেন সেই সব প্রতীক চিহ্ন এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় নি। যদিও ভারতীয় জৈন বা উড়িষ্যার চিত্ররীতির ন্যায় জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় নয়নকে পুরোপুরি দেখানো হয়েছে, কিন্তু অন্নপূর্ণার সামনাসামনি অবয়বে হাস্যময় মুখমণ্ডল পাশ (প্রোফাইল) থেকে দেখানো হয়েছে। ছবিগুলির কাঠামোগত দিক দেখতে গেলেই ভারতীয় ক্লাসিক ভাস্কর্যের ইমারতি গুণ সহজে ধরা পড়ে। অন্নপূর্ণার নিম্নাঙ্গের আদল ও ভারতীয় যক্ষী মূর্তির আদলকে অতি সহজেই মনে করিয়ে দেয়। সব কিছু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পুরোপুরি দেবীচরিত্র প্রতিফলিত না হয়ে বরং কোনো বিশেষ নারীর বিশেষ সময়কার বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকবর্গ হয়তো স্মরণ করতে পারেন যে, ওই সময়ের ভারতের আর এক চিত্রশিল্পী—মকবুল ফিদা হুসেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আদর্শ করে একটি চিত্রমালা রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এবং আমারও দৃঢ় ধারণা (পাঠকবর্গ একমত নাও হতে পারেন) যে, রামকিঙ্করও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন প্রশাসনিক ভাবমূর্তির উপর দেবীত্ব আরোপ করে একটা আদর্শ ভারতীয় নারীর রূপ তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে, হুসেন সাহেবের মতো এত চটকদার এবং সস্তা বাস্তবের কাছাকাছি তিনি যান নি। রামকিঙ্কর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে আদর্শ করেছেন তার প্রমাণ দেখতে পাই পাশ (প্রোফাইল) থেকে আঁকা মুখমণ্ডলের নাকের গঠন ও হাসির বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। ইন্দিরা গান্ধীর সামগ্রিক মুখমণ্ডলের রূপ-রেখা রামকিঙ্করের অবচেতন মনে এমনভাবে কাজ করেছে যে তিনি কোনোক্রমেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করে নিজের মতো করে উত্তরণ ঘটাতে পারেন নি। এই না-পারা প্রচেষ্টার গন্ধ পেয়েই রামকিঙ্করকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনিও কি হুসেন সাহেবের মতো এই চিত্রমালা রচনার মধ্যে সে-রকম কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন বা রাজশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন?" প্রশ্নটা নিশ্চয়ই সুখকর ছিল না স্বাধীনচেতা রামকিঙ্করের পক্ষে। তাই তান্ত্রিক সাধকের মতো ঈষৎ লালচে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে রাগত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "নাঃ, বাহবা পাবার তোয়াক্কা করি না। তবে সনাতনী মতে ভারতীয় নারীকে শক্তিরূপে দ্যাখে, পুজো করে, তাই শক্তি ও করুণা প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে নারীকে অন্নপূর্ণার প্রতীকরূপে প্রকাশ করেছি বলতে পারো।"

অন্নপূর্ণা চিত্রমালা রচনাকালে রামকিঙ্করের মধ্যে দুটি পৃথক সত্তার মিলনের চরম প্রকাশ হতে দেখেছি। প্রথমটি সৌন্দর্যসাধক, জ্ঞান-তপস্বী নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো এবং দ্বিতীয়টি লৌকিক সত্তার সঙ্গে নিজেকে সঁপে দিয়ে শিশুর মতো আত্মভোলা হয়ে যাওয়া।

আর একটি ছবিতে ব্যথিত রামকিঙ্করকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ও চাকায় পেষিত গর্ভবতী মৃত এক গাইগরুর মৃত্যু ছবির বিষয়বস্তু। কালো পিচ রাস্তার উপরে রক্তে রাঙা টায়ারের ছাপ ও মৃত গাইগরুর ভাবলেশহীন চোখ এবং ছাতির সামান্য অংশ ছাড়া পায়ের নিম্নাংশগুলি দেখিয়েছেন। মৃত গাইগরুর গর্ভাকৃতিটি অনেকগুলি রেখা টেনে ভূমগুলের সাদৃশ্যে এঁকেছেন। কিছু দূরে রাখাল ছেলেটি হাঁটুতে মাথা রেখে কান্নায় আকুল। ছবিখানিকে দীর্ঘ সময় ধরে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখেও অন্তরে

মুরগী ঠ্যাং চিবানো

নানানভাবে ব্যাখ্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর শিল্পীর নিজস্ব মতা-মত কী, তা জানবার প্রবল আগ্রহ চেপে রাখতে না-পেরে রামকিঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলাম—"কিঙ্করদা, গরুর গর্ভের অংশের ড্রইংটা ভূমণ্ডলের ড্রইং-এর মতো রেখা দিয়ে আঁকলেন কেন ?" স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে জবাব দিয়ে বললেন, "কী বল্‌লে ! পেট বা গর্ভকে ভূমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না । আমাদের শাস্ত্রে আছে অম্বুবাচীর দিনে নাকি মাটি (অন্য অর্থে মানটি) রজঃস্বলা হয় তা কি তুমি জানো ? গভীরভাবে ভেবে দ্যাখো, পৃথিবী যেমন আমাদেরকে ধরে রাখে তেমনি গর্ভও আমাদের সৃষ্টির পরিপূর্ণতা দান করে বাঁচিয়ে রেখেছে । এটা কোনো অহেতুকী ব্যাপার নয় । তাই আমি গর্ভকে পৃথিবী ভেবেছি, তার মতো করে এঁকেছি । বেশ করেছি । তুমি যা ভাবার ভাবো, তাতে আমার কী আসে যায় ।" বিস্মিত সাধকের মতো তিনি কথাগুলি বলেছিলেন, এমন মনে হয়েছিল ।

একটি দুর্ঘটনার বিষয় নিয়ে এতখানি তিনি ভেবেছেন ! রসিকজন রামকিঙ্করের জবানিতে মূল ভাবনা জানতে পেরে তাঁর অন্তরবেদনার ব্যাপ্তিটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন ।

ছবিটি মূলত কালো-শাদা আঙ্গিকে আঁকা, যদিও রঙের ব্যবহার মাঝেমধ্যে বিশেষ ক্ষেত্র বোঝানোর জন্য করা হয়েছে । যেমন, রক্ত বোঝানোর জন্য লাল রং এবং মাঠের সবুজ ঘাসের ক্ষেত্রে হাল্কা সবুজ রং ব্যবহার করেছেন । ছবিটির রূপবিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে দুর্ঘটনার দৃশ্যের হুবহু ভয়ঙ্কর ছাপ এক নিমেষে মূর্ত [illegible] না, আবার বিমূর্ততার ছাঁচে-ফেলারও কোনো কষ্টকর প্রয়াস চোখে ধরা পড়ে না । এক কথায় ছবিটিকে অভিব্যক্তিধর্মী Expressionism ছবির সার্থক নমুনা ধরতে পারি । রামকিঙ্কর জীবনের মধ্যভাগে কিছু সময়ের জন্য অভিব্যক্তিমূলক আঙ্গিক নিয়ে যে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের শেষ অধ্যায়ে আঁকা এই জাতীয় ছবি তাঁর পূর্বরচিত শিল্পকর্ম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অতীব সহায়ক ।

অবলা পশু নিয়ে আঁকা অন্য আর একটি ছবির কথায় যদি আসি তাহলে যন্ত্রণাকাতর পশুর সমব্যথী রামকিঙ্করকে দেখব । ছবির বিষয় বস্তুতে দেখানো হয়েছে জল-কাদায় আটকে-পড়া একটা ছইওয়ালা গাড়িকে জল-কাদা থেকে শুকনো রাস্তায় টেনে তোলার জন্য শীর্ণ বলদ যুগলের আপ্রাণ প্রয়াস । ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'বৈরাগীতলার পথে' । বৈরাগীতলার মেলার যাত্রী হিশেবে এবং দীর্ঘদিনের পরিচারিকা রাধারানী আরোহিণীরূপে ছিলেন । ছবিতে রাধারানীরূপী এক মহিলার কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায় । বলদ যুগলের শারীরিক জোরের শেষ বিন্দুটুকু দিয়েও গাড়ি না ওঠার দরুন গাড়োয়ানের বেদম প্রহার রামকিঙ্করকে খুবই বিচলিত করেছিল । তিনি ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নিত্যসঙ্গী কাঁধের ব্যাগ থেকে খাতা পেনসিল বের করে একটার পর একটা সেই বেদনাহত দৃশ্যের রেখাচিত্র এঁকেছিলেন । শেষ বয়সে আঁকা হেতু রেখাগুলি কিছুটা দুর্বল, কিন্তু রেখার গতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রামকিঙ্করের সুষ্ঠু ও উজ্জ্বল প্রকাশ হতে দেখি । বলদ দুটির মুখতোলা আকৃতি, অব্যক্ত যন্ত্রণা, জলকাদার গন্ধ সবই যেন রেখার সাবলীল গতিতে ফুটে উঠেছে রামকিঙ্করের মনের চিরন্তন স্বভাব অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে জল রঙের মাধ্যমে বা লিথোগ্রাফ মাধ্যমে এই একই

বিষয়বস্তু নিয়ে বহু ছবি আঁকলেও কোনো ছবি অভিব্যক্তিহীন, স্থির, আকৃতিসর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। আমরা দেখতে পাই প্রতিটি ছবিতে গরুজোড়ার অসহ্য ক্লেশের সঙ্গে রামকিঙ্করের সমবেদনা যেন ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে।

পৌষমেলা চিত্রমালার ছবি দিয়ে আলোচনা শেষ করব। যে পৌষমেলাকে ১৯২৫ সাল থেকে রামকিঙ্কর দেখে আসছেন, মেলার ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের যোগ নিবিড় করেছিলেন সেই পৌষমেলাকে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এক কথায়, স্মৃতিপটে ভাসমান রূপের বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। যাঁরা এই প্রজন্মের মানুষ তাঁরা এই চিত্রমালার মধ্য দিয়ে খুঁজে পাবেন অতীতে হারিয়ে যাওয়া পৌষমেলার আসল চেহারা। রামকিঙ্কর তাঁর স্মৃতির মহাসমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে দক্ষ ডুবুরির মতো এক-একটি মুক্তা যেন কুড়িয়ে এনেছেন। প্রতিটি ছবির মধ্যে রসিকজন পুরানো মেলার আমেজ খুঁজে পাবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নহবৎখানার সেই সুরেলা সানাইয়ের শব্দ, মেলায় সাঁওতাল রমণীদের হাঁড়ি-কলসি কেনার সময় খিলখিল মিষ্টি হাসির উচ্চকিত শব্দ। বেলোয়ারি চুড়ি পরিয়ে দেবার দৃশ্য, রয়েল ড্রেস পরিহিত যাত্রাভিনয়ের নায়ক, ভিড়ের মাঝে হতচকিত কুকুরের ভয়ার্ত করুণ চাউনি—এসবই মেলা সাজাবার মতোই আমাদের সামনে থরে থরে সাজিয়েছেন। আবার রেস্তোঁরার ফুলদানি দিয়ে সাজানো টেবিলে বসে অভিজাত মহিলার মুরগার (তাঁর ভাষায়) ঠ্যাং চিবানোর দৃশ্য এঁকে অন্য এক মূল্যবোধ আনতে চেয়েছেন, যা মেলার মূল আদর্শের পরিপন্থী। এই মেলায় যে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্যের বিধি এবং সে আদর্শ থেকে আমরা ক্রমেই বিচ্যুত হচ্ছি এই ছবিটি তার এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকে।

অন্য একটি ছবির ভিতর দিয়ে অতীতের কোনো এক পৌষমেলায় হঠাৎ ঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বলাৎকারের বিষয়বস্তু ছবিটিতে নিবদ্ধ। ক্রন্দনরতা উলঙ্গ এক মহিলা আঙুল নির্দেশ করে পলায়মান লোকটিকে দেখাতে ব্যস্ত। উদ্ধারকারী কয়েকজন মহিলা সমবেত। হ্যারিকেনের সামান্য উদ্ভাসিত আলোকে ইটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দৃশ্য দেখতে পাই তাতে আমাদের মতো তথাকথিত সভ্য সমাজের লজ্জা প্যাওয়া উচিত।

মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এই দৃশ্য কি স্বচেক্ষ দেখেছিলেন?" অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিয়েছিলেন, "না। রাধারানী (রামকিঙ্করের দীর্ঘদিনের পরিচারিকা) ও আরও দু-একজন মেয়েটির চীৎকার শুনে গিয়েছিল রক্ষা করতে। ও ফিরে এসে ঘটনাটা আমাকে বলেছিল। কুমারী মেয়েটির জন্য দুঃখ হয় বুঝলে।" এখানেও রামকিঙ্করকে সামাজিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হিশেবে পাই।

অন্নপূর্ণা

ছবির দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে গেলে ছবিটিকে ভাস্কর্যধর্মী বলা যায়। ছবিটির মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের **ইমারতি** গুণ, কাঠামো ও আয়তন রূপায়িত অবয়বগুলির মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। পৌষমেলা চিত্রমালার সব ছবিগুলি মূলত রেখাভিত্তিক; যে রেখা শুধুমাত্র কারিগরের রেখা নয়। এই রেখাপ্রবাহের মধ্যে তাঁর অনুভূতির ছন্দ ধরতে পারি। ছবিগুলির মধ্যে প্রয়োজনবোধে খুব সীমিতভাবে রং ব্যবহার করেছেন। অনেকের মতে এই আলোচনায় বর্ণিত ছবিগুলি এমন কিছু অসাধারণ নাও হতে পারে, কিন্তু আমার মতে এই সৃষ্টিগুলি রামকিঙ্করের জীবনব্যাপী সাধিত শিল্পের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

রামকিঙ্করের শেষবয়সে আঁকা ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির আংশিক তুলনা করা যেতে পারে, বিশেষ করে তার ভাবগত দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী নানান শব্দের মালা গেঁথে বিচিত্র অনুভূতি দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেও না-বলা ভাষা যা কিছু রয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে ষাটবছর বয়সের উপান্তে পৌঁছে গিয়েও বিস্মৃত হন নি, নানান রঙে নানান ছন্দে রূপবদ্ধ করে প্রত্যেয়ের সঙ্গে প্রকাশের প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসকে নিছক চমক সৃষ্টিকারী প্রয়াস বা খামখেয়ালিপনায় লালিত, কোনোটাই বলা যায় না। তেমনি আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি যে, রামকিঙ্কর তাঁর দীর্ঘ শিল্পীজীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুবিধ আঙ্গিকে চিত্ররচনার ভাষা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও হয়তো সব কথা বলতে পারেন নি। তাই এই সব চিত্রমালার মধ্য দিয়ে বহু সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই রচনাগুলি নিছক শিশুসুলভ বা ইজমবহির্ভূত রচনা নয়, বরং এই রচনাগুলি পূর্ববর্তী রচনাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সেতুবন্ধ হিশেবে কাজ করবে। সব রকম ইজমের কূট জাল ছিন্ন করে রেখাপ্রধান ছবিগুলি যদি অগণিত রসিকজনকে অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দ দেয় তাহলেই হয়ত রামকিঙ্করের অন্তিম রচনাগুলির সার্থক উত্তরণ ঘটবে।

কী পড়ি/গোপাল হালদার

জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'আমি এখন কী পড়ি ?' জিজ্ঞাসা করা উচিত হত, 'এখনো পড়েন নাকি ? কেন পড়েন ?' কারণ, বয়স যাঁর চুরাশি উত্তীর্ণ তার পক্ষে পড়া তো সুসাধ্য কাজ নয়। আর যদিও বা অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্য নিশ্চয়। তা হলে—কী পড়ি ? আর, পড়ি কেন—পরকালের পাথেয় হিশাবে ? ইহকালের কোন কাজে লাগবে সে পড়া—যদি যা পড়ি—পড়ে তার মর্মগ্রহণ করতে পারি।

না, জিজ্ঞাসাটা অন্যের শুধু নয় জিজ্ঞাসাটা আমারও—নিজেকে। বয়সের নিয়মে পঞ্চেন্দ্রিয় ক্ষয়িত হয়ে 'জড়ত্বের' এলাকায় পৌছেছি নিশ্চয়—'অচল, অধম',—কিন্তু জিহ্বা বোধহয় একদিকে হার মানে নি—রসনা রসগ্রহণে উদাসীন নয়—দন্ত অবস। পরের স্থাপিত দন্ত এখন আমার শাসন মানে না, চর্ব্যাস্বাদন দুর্ধর্ষ। কিন্তু চোষ্য-থেকে-পেয় পর্যন্ত আহার্যগুলো এখনো যথাসম্ভব আদৃত। আর, অন্যদের সাধ্য, কর্ণেন্দ্রিয় বরাবরই গানের ব্যাপারে অসহায়। তবে ধ্বনির অন্যান্য বিভাগে ছিল উৎকর্ষ, এখনো তাতে নিরুদ্যম নয়। যাই হোক, কোন যাদুতে জানি না, চক্ষুটা এ দেহের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে ছিল স্বাভাবিক। বয়সের অত্যাচারে তাদেরও এখন স্বভাব দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে ; এমনকী সময়ে সময়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে। স্বদেশী ছাপাখানার অক্ষর হয় দুর্লক্ষণীয় বা সাম্প্রতিক ছাপার রঙবিলাসে চক্ষু হয় বিভ্রান্ত। তবু মানবো সাধারণ ভাবে পড়ার মতো দৃষ্টি আছে। আর তা যখন আছে তখন শুধু ঘরবন্দী জড়তায় সীমাবদ্ধ আকাশ মৃত্তিকার প্রাকৃতিক দান কিছু-না-কিছু দেখতে পাই, আর তার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে চাই। এবং লাভ করি, মুদ্রাযন্ত্রের বিস্তীর্ণ বদান্যতার ছিটে ফোঁটা। 'বিপুলা সে মুদ্রাযন্ত্রের জগতের কতটুকু জানি ?' এখনো পাই কতটুকু স্বাদ-গন্ধ ? এক আধটুকু না পেলে জরার বন্ধনে তো এখন মরার সামিল হতাম।

সত্যই পড়তে না পারলে মরতে বাধা ছিল না।

কিন্তু পড়ি কী ? খুব অল্প কথায় বলি—কারণ 'কী পড়ি' বলতে গেলে নিজেই কি বিশেষ মনে করতে পারব ?—যা পড়ি তার বুঝি কতটা ?

কিছুই কি মনে রাখতে পারি ? আমার বিস্মৃতির বিপুল পুলিশবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে মনে কী জমা হতে পায় ? যা তবু মনে
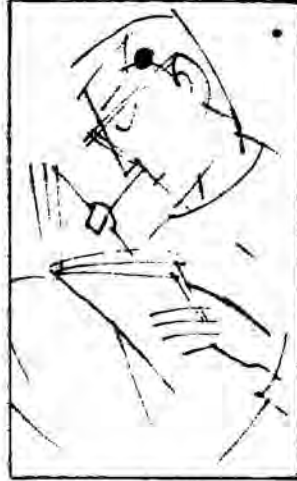
পড়ে তার দু এক টুকরো খুঁজে পেতে দেখতে পারি।

প্রথম পড়ি সংবাদপত্র, যা প্রায়শ অপাঠ্য-দু-এক সময় ছাপার গুণে এবং অনেক সময় সংবাদের অসারতায়, দুষ্পাঠ্য। তবু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। যেমন আজীবন চিরদিনই আমাকে সাময়িক পত্রের পাতায় লিপি-কণ্ডূয়ন করতে হয়েছে, তেমনি আমরণ বোধহয় সংবাদপত্রের পদসেবা বা পাঠ-সেবা করতে হবে। প্রভাতে বয়সোচিত বায়ুসেবন বিধেয় হলেও সংবাদ সেবন ও চা-পান আমার না করলেই নয়। আর, প্রতিদিনই ভাবি—তা না পড়লেও এ বয়সে আমার ক্ষতি হত না, পৃথিবীরও কোনো লোকসান হত না—এমনকী সংবাদপত্রের মালিকদেরও না। সাময়িকপত্র দুপুরের জন্য থাকে, নিয়ে পড়ি। ঘুমের ওষুধ সংবাদপত্রের পালা সাঙ্গ হলে দু-একটি বই নিয়ে নাড়াচাড়া করি—তাকে অনেক সময়ে পড়া বলা চলে না। সময় কাটে ; ভালোও লাগে—বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে আড্ডা দেবার মতো লোক বন্ধু পাই না। বইছাড়া বৃদ্ধদের বন্ধু আর কে—যদি চোখ নির্দয় না হয়। কী বই পড়ি ? এক সময়ে দুর্বায়ু ছিল প্রায়ই যে বই পাই তা পড়তাম। 'সব-বিষয়ের কিছু জানা, এক-আধ বিষয়ের সব জানা', শিক্ষার এরূপ সংজ্ঞা শুনেছিলাম। তাই তখনকার সব বিষয়ে জানতেও ছিল দুশ্চেষ্টা, যে দিকে রুচিও বোধ হয় ছিল—বাড়ির গুণে। কিন্তু শিক্ষার অপরার্ধ আর হয়ে উঠল না—বিশেষজ্ঞ হওয়া বিশেষ বিষয়ে। দু'য়ে মিলিয়ে যা হল তা হচ্ছে—কোনো বিষয় জানি না—সব বিষয়ে সব-জান্তা, যাকে বলা যায় জার্নালিস্ট—সব-বিষয়ে দেখা কোনো বিষয় না জেনে। সে অভ্যাসে পড়ারও রুচি নানা বিষয়ে। তবে ক্রমেই দেখেছি—বিষয় সমুদ্রবৎ অপার ও অগাধ। আর এখন সে সমুদ্রও দৃষ্টির অগোচর—বই পাই না—পাঠাগার, গ্রন্থাগারে যেতে পাই না। যা হাতে আসে তাই পড়ি—যদি মন চায় একটু বাছাই করে।

একটা কথা বলতেই হবে। বাঙালি গ্রহের গুণে যতটা ইংরাজি পড়তে বাধ্য হয়েছি ততটা বাঙলা পড়তে হয় নি। আর মানতেই হবে, ইংরেজিতে পড়ার মতো জিনিশ যত জোটে, বাঙলায় তা কখনো জুটত না—এখনো না। তবে এক পাতা বাঙলা পড়তে যা সময় লাগত, একপাতা ইংরেজি পড়তে লাগত তার ডবল সময়। এখনো তাই। আর, এখন ইংরেজি বই দুর্ঘট, এবং দুর্মূল্য ; আর, বাঙলা বই ততটা দুমূর্ল্য নয়, ততটা এখন দুর্ঘট নয়, তবে তার চেয়ে বেশি দুষ্পাচ্য। তবু বাঙলা বই-ই পড়ি।

কী পড়ি ? এখন ? কী পড়ছি বলি : 'পরশুরামে'র গল্প, রাজশেখর বসুর ছোট ছোট প্রবন্ধাবলীও। গল্পগুলি তো জানা। অনেকবার পড়া, তবু সব মনে নেই। অবশ্য অন্য গল্প তবু কি মনে আছে। তাতে আমার আকর্ষণ কমে নি। মনে থাকা কেন ? কতবার তো কথায় কথায় বলি, আর শুনি—'অয় Zানতি পার না', 'লালিমা পাল (পুং)। বিরিঞ্চিবাবার 'একটু একটু অয়েল করবেন বাবা।' পষ্ট দেখলাম বাদীপাতার গামছা স্কার্ট, স্কার্ট—"ঠোটের সিন্দুর অক্ষয় হোক'। 'আই কেদার চাটুজ্জে—তো জুলজিকাল গার্ডেন ইত্যাদি'। যতীন সেনের সে ছবিগুলি নেই—তবু স্মৃতি তাকে ভুলতে দেয় নি—'লজ্জায় জিব কাটিল', 'সব বন্ধকী তমসুক বাবা'—আঃ সে ছবি কি ভুলব ! অবশ্য ছবি তো আর বই নয়। কিন্তু পরশুরামের গল্প এখনো ছবি ছাড়াই ছবি। পরশুরামের চোখের মধ্য দিয়ে আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাই কি ?- আমাদের কি মনে বিঁধেছিল সেই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের হাসি ? বোধ হয় না। কিন্তু ঝাঁঝ ছিল না যে তার তিরস্কারে। কদাচিৎ একটু বিষণ্ণ বেদনাও ছিল। তার চেয়ে বেশি ছিল সহৃদয়তা আর সর্বত্র একটু যুক্তি, বিচার বুদ্ধির প্রত্যাশা—প্রাঞ্জল বাক্য। হ্যাঁ, সৈয়দ মুজতবা আলী কোথাও কোথাও ভাষা শৈলীতে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অনবদ্য তখন তিনি। কিন্তু পরশুরামের লেখারও তুলনা নেই—পরিচ্ছন্নতা, প্রসাদগুণ অসাধারণ গুণ। মাঝে মাঝে এখনো (কালীপ্রসন্ন সিংহের) মহাভারতের পাতা ওলটাই আর রাজশেখরী মহাভারতসারের, কিন্তু মহাভারতের, রামায়ণের শুষে নেওয়া পরশুরামী গল্প যেন আরও আশ্চর্য।

কিন্তু আরও দু একখানা বইও পড়ি, হ্যাঁ পেলে এক-আধখানা আধুনিকও। সমরেশকে কখনো বলি, 'নে নে তোর ওই কালকূটী কূটবুদ্ধি ছাড়। তবে লেখ, হ্যাঁ, একটু বরং কমই লেখ। কিন্তু লেখ।' হ্যাঁ, ঢাউসে এখন ভয় ধরে। আয়ু কম—পেরে উঠব না তাদের সঙ্গে তাল রেখে বেঁচে থাকতে—তাই যদি পারতাম, তবে তো ওই শেক্সপীয়র—কিন্তু ইংরেজি—তবু শেলফে সব সময় থাকে না। হাতেও আসে। যেমন হাত ছাড়ে না অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে—পদ্য বা গদ্য—কানে বাজবে 'আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ।'

The Radial that's just right

APOLLO
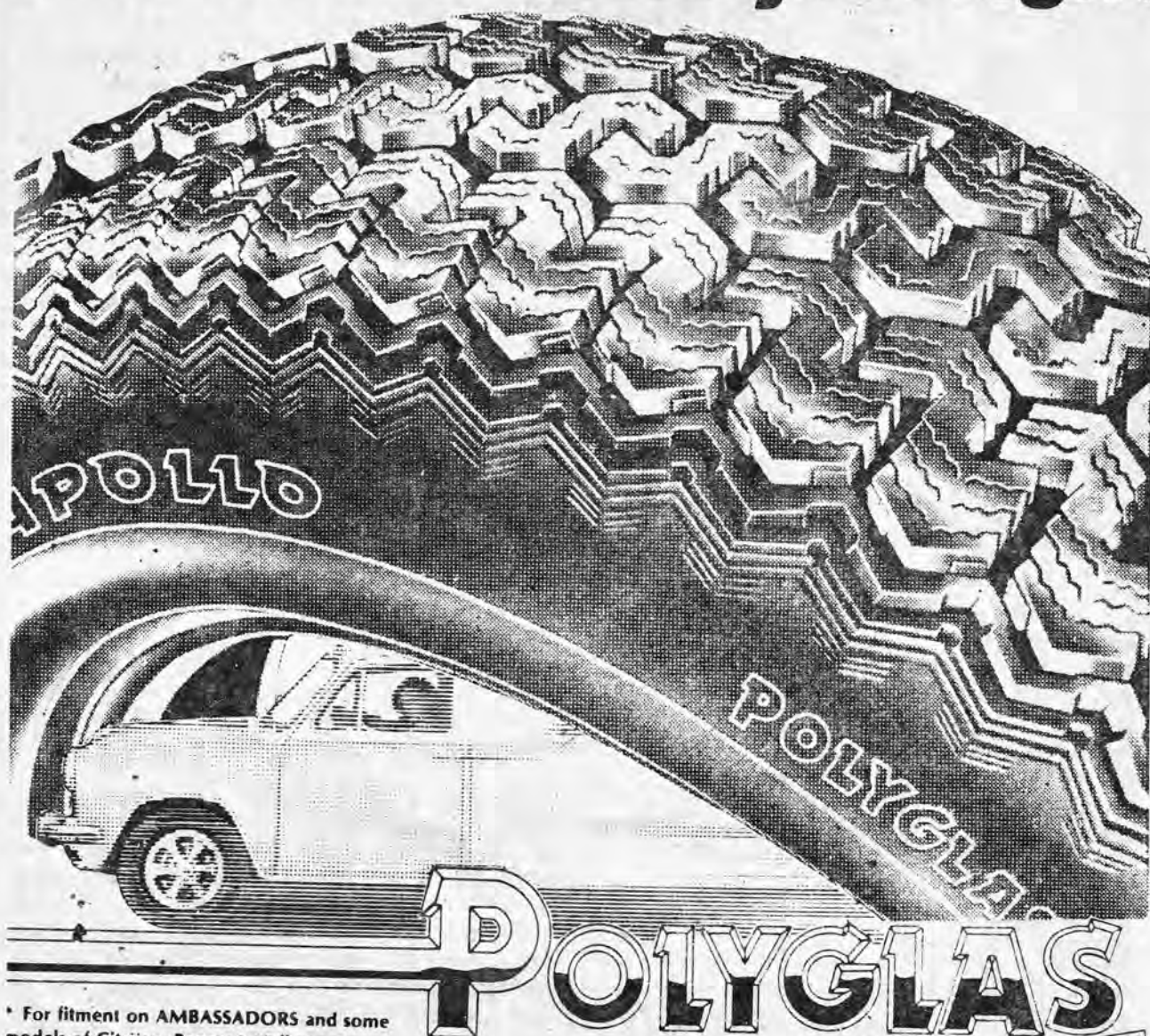
POLYGLAS

POLYGLAS

* For fitment on AMBASSADORS and some models of Citröen, Peugeot, Volkswagen, Porsche and Volvo.

Radial

Right for Indian Roads! Right for Indian Cars!

The Right Radial

* Doubles your mileage.
* Safeguards your suspension.
* Cuts fuel costs.
* Gives you a cushioned ride.
* Designed for safety — no aqua-planing.
* Re; eated retreadability.
* Protects against punctures.

HEADSTART/AT/9337

সৌরশক্তি কি বিকল্প শক্তি হতে পারে ?

বহু সংকটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেখা দিচ্ছে শক্তির সংকট। আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে আসছে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস। উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকার জলশোষণের মতনই শুষে নিচ্ছে সঞ্চিত তেলের ভাণ্ডার। তবে কি আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যাবে কলকারখানার উৎপাদন ? জ্বালানির অভাবে থেমে যাবে গাড়ির চাকা ? মাটির নীচের জলের অভাবে মারা যাবে সবুজ ফসল ? বিকল্প শক্তি হিশাবে সৌরশক্তি কতখানি পরিপূরক হবে—এর উত্তর খুঁজতে এই লেখক গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কালটিভেশন অব সায়েন্সের সৌর বিজ্ঞানীদের কাছে।

আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হল সহজলভ্য বর্তমান শক্তির উৎস কয়লা, তেল ও গ্যাস। বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা গত ৩৫ বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মাথা পিছু শক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে অনুন্নত দেশগুলিও ক্রমশ শিল্পোন্নতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে ফলে শক্তির মজুত ভাণ্ডারে ক্রমশ টান পড়ছে।

পৃথিবীর এই মজুত ভান্ডার কত—সে প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা মাটির নীচে ৩০ সেমি থেকে ১৮০০ মিটার গভীরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। নিম্নমানের কয়লাও আছে যা কাজে লাগানও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। তাছাড়া অজানা খনির সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে—তার পরিমাণও কম নয়। ১৯৫৯ খ্রি পল এভারিট পৃথিবীর জানা অজানা সবরকমের উৎসের মোট কয়লার একটা পরিমাণ হিশেব করেছিলেন তা হল—১৫.২৬৪ বিলিয়ন টন। কিন্তু এই পরিমাণ কয়লা থেকে ব্যবহারযোগ্য কয়লা কতটা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত। তবে সর্বসম্মত সংখ্যা হল এই পরিমাণের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৭৬০০ বিলিয়ন টন।

গ্যাসের সঞ্চিত ভান্ডার সম্পর্কে সঠিক হিশেব পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন দেশের হিশাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ৭২,৩৬০ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুত আছে। তেলের মজুতের উপর ভিত্তি করে হুবার্টের আনুমানিক হিশেব হল ২২৭ থেকে ৩৪০ হাজার বিলিয়ন টন। যে হারে পৃথিবীতে গ্যাস খরচ হচ্ছে তাতে গ্যাসের ভাণ্ডার ২৫০ বছর চলে যাবে। তবে শক্তির অনটনে গ্যাস যে বিকল্প ভূমিকা নিতে পারে সে আশা করা যায় না। সেরকম ভূমিকা নিতে পারত তেল, কিন্তু তেলের আয়ু যথেষ্ট সীমিত। টারস্যান্ড ও অয়েল শেল থেকে কিছু তেল পাওয়ার চেষ্টা চলছে। কানাডার অ্যালবার্টা ও ভেনিজুয়েলাতে তৈলাক্ত এক ধরনের বালি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়ানো রয়েছে। এই বালি থেকে তেল নিষ্কাশন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কানাডার দুটি কারখানায় এ বছর ১০ মিলিয়ন টন তেল টার স্যান্ড থেকে নিষ্কাশন করার পরিকল্পনা আছে।

অয়েল শেল হল জৈব পদার্থ কেরোজেনযুক্ত শিলা। ৩০০-৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কেরোজেন তেল ও গ্যাসে ভেঙে যায়। এই তেল পেট্রোলজাত তেলের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

তবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা শোধিত করে জ্বালানি হিশেবে ব্যবহার করা যায়। সতের শতকে ইতালীতে এই তেল দিয়ে রাস্তার আলো জ্বলত।

স্কটল্যান্ডে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বছরে প্রায় এক লক্ষ টন তেল অয়েল শেল থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এস্তোনিয়ায় বিদ্যুৎ শক্তির জন্য, লেনিনগ্রাদে গ্যাসের জন্য এই তেলের ব্যবহার হয়। চীন, আমেরিকায় পর্যাপ্ত অয়েল শেল আছে। আনুমানিক হিশাব থেকে এই পরিমাণ হয়ত পেট্রোল জাত তেলের পরিমাণ ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু অসুবিধা হল পাথর থেকে এই তেল নিষ্কাশন সহজ সাধ্য নয়। অদূর ভবিষ্যতে তাই অয়েল শেল থেকে সামান্য কিছু তেল হয়ত পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তা বিকল্প উৎস হয়ে উঠতে পারবে না।

কয়লার বিকল্প হিশাবে বিদ্যুৎ শক্তি অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়াল।

অশোককুমার বড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে সৌরশক্তি নিয়ে কাজ করছেন

১৮৮২ খৃস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি লন্ডনে প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্র চালু হয় এই বছর ৪, সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে। অন্যটিতে হাইড্রোজেন দিয়ে কোষের মধ্যে জল তৈরি হয় ও ইলেকট্রোড দুটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির বিদ্যুৎ উৎপাদন দক্ষতা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প কখনই নয়।

জলের প্রধান স্রোত বেঁধে তা থেকে জলবিদ্যুতের রূপান্তরের প্রাচীন পদ্ধতিটি আধুনিক যুগে আমাদের শক্তির একটি প্রধানতম উৎস। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হতে পারে তাই এর জনপ্রিয়তা সমধিক। কিন্তু ঋতুভেদে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। জলাধারে পলির আস্তরণ জমে যাওয়ায় নদীর বিভিন্ন পরিবর্তনের উপরও জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তা

পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্বের অনেকাংশেই সূর্যের প্রাপ্য। মানব সভ্যতা আজ পর্যন্ত শক্তির উৎস হিশাবে যা কিছু কাজে লাগিয়েছে তাদের উৎপত্তি মোটামুটিভাবে সূর্য থেকে। তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রে কয়লা বা তেল পোড়ে তখন প্রকৃতপক্ষে কার্বনের যৌগ হিশাবে সঞ্চিত সৌর শক্তিকেই মুক্ত করে।

সঞ্চিত সৌর শক্তিকেই মুক্ত করে।

কার্বন ডাই অক্সাইড ও বাতাসের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা সবুজ পাতার ওপর সূর্যের আলো পরলে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ও অক্সিজেনে ভেঙে যায়। অক্সিজেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে মুক্ত কার্বন গাছের দেহের মধ্যেই সঞ্চিত হয়ে যায়। আগুন জ্বললে এই কার্বনই আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। একটি গাছ বেড়ে ওঠার সময় সূর্যরশ্মি থেকে যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে গাছটি জ্বালালে আমরা কখনও তার চেয়ে বেশি শক্তি পেতে পারি না।

সৌর শক্তির প্রভাবেই নদী, সমুদ্র বা জলাশয়ের জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং পরে জল হয়ে তাদের উৎপত্তিস্থলে ফিরে আসে। বাতাসের যে শক্তি আমরা দেখতে পাই তাও সূর্যের সৃষ্টি। মজার ব্যাপার হল পৃথিবী মোট সৌরশক্তির সামান্য অংশই সংগ্রহ করে। বিকিরিত সৌরশক্তির বেশিরভাগই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবী যে পরিমাণ সৌরশক্তি সংগ্রহ করে তার পরিমাণ প্রায় প্রতি সেকেন্ডে $৩·৮ \times ১০^{৩}$ আরগ বা বছরে $১·২\ ১০^{৪০}$ আরগ। সূর্যের ক্ষেত্রফল মোটামুটিভাবে ৬১×১০^{২২} বর্গ সেমি ধরলে সূর্যের প্রাতবর্গ একক ক্ষেত্রে প্রতিসেকেন্ডে $৬·২ \times ১০^{১০}$ আরগ পরিমাণ শক্তি ছাড়ে।

সূর্য কেমন করে এই শক্তি সঞ্চয় করে

সৌরশক্তির উৎস সন্ধানে যিনি যাত্রা করেছিলেন তিনি হলেন জার্মান পদার্থবিদ হেলমোটজ। হেলমোটজের মতানুযায়ী সূর্য
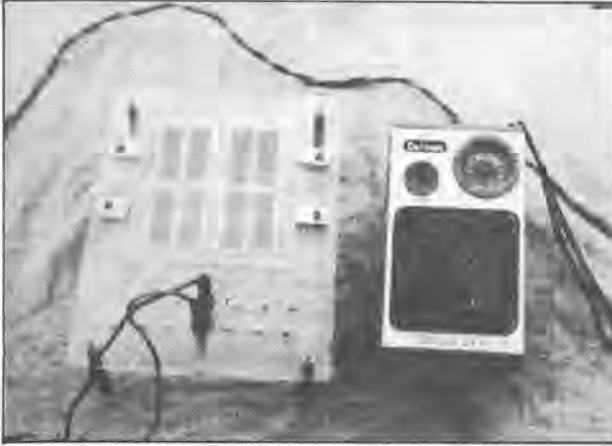
সৌরশক্তির সাহায্যে ট্রানজিস্টার বাজছে

সৌরশক্তির গবেষণাগার

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ পরিবহনের দক্ষতা যথাসম্ভব বাড়ানো গেলেও উৎপাদনের দক্ষতা সর্বোচ্চ শতকরা ৪০ ভাগেই সীমাবদ্ধ আছে।

বিদ্যুৎ তৈরির আর একটি বিকল্প পদ্ধতি হল জ্বালানিকোষ। ১৮৩৯ খ্রি ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম গ্রোভ এইরকম একটা কোষ তৈরি করেন। এই পদ্ধতিটি হল রাসায়নিক। বিদ্যুৎ দিয়ে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া হল জ্বালানিকোষ।

গ্রোভের পরিকল্পনায় এই কোষে থাকে দুটি প্লাতিনাম ইলেকট্রোড ও সালফিউরিক অ্যাসিড ইলেকট্রোলাইট। একটি ইলেকট্রোডে অক্সিজেন ও ছাড়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় অনেক বেশি তা অধিকাংশ দেশ বইতে পারে না। তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে বিদ্যুতের একটি প্রধান অংশ জলস্রোত থেকে উৎপন্ন হয়।

সৌরশক্তি অফুরন্ত

পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্বের অনেকাংশই সূর্যের প্রাপ্য। মানব সভ্যতা আজ পর্যন্ত শক্তির উৎস হিশাবে যা কিছু কাজে লাগিয়েছে তাদের উৎপত্তি মোটামুটিভাবে সূর্য থেকে। তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রে কয়লা বা তেল পোড়ে তখন প্রকৃতপক্ষে কার্বনের যৌগ হিশাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতি একবর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় লম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ সৌর শক্তি এসে পড়ে তা মোটামুটিভাবে ১,৩৫০,০০০ আরগ। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় যে পরিমাণ সৌরশক্তি শোষিত হয় তাকেও এই হিশেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই সৌরশক্তির জন্য যদি দাম দিতে হত তাহলে প্রতিদিন তার পরিমাণ খুব কম হত না। কাজের একক ব্যবহার করলে দেখা যায় যে প্রতি বর্গমাইলে আপাতত সৌরশক্তি ৪,৬৯০,০০০ অশ্বশক্তির সমান। পৃথিবীকে সূর্য প্রতিবছর যে পরিমাণ শক্তি দেয় তা কয়লা বা অন্যান্য জ্বালানি থেকে পাওয়া শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু শুরুতে শীতল গ্যাস ভর্তি একটি বিরাট গোলক ছিল এবং এই গোলকের ব্যাস বর্তমান সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এ ধরনের গ্যাসীয় গোলক কখনই স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না। এর কারণ হল বেশি হালকা গ্যাসে চাপের পরিমাণ খুবই সামান্য। এই সামান্য চাপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না। তাই আদিম সূর্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই দ্রুত সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছিল। এই সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের গ্যাসও ঘনীভূত হতে শুরু করল।

সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র বলে একটি সিলিন্ডারের মধ্যে রাখা গ্যাস একটি পিস্টনের সাহায্যে
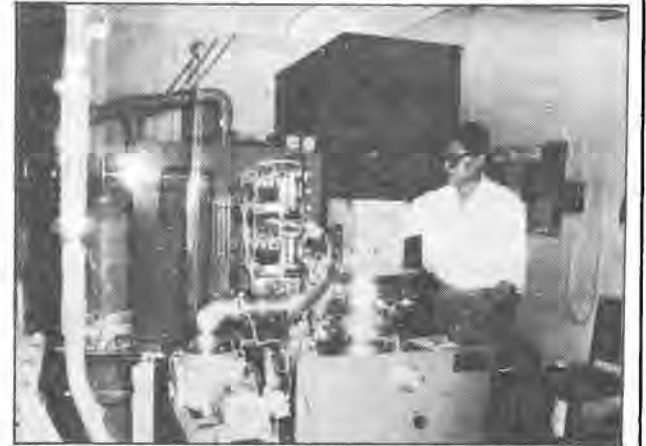
সঙ্কুচিত করলে গ্যাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই প্রারম্ভিক বিরাট গোলকটি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে ভেতরের পদার্থগুলির উষ্ণতা ও চাপ বাড়িয়ে দিল। ক্রমে এই চাপের পরিমাণ এত বাড়ল যে তার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে আটকানো সম্ভব হল।

এরকম একটা অবস্থায় এসে সূর্যের সঙ্কোচনের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল। যদি বাইরের ত্বক থেকে কোনোরকম শক্তি ক্ষয় না হয় তা হলে সূর্যের স্থিতাবস্থায় থাকা সম্ভব। কিন্তু সূর্যের নিকটবর্তী শীতল অঞ্চলে সূর্য থেকে বিকিরণ পৌঁছয়। যার ফলে গ্যাসীয় গোলক সবসময় কিছু শক্তি হারাতে থাকে। শক্তি ক্ষয়ের অর্থই তাপমাত্রা কমে যাওয়া। চাপ কমে যাওয়ার দরুন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্যাসীয় গোলক আবার সঙ্কুচিত হতে থাকবে। হেলমোটজের মতে সূর্যের একটি নিয়ত ক্রিয়াশীল সঙ্কোচন আছে আর বিকিরিত সৌরশক্তি কোনোরকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল নয়। সমস্ত শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির রূপান্তর মাত্র।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে নির্ণয় করা যায় যে, আমরা যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাই তা বহাল রাখতে প্রতি শতাব্দীতে সূর্যের ব্যাসার্ধ শতকরা ০.০০০৩ ভাগ বা দুই কিলোমিটার কমা উচিত। এই পরিবর্তন হয়ত একজন মানুষের জীবদশায় নজরেই আসবে না। শুধু তাই নয় সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেও এ ধরনের পরিবর্তন চোখে নাও পড়তে পারে। অসীম আয়তন থেকে সূর্যের বর্তমান ব্যাসার্ধে আসতে গিয়ে যে পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৌরশক্তি হিশাবে নির্গত হবার কথা তার পরিমাণ হল ২×১০^{৪৭} আরগ।

সুতরাং সম্ভবত হেলমোটজের প্রকল্প সৌর বিবর্তনের প্রারম্ভিক পর্যায়কে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে যে সূর্যের অন্তরে রাসায়নিক বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়াও আরও কোনো বিরাট শক্তি আত্মগোপন করে আছে।

সৌরশক্তির বেশ বড় অংশ সমুদ্রে পড়ে তার উপরের অংশ উত্তপ্ত করে। আবার সূর্য তাপে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে ঠাণ্ডা

পৃথিবীতে গ্যাসের যোগান অপ্রতুল

জলের স্রোত সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট তলদেশের তাপমাত্রা ৪০° ফারেনহাইট ও পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৮০° ফারেনহাইট থাকে।

ফরাসি সরকার এরকম একটা প্রকল্প ১৯৪৭ সালে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তা আংশিক সফল হলেও ব্যয় বাহুল্যের জন্য পরিত্যক্ত হয়। এখন সমুদ্রের এই তাপীয় শক্তি রূপান্তর করা নিয়ে পুনরায় গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। নতুন আঙ্গিকে অ্যান্ডারসনের পরিকল্পনা হল সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের তাপ ব্যবহার করে কোনো তরলপদার্থ ফুটিয়ে তার বাষ্পে টারবাইন চলবে ও টারবাইন জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। পরে সমুদ্রের কয়েকশ ফুট নীচের ঠাণ্ডা জলে এই ব্যবহৃত বাষ্প বাগুন সারের সাহায্যে ঘনীভূত করে তরলে পরিণত হবে। এই পরিকল্পনায় একটি ডুবো জাহাজের সঙ্গে যন্ত্রটি জুড়ে দেওয়া হবে ও জাহাজটি ডুবন্ত অবস্থায় পরিকল্পনা মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস হিশাবে সৌরশক্তির সম্ভাবনা বিপুল এবং তা অফুরন্ত পাওয়া যাবে। তাই সৌরশক্তির গবেষণার অগ্রাধিকার সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

বায়ুমণ্ডলের চলাচলে বায়ুপ্রবাহ ও সৌরশক্তির উপজাত প্রাচীনযুগ থেকে বায়ুকলের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ শক্তির উৎসহিশাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোনো সময়ে বায়ু প্রবাহের গতির শক্তি তার গতির ঘনমানের অনুপাতী অর্থাৎ বায়ুর গতি দ্বিগুণ হলে শক্তি উৎপাদন যন্ত্রে শক্তির মান আট গুণ বাড়ে, পাখাযুক্ত বায়ুকলে বা বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে এই নিয়ম খাটে। ঘণ্টায় ১৫ মাইল বায়ুর বেগ হলে যে যন্ত্রে ১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ৩০ মাইল বেগে সেই যন্ত্রে আট কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

সৌরকোষ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেড়েছে এবং এর সাহায্যে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করে শক্তি সমস্যার কিছুটা সুরাহা করা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। তবে সেই সৌর কোষের অসুবিধা হল, এর কর্মদক্ষতা অত্যন্ত কম। ১০/১৫ ভাগের মতো। সমস্যার ব্যাপার এই যে বিজ্ঞানীদের এক হিশাব অনুযায়ী এই দক্ষতা কখনই সিলিকন থেকে তৈরি সৌরকোষের ক্ষেত্রে শতকরা বাইশ ভাগের বেশি হতে পারে না। এখন এক ওয়াট বিদ্যুৎ ক্ষমতা সৌরকোষের সাহায্যে তৈরি করতে বিদেশে খরচা পড়ছে প্রায় ১৩ ডলারের মতো। আমাদের দেশে খরচ পরে কয়েকশ টাকার মতো।

তেলের ওপর নির্ভর করার জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। এখন তেলের বদলে অন্য শক্তির উৎসের কথা পৃথিবীর সবদেশকেই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সৌরশক্তি এইরকমই একটি বিকল্প উৎস সৌরশক্তির প্রাচুর্য যাদের নেই সেসব দেশও আজ সৌরশক্তির গবেষণায় নজর দিয়েছেন। অনেকে এ বিষয়ে সহযোগিতাও করতে চাইছেন আমাদের দেশের সঙ্গে। কেননা সৌরশক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে স্বভাবতই আমাদের দেশ খুবই উপযুক্ত। আমাদের কেবল লক্ষ্য রাখা দরকার যে শক্তি সমস্যার সমাধানে আমরা যেন প্রকৃতই স্বনির্ভর হই। না হলে অফুরন্ত শক্তির উৎস থাকা সত্ত্বেও তাকে ঠিক কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তার জন্য আমাদের সেই আগের মতোই অপরের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে।

অশেষ খাঁন

ফটো শুভম দত্ত

এগিয়ে চলার নয় বছর
শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন পথ
১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। ৪২.৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ছাত্রসংখ্যা থেকে গত নয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৫২.৮৮১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার। এই সময়ে তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র বেড়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও ৪৪ হাজার। ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বন্টন করা হচ্ছে। বিনামূল্যে জলখাবার পাচ্ছে ৩২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। গ্রামীণ এলাকায় সকল তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রী ও শতকরা ২৫ ভাগ অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে ২৫০০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অথবা জুনিয়র বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সুযোগ ছিল ৭৪৩ টি বিদ্যালয়ে এবং ১৬৪ টি কলেজে। বর্তমানে ১১১৯ টি বিদ্যালয় ও ২৬৮ টি কলেজে এই সুযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৮,২৬০ টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের জন্য খোলা হয়েছে ৫০ টির ওপর নতুন কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন ৬৩৯ কোটি টাকা, যেখানে সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৬৩৬ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে—১০৮ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের—৮·৭৫ টাকা। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাবদ বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১·২ শতাংশ।
এছাড়াও শিক্ষালাভের সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য গত নয় বছরে ১৭৬১ টি নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৭৬২ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫২৩ টি। উৎসাহী ক্রেতার কাছে ভাল বই পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যে রাজ্য পর্যায়ে ৩ টি এবং জেলা পর্যায়ে ১৬ টি গ্রন্থমেলা হয়েছে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে ও একটি বইমেলা হয়েছে। গবেষক উৎসাহী পাঠক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে সরকার একটি আধুনিকতম গ্রন্থপঞ্জীর মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজে হাত দিয়েছেন।
সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে ও লোকসংস্কৃতির ধারাকে চলিষ্ণু রাখার স্বার্থে অনেকগুলি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যদান ও সাহিত্য প্রকাশনায় অনুদান প্রদান এগুলির অন্যতম। শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্র, আলাউদ্দীন ও দীনবন্ধু পুরস্কার। নেপালী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে ভানুভক্ত পুরস্কার। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে নেপালী, বাংলা ও উর্দু আকাদেমী এবং সঙ্গীত আকাদেমী। আদিবাসী মানুষদের কৃষ্টিকে রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র—সিউড়ি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে। চলচ্চিত্রকে উন্নতমানের করার জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং প্রেক্ষাগৃহ ও কৃষ্টিকেন্দ্র "নন্দন"। উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে গিরিশ মঞ্চ।
সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষার ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য আজ আমাদের একতাবদ্ধ হবার দিন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ARUN SIGN

রাজকীয় মহিমার স্বর্ণকুমারী/ রাধারানী দেবী

আমার ইচ্ছে সেকালের কয়েকজন সাহিত্যিকের কথা বলি, যাঁদের একালের মানুষরা চেনেন না। যেমন নাম করি কয়েকজন মহিলা কবি—স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, প্রিন্সেস নিরুপমা দেবী।

কোনো কোনো মানুষের স্বচ্ছন্দ রাজকীয় প্রকাশ দেখা যায় চেহারায়, চরিত্রে, আচরণে। এই রাজকীয়তাও কিন্তু তৈরি করা হয়েছে যুগে যুগে শিক্ষা ও অভ্যাসের মাধ্যমে। মননের কারখানায় তৈরি কবির নিখুঁত কবিতার মতন সহজ, স্বচ্ছন্দ। রাজকীয় মহিমা যে সব মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ এমন একজনের কথা দিয়ে শুরু করি আজকের লেখা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা লেখিকা, মহিলা কবি স্বর্ণকুমারী দেবী। মহর্ষি কন্যা স্বর্ণকুমারীর দেহ সৌন্দর্য ছিল রাজকীয়। দেহের উচ্চতা ও ঋজুতা দেহের গঠন সর্ব অবয়ব ভাস্কর্য সুলভ যথাযথরূপে পরিমিত, চোখের দৃষ্টি, দেহচর্মের উজ্জ্বল চাঁপাফুলের খাঁটি রং আমাদের চোখকেও বিস্মিত করত। তখন কলকাতায় মেমসাহেব কম ছিল না। তাঁদের দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, সুন্দর চোখ স্বর্ণকুমারীর মতো এমন বিশেষত্বপূর্ণ মনে হয় নি। শুধু দৈহিক সৌন্দর্য নয় কথা-বার্তা চলা-ফেরার ভঙ্গি, হাসি, গাম্ভীর্য সবই বৈশিষ্টময় স্বকীয়তা দীপ্ত।

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সীমাবদ্ধ ছিল না কেবলমাত্র কবিতাতেই। নাটক, উপন্যাস, গল্পও লিখেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘকাল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে তাঁর লেখনী শস্য রিক্ত ফাঁকা সাহিত্য ক্ষেত্রকে সবুজ করে তুলেছিল। স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ উচ্চতাময়। কথাবার্তার মধ্যে স্থির আত্মপ্রত্যয়। আচরণ সুন্দর সহজ আভিজাত্যপূর্ণ। কয়েকবার তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। প্রত্যেকবারই তাঁর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। দুবার তাঁর সানি পার্কের বাড়িতে চায়ের আর গানের আসরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমার কবিতা তিনি অনেকের মুখে শুনেছিলেন। বেশ ভালো লিখি। দেখার সুযোগ হয় নি ওঁর। ভারতীতে কবিতা পাঠাতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন—'তোমার দু একটি কবিতা আমি দেখেছি।' সে কবিতা তো রবির কবিতারই নকল মনে হল। একটু থেমে, 'ভালো নিশ্চয়ই, তবে নিজের মতো করে লেখো। অক্ষয় বড়াল, সত্যেন দত্ত এরা আরও উঁচুদরের কবি। পড়েছো তো তাঁদের কবিতা?'

স্বর্ণকুমারী দেবী ওঁর সানি পার্কের বাড়িতে একবার তখনকার তরুণ লেখকদের ডেকেছিলেন। রচনা পাঠের সভায় তাঁর একটি গল্প ও উপন্যাসের কতক অংশ পড়েছিলেন মনে আছে। সেই আসরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, সতীশ ঘটক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ঠাকুর বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে। তখন নতুন লেখকদের মধ্যে ভারতী গোষ্ঠীর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়। আমি তখন রাধারানী দত্ত। লেখা নিয়ে আলোচনা হল। আমার মনে আছে সৌরীনবাবুর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিতর্ক হল। সেই বিতর্ককে খুব সুন্দরভাবে মেটালেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। আধুনিকদের মধ্যে থেকে দু-চারটে কথা বলেছিলেন কবি হেমেন্দ্রলাল রায়। তখনকার দিনে দস্তুর ছিল না ছোটরা বয়োঃজ্যেষ্টদের প্রশ্ন করবে। ছোটরা কেবল উত্তর দেবে, এইটেই ছিল দস্তুর। আমার মনে আছে তাঁর রচনার কোনো অংশে দুটি চরিত্র নিয়ে সৌরীনবাবুর সঙ্গে বিতর্ক বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ঘরের ভেতর একটা অদ্ভুত সৌরভ পাওয়া যাচ্ছিল। এক একজন প্রশ্ন করলেন এটা আতরের গন্ধ না এসেন্সের গন্ধ। উনি একটু হেসে বললেন এটা আসল মৃগনাভি। আমার কিন্তু সে গন্ধটা একটুও ভালো লাগছিল না। ভীষণ চড়া, তীব্র সে গন্ধ। একটা তীব্র সুগন্ধের মধ্যে একটা চামড়াপোড়া গন্ধ লাগছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই কস্তুরী শুনে চমৎকৃত হয়ে বাহবা দিতে লাগলেন।

স্বর্ণকুমারীর মেয়ে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেদিন ওখানে এমন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাদের নাম কাগজে পড়েছি, চোখে প্রথম দেখলাম। চিত্রকর যামিনী গাঙ্গুলিকে সেই আসরে দেখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বিস্ময়ে অভিভূত মন যেমন শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে অবনত হতো, স্বর্ণকুমারী দেবীর সামনে গেলে তার থেকে বেশি বই কম হতো না। মহর্ষির এই দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে সেই বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল।

স্বর্ণকুমারীর সংসারে পাশ্চাত্য আচার আচরণের প্রভাব খুব ছিল। খানদানী আবহাওয়াও পাশাপাশি ছিল। ওঁর বড় মেয়ে সব আসরেই থাকতেন। স্বর্ণকুমারীর 'সখী সমিতি'র অন্যতম সদস্যা ছিলেন আমার পিসিমা চমৎকারমোহিনী দেবী। □

গহরজান যখন পঁয়তাল্লিশ/জয়দেব সেন

'সেদিন রাত্রে আমরা এক ধনী বাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। বিখ্যাত এক গায়িকার গান শুনলাম। তাঁর নাম, গহরজান। আমেরিকান-ইহুদী। চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায় গান গাইতে পারেন। তাঁর একটি গান আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। 'সিলভার থ্রেড্স্ এ্যামাঙ্ দি গোল্ড' গানের অনুসরণে রচিত। গহরজানের মুজরোর দক্ষিণা ছিল তিন শ টাকা। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল জাঁকজমকের। বিকেলে তিনি সুদৃশ্য ফিটনে করে ময়দানে বেড়াতে যান। সেদৃশ্য ছিল দারুণ উপভোগ্য।'...

১৯০২ সালের ঘটনা। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন রেকর্ডিং এঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম সি. গেইসবার্গ। কলকাতার শিল্পীদের গান রেকর্ড করার জন্য। খুব সহজে গায়ক-গায়িকাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রঘরের মহিলাদের পক্ষে প্রকাশ্যে গান গাওয়া তো দূরের কথা বাড়ির আনন্দানুষ্ঠানে সকলের সামনে গান শোনারও উপায় ছিল না। তখন কলকাতার পুরুষরাও ছিলেন 'সংগীত পুষ্ট'। গান রেকর্ড করা হত অভিনব পদ্ধতিতে। দুটি চোঙার সামনে টেবিলে গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রশিল্পীদের বসতে হত। মোম লাগানো ডিস্কে পিনের সাহায্যে রেকর্ডিং করার জন্য গায়ক-গায়িকাদের উচ্চ স্বরে গান করার প্রয়োজন ছিল। একারণেই বোধ হয় বাঈজীদের গান সেকালে বেশি রেকর্ড করা হয়েছে। কতজনের নাম করব? বুল্লা কিরণ, জ্ঞানদা বাঈজী, মেজি বাঈজী, কিরণশশী, মিস্ নিত্যকালী, মিস্ ফিরোজা, ফণিবালা, পাঁচুবালা, মিস্ ছোটরাণী এমন বহু নাম পুরনো রেকর্ড-সংগীত বইয়ে ছড়িয়ে আছে। ১৯০৬ সালেও গেইসবার্গ ভারতে এসেছেন। গেইসবার্গ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লেখেন, 'বাঈজীদের মধ্যে বিশেষ কেউ খুব নাম করেছেন বলে শুনি নি। একমাত্র গহরজান ছাড়া। খুব বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ গায়িকা। সারা ভারতে তাঁর কদর ছিল অভাবনীয়। অল্প কয়েক জনের রেকর্ড সারা ভারতে বিক্রি হয়। গহরজান এঁদের অন্যতম।'

এই গহরজানের গান শুনেছেন গেইসবার্গ ১৯০২ সালে। এক জমিদার বাড়ির মাইফেলে। নিজের ডায়েরিতে লিখেও গেছেন সেসব মজার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। সেকালে কলকাতার গানের মুজরো ছিল কেমন? 'গেইসবার্গের বিবরণ: 'গাইতে গাইতে এক গায়িকা ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে পাঁচজন যন্ত্রী। দুজন এসরাজ নিয়ে। একজন তবলচি। আর দুজন মন্দিরাবাদক। গায়িকা মুক্তা ও স্বর্ণলংকারে সুসজ্জিতা। ব্রেসলেট, নেকলেস, নূপুর—সারা শরীরে ঔজ্জ্বল্য। সর্বাপেক্ষা আকর্ষক হীরের নাকছাবি এই গায়িকা ছিলেন এক মুসলমান রমণী, মাইফেলে দারুণ জনপ্রিয়। গানবাজনার সঙ্গে তাঁর নাচও ছিল চমৎকার।'

গেইসবার্গের কাছ থেকেই জানা যায়, শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী জানকীবাই একদিন রেকর্ডিং-এ উপস্থিত হলেই নিতেন তিন হাজার টাকা। জানকী বাই-এর থেকে দুলারী ছিলেন অধিক জনপ্রিয়। যদিও দুলারী গায়িকা হিশেবে তাঁর সমতুল্য নন। দুলারী সবসময় নতুন নতুন গান শিখে রেকর্ড করতেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতাও ছিল ঈর্ষণীয়।

গেইসবার্গ আর একটি মজার কথা শুনিয়েছেন। সে সময় কলকাতায় বাবুগিরির নানা অনুষঙ্গ ছিল। ছিল ছাতা আর সাইকেলের দারুণ কদর। এর সঙ্গে এল গ্রামোফোন। চোঙাঅলা। বড় মাপের 'ব্রাশ হর্ণ' তখন কৌলীন্যের মাপকাঠি, পড়শীদের চক্ষুশূলও। এখনও অনেকের কাছে গহরজানের নানা ভাষায় গাওয়া বহু রেকর্ড পাওয়া যায়। সুন্দরী, সুসজ্জিতা এই বাঈজী তাঁর জীবিতকালেই পরিণত হয়েছিলেন প্রবাদে। গহরজান নিজেও এ ব্যাপারে ছিলেন বেশ সচেতন। নানা ভাবে তাঁর ইমেজ তৈরি করতে সবসময়েই সচেষ্ট। একবার তাঁর পোষা বিড়ালের বাচ্চা হল। এই উপলক্ষে এলাহি কাণ্ড বাধালেন গহর। বিরাট ভোজ; শয়ে শয়ে নিমন্ত্রিত অতিথি। খরচ কুড়ি হাজার টাকা। মাঠে ঘাটে বৈঠকখানায় এ নিয়ে নানা খোস গল্প চলেছিল বহুদিন। গহরজান রেকর্ড করতে আসতেন খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে। তাঁর যন্ত্রীদল ও পার্শ্বচরদের অভিনব উপস্থিতি অবাক হয়ে দেখার। প্রত্যেক বারই নতুন নতুন চমক। একই পোষাকে একই ভাবে গহর কখনও কোথাও যেতেন না। রেকর্ডিং-এর সময়ও নয়। আসতেন নিত্যনতুন পোশাকে। আরো দামী, আরো সুন্দর। এক অলঙ্কার পরতেন না দ্বিতীয় বার। স্বর্ণখচিত লেস বসানো কালো পোশাকে গহরজান হয়ে উঠতেন মোহময়ী। এমন কায়দায় পোশাক পরতেন যে তাঁর সুডৌল মসৃণ পা ও নাভিদেশের অনাবৃত অংশ দেখা যায়। অতিথিবৃন্দ গান শুনবেন না গহরকে দেখবেন?

গেইসবার্গ আরো লিখছেন; 'আমাদের সেল্স্ ম্যানেজার আদ্দিস এবং আমি তাঁর বয়স সম্পর্কে ধাঁধায় পড়লাম। আমি ভেবেছি তিনি বাইশ বছরের যুবতী। আদ্দিস বলেছেন, পঁচিশ। আমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত বোকা বনেছি। গহরজানের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ!
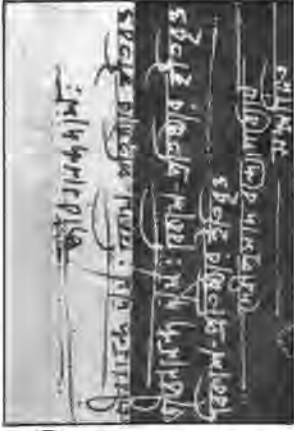
জীবনানন্দ দাশ কবিযশ ও অপযশ পেরিয়ে

আসলে, জীবনানন্দ সম্পর্কে এত সমালোচনা অধীত করেও দেবীপ্রসাদবাবু বোধহয় তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই ভুল বুঝলেন জীবনানন্দকে। তাই জীবনানন্দর "নির্বিচার আশাবাদ" তাঁর কাছে "খুব স্বতঃস্ফূর্ত" মনে হয় না। প্রাচীনপন্থী সমালোচনার অপব্যাখ্যা অনুসারেই জীবনানন্দকে মূলত আশাহীনতার কবি বলে প্রচার করা হয়েছিল, উত্তর-আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে জীবনানন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের অপরাজেয় চরিত্রের প্রতি তাঁর আস্থা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এই উত্তর-আধুনিক সচেতনতা দেবীপ্রসাদবাবুর জীবনানন্দচর্চায় প্রতিফলিত হল না, অথচ পুরনো সমালোচনার বিশ্বাসযোগ্যতা নতুন যুগের চেতনার কষ্টিপাথরেই তো যাচাই করা হয়।

ইতিবৃত্ত সম্পাদনার রীতি অচলিত নয়। সংকলকের কৃত্য যদি সম্পাদকের উপর বর্তায়, তাহলে স্বভাবতই ব্যক্তিগত রুচিশাসন ও নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া যায়। 'জীবনানন্দ দাশ/ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নি, এমন কথা বলা যায় না। বরং বলা ভালো, গ্রন্থ-পরিকল্পনার আদলটির মধ্যে সেই সুযোগের সচেতন প্রশ্রয় রয়েছে।

দুই অর্থে বিস্তৃত এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে ১৯১৫-১৯৫৪ সময়সীমায় জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে "ধারাবাহিক উপকরণমালা" অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের জীবদ্দশায় (এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে) সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার সংগ্রহ, কয়েকটি চিঠি ও কিছু কবিতা। এই উপকরণমালার সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই যুক্ত হয়েছে সম্পাদকের অতিমূল্যবান তথ্যদীপ্ত টীকা-ভাষ্য। দ্বিতীয়ার্ধে উপকরণমালাকে "কালক্রমিক দৃষ্টান্ত-চয়নিকা" হিশেবে ব্যবহার করে জীবনানন্দ দাশের "বিকাশ-প্রতিষ্ঠার মূল ইতিহাস" সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতে চেয়েছেন সম্পাদক। এই ইতিহাস, সম্পাদকের অভিমতে, "পটভূমি-প্রবণতার রচনাগ্রন্থনার ঋণ-প্রভাবের নানা বিস্তারের এবং পর্যালোচনা ও অনবলোকনের ইতিহাস।" সম্পাদকের ভূমিকালিপি মান্য করেও গ্রন্থনামটি ঈষৎ-বিভ্রান্তিজনক লাগে, গ্রন্থপাঠের পরে যে বিভ্রান্তি পাঠকের মনে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বইটি আসলে জীবনানন্দ দাশের কবিপ্রতিষ্ঠা লাভের ইতিবৃত্তের উপকরণসংগ্রহ হয়ে উঠেছে এবং সম্পাদক কবিযশ বা অপযশ অর্জন সম্পর্কে তথ্যাদির প্রতিই বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

একথা ঠিক, যে ১৯১৫-১৯৫৪ কালসীমায় নিজেকে স্বেচ্ছাবৃত রেখে, গদ্যলেখক জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠালাভের ইতিবৃত্ত সন্ধান করবার সুযোগ সম্পাদক পান নি। কিন্তু গদ্যলেখক হিশেবে জীবনানন্দের বিকাশের ইতিবৃত্ত অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। সম্পাদকের কাছে বিকাশের ইতিবৃত্ত ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত যদি পরস্পরের পরিপূরক হয়, তা হলে গ্রন্থনামটির প্রতি সৌজন্যে একটি স্বতন্ত্র অংশে অন্যতর কালসীমা নির্ধারিত করে (যেহেতু কবিপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তের জন্য তিনি যে কালসীমা বেছে নিয়েছেন তখন লীলা রায়ের মতো ভাবতেন প্রায় সকলেই "He writes nothing but poetry", দ্রষ্টব্য আলোচ্য বই, পৃষ্ঠা ২৬৪) জীবনানন্দের প্রতিভাবিকাশের মূল্যবান দ্বিতীয় সূত্রটি অনুসন্ধান করা সংগত ছিল। কবিপ্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ইতিবৃত্ত তার মর্যাদা কিছুটা হারিয়েছে। কয়েকটি পরিচিত কবিতার পুনর্মুদ্রণ এবং দ্বিতীয়ার্ধে সম্পাদকের স্বল্পায়তন বিশ্লেষণমাত্র এই বিকাশ-ইতিবৃত্তের অবলম্বন। 'দেশবন্ধু-প্রয়াণে' "প্রায় প্রথম" এই দাবি সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রিত করবার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু কবিতাটি সহজলভ্য। বরং অগ্রন্থিত কবিতা 'ভারতবর্ষ' (শ্রাবণ, ১৩৩৩) এই সুযোগে পুনর্মুদ্রিত হলে ভালো লাগত। আরো ভালো লাগত, সাহিত্যিক ভাষাব্যবহারে যাঁরা শুদ্ধতাবাদী তাঁদের চেতনায় রক্ষণশীলতা কীভাবে এবং কেন কাজ করে সেই সামাজিক পটভূমিকাটি একেবারে স্পর্শ না করে "ভাষাপরীবাদ" যদি রচিত না হত। যদি প্রাগুক্ত অংশে বিশ্লেষণ করা হত ভাষাব্যবহারে "স্থিতি বিচলিত করা"র মতো জীবনানন্দের প্রগতিমূলক লক্ষণটিকে—তাঁর গদ্যরচনায়ও যাকে নির্ভুলভাবে চেনা যায়।

আরো কিছু প্রত্যাশাও ছিল সম্পাদকের কাছে, প্রথমার্ধের কিছু কিছু অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করা বোধহয় অসম্ভব ছিল যদি না সম্পাদকীয় নির্বাচনপদ্ধতির ফলে সেই অসম্পূর্ণতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে থাকে। নির্ধারিত কালসীমার মধ্যেই, প্রকাশ বা উল্লেখ করা যেত প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ (১৩৩৬)। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে, রচিত এবং সেই বছরে প্রকাশিত জীবনানন্দ-সম্পর্কিত লেখার মধ্যে সম্পাদক বেছে নিয়েছেন নরেশ গুহ ও পিয়ের ফালোঁর রচনাকে। নীহাররঞ্জন রায় ('মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ', ময়ূখ, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-১৩৬২), অমলেন্দু বসু ('যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার', কবিতা, পৌষ ১৩৬১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত ('কবি জীবনানন্দ দাশ' উষা, কার্তিক ১৩৬১) প্রমুখ লেখকদের রচনা, তখনকার তরুণ কবিদের কেতন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়-অংশ অথবা 'পরিচয়' (কার্তিক ১৩৬১) পত্রিকায় ননী ভৌমিকের জীবনানন্দ-স্মরণ আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত হলে পাঠক অধিকতর উপকৃত হতেন। তা ছাড়া 'কবিদের কবি' বলে যাঁর নাম প্রচারিত, তাঁর মৃত্যুকে কী কাব্যরূপ দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ক্রান্তি, কার্তিক ১৩৬১) অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র (উষা, কার্তিক ১৩৬১) তাও আমরা জানতে পারি না যেহেতু বোধহয় সম্পাদকের মতে জীবনানন্দকে নিবেদিত কবিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তের কোনো উপকরণ নেই। সত্যিই কি নেই?

রচনা-নির্বাচন নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন থেকেই যায় যদিও তাঁর নিজস্ব সীমার মধ্যে সম্পাদকের তথ্যনিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসা পাঠককে কখনো কখনো স্তম্ভিত করে। জীবনানন্দ দাশগুপ্ত কবে থেকে জীবনানন্দ দাশ হয়ে উঠলেন সে-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সন-তারিখ এই গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। সম্পাদকের দেওয়া এই তথ্যটিও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করি যে, কান্তে এবং চাঁদকে মিলিয়ে দেওয়ার কাজটি জীবনানন্দ দাশই সর্বপ্রথম করেছিলেন। তুলনা-অংশ অনেকক্ষেত্রেই মনোজ্ঞ আনুমানিক ১৯২৬-এ লেখা একটি চিঠিতে ব্যবহৃত বাকপ্রতিমার সঙ্গে সমসাময়িক কবিতার চিত্রকল্পের তুলনা করেছেন সম্পাদক এবং এই ধরনের প্রচেষ্টার মধ্যে কবির মনোজগতের একটি ছবি সম্পূর্ণ করবার উৎসাহ-উদ্যম সহজেই লক্ষ করা যায়। 'ঘোড়া' সম্পর্কে সজনীকান্ত দাসের বক্তব্যের সঙ্গে আলোক সরকারের বক্তব্যের তুলনার প্রয়াস সুযৌক্তিক, যদিও এই প্রয়াসের চিহ্ন অন্যত্রও থাকতে পারত।

সম্পাদকীয় ভাষ্যের কিছু

অস্বচ্ছতাও নজরে পড়ে। 'বনলতা সেন'-এর সিগনেট প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 'চিত্ররূপময়' প্রসঙ্গে সম্পাদকের মনে হয়েছে, এই "বক্তব্যের লক্ষ্য যেন বনলতা সেন।" কিন্তু 'চিত্ররূপময়' বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছিলেন 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি পাঠ করে এবং 'মৃত্যুর আগে' 'বনলতা সেন' নয়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থভুক্ত। বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত হলেও, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্পষ্টত জানা যাচ্ছে না। 'ক্যাম্পে' কবিতাটির প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশনও অসম্পূর্ণ। দেবীপ্রসাদবাবু জানাচ্ছেন, 'ক্যাম্পে' কবিতাটি ('পরিচয়', মাঘ ১৩৩৮) "চেয়ে নেওয়া লেখা বলে সম্পাদকীয় অনাগ্রহ সত্ত্বেও পরিচয়-এ ছাপা হয়"। এই সংবাদটির সূত্র এবং তথ্যভিত্তি উল্লেখ করা প্রত্যাশিত ছিল এবং 'ক্যাম্পে' প্রকাশ করা নিয়ে সম্পাদকীয় জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার পরেও 'পরিচয়'-এ জীবনানন্দ দাশের অন্যান্য কবিতা (যেমন 'সমুদ্রচিল', 'প্যারাডিম', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি) কীভাবে প্রকাশিত হল তা জানবার জন্যেও আমাদের কৌতূহল রইল। অনুরূপভাবে, গ্রন্থশেষে জীবনানন্দ দাশের প্রতি "প্রগতি পন্থীর সুদৃষ্টি" সম্পর্কে সম্পাদক যে কটাক্ষ করেছেন অথবা অন্যত্র নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠার আড়ালে 'ধর্মাচার'-এর অস্তিত্বের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা এই বিশেষ গ্রন্থপ্রয়াসটিকে শেষপর্যন্ত কিছুটা অসুন্দর করে তুলেছে। নজরুল ইসলামের কবিতার জনপ্রিয়তার কারণ হিশেবে ধর্মাচারের উল্লেখ যেমন যুক্তিহীন ও অশোভন, ঠিক তেমনই অতিসরলীকরণের প্রবণতা চোখে পড়ে যখন লক্ষ করা যায় জীবনানন্দ-নজরুলের কবিসম্বন্ধকে সম্পাদক কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দ নির্বাচন দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে, জীবনানন্দ সম্পর্কে এত সমালোচনা অধীত করেও দেবীপ্রসাদবাবু বোধহয় তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই ভুল বুঝলেন জীবনানন্দকে। তাই জীবনানন্দর "নির্বিচার আশাবাদ" তাঁর কাছে "খুব স্বতঃস্ফূর্ত" মনে হয় না। প্রাচীনপন্থী সমালোচনার অপব্যাখ্যা অনুসারেই জীবনানন্দকে মূলত আশাহীনতার কবি বলে প্রচার করা হয়েছিল, উত্তর-আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে জীবনানন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের অপরাজেয় চরিত্রের প্রতি তাঁর আস্থা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এই উত্তর-আধুনিক সচেতনতা দেবীপ্রসাদবাবুর জীবনানন্দ চর্চায় প্রতিফলিত হল না, অথচ পুরনো সমালোচনার বিশ্বাসযোগ্যতা নতুন যুগের চেতনার কষ্টিপাথরেই তো যাচাই করা হয়। আজ এ কথা আমরা জেনে গিয়েছি, জীবনানন্দের বিখ্যাত ক্লান্তি—বিষাদ এবং রোমান্টিক লেখকদের 'অকারণ মন-খারাপ' এক নয়, তাঁর যন্ত্রণাবোধকে বরং গোর্কির 'চরমতিক্ত' অনুভূতির সহচর বলেই চেনা যায়। এই সূত্রেই জীবনানন্দের মর্মস্পর্শ করে যায় নি কি নজরুল ইস্‌লামের 'বিষজ্বালা' ইস্‌লামের বেদনা ও বিপন্নতাবোধ? 'ঝরা পালক'-এর বহিরাঙ্গিক সমাপতন ছাড়িয়ে আরো গভীরসঞ্চারী হয় নি কি নজরুল ইস্‌লামের প্রেরণা? প্রসঙ্গত'অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে—জীবনানন্দের নিজের ভাষা ব্যবহারেই মনে রাখতে হবে—"বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোশ বার করে ফেলবার উদ্দেশ্য" জীবনানন্দ ব্যক্ত করেছেন "প্রায়ই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে।"

তথাপি আলোচ্য গ্রন্থটি—সম্পাদকের কাঙ্ক্ষিত ছিল কিনা জানিনা—জীবনানন্দ সম্পর্কে কিছু প্রাচীন সমালোচনার খ্যাতি ও কিংবদন্তিকে ধূলিসাৎ করেছে। সম্পাদকের কাঙ্ক্ষিত কিনা এ সংশয় এই কারণে যে জীবনানন্দ—সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার তাঁর কাছে "প্রথম অধ্যায়ে রক্ষণশীলের বিরাগ উৎপাদন করেছিলেন, উত্তরাধ্যায়ে বিরাগ উৎপন্ন করেছিলেন প্রগতিপন্থীর"—এখানে সম্পাদক যেন ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন বুদ্ধদেব বসুর বিরাগের তথ্যটি, যা অবশ্যই তাঁর ভাবনার বাইরে ছিল না, যেহেতু এর উল্লেখ অন্যত্র নিজেও করেছেন। যাই হোক না সম্পাদকের অভিপ্রায়, এই গ্রন্থ অনুসরণ করেও আমাদের কাছে স্পষ্ট হল যে জীবনানন্দের কবিতার পূর্ণ রসগ্রহণ করতে বুদ্ধদেব বসু, শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন।

যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যেমন বুদ্ধদেব বসুর, তেমনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনানন্দ-বিরোধিতার উৎস, উদ্‌ভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা। ইতিহাস পরিহাসপ্রবণ, তাই ১৩৯০-এর বইমেলার অনুষ্ঠানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আবেগময় গলায় 'আট বছর আগের একদিন' আবৃত্তি করতে শোনা গেল। সুভাষবাবুর উদ্‌ভ্রান্তির কারণ তবু বোঝা যায় যেহেতু চল্লিশের দশকের নতুন কবিতার মেজাজের সঙ্গে এবং সুকান্ত—বিষ্ণু দে-র

> **আজ এ কথা আমরা জেনে গিয়েছি, জীবনানন্দের বিখ্যাত ক্লান্তি-বিষাদ এবং রোমান্টিক লেখকদের 'অকারণ মন-খারাপ' এক নয়, তাঁর যন্ত্রণাবোধকে বরং গোর্কির 'চরমতিক্ত' অনুভূতির সহচর বলেই চেনা যায়।**

মার্কসবাদনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করলে জীবনানন্দের কাব্যভাষাকে তাৎক্ষণিক ভুল বুঝবার সুযোগ থাকে। বুদ্ধদেব বসুর বিরাগের রহস্য কিন্তু দুর্বোধ্য থেকে যায় যদি না আমরা বুদ্ধদেববাবুর কথা-মতো মেনে নিই সমসাময়িক গণ-আন্দোলনের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠায় জীবনানন্দের কবি প্রতিভা "শোচনীয়" দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

বুদ্ধদেব বসু কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং তাঁদের অনুসরণকারী পরবর্তী কয়েকজন অধ্যাপক—কবি—সমালোচক জীবনানন্দের চরিত্রকে খানিকটা বানিয়ে তুলেছিলেন। এই বানিয়ে তোলার মধ্যে তাঁদের আপন মনের মাধুরী রয়েছে, রয়েছে নিজেদেরই চরিত্রলক্ষণ। উক্ত শ্রেণীর সমালোচকদের আধিপত্য সত্ত্বেও আলোচ্য বইয়ে জীবনানন্দের চরিত্র ছবিটি উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠেছে। পাঠকের এটাই পরমপ্রাপ্তি। যে কবিযশোপ্রার্থী তরুণ চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে, যিনি নম্র বিনয়বচনে পটু ছিলেন অথচ প্রত্যাঘাতের প্রবণতায় যিনি রূঢ় ও ক্ষমাহীন, নিজের রচনার জোর সম্পর্কে যিনি ছিলেন অসন্দিগ্ধ—সেই জীবনানন্দকে আমরা কমবেশি পেয়ে যাই আলোচ্য সংকলনে, পেয়ে তৃপ্তিবোধ করি। 'ময়ূখ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্মপরিচয়-এর পুনর্মুদ্রণ সম্পাদকের দায়িত্বনিষ্ঠার মূল্যবান পরিচয় দিয়েছে। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতাবিলাসের কিংবদন্তিটিও ভেঙে যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বিষ্ণু দে-কে লেখা তাঁর চিঠি পড়লে।

গ্রন্থপাঠ শেষ হলে পাঠকের মনে হয়ত সম্পাদকের ভাষাশৈলী সম্পর্কে কিছু অস্বস্তি থেকে যেতে পারে। মানছি, আমাদের গদ্যরীতিকে আরো আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু আধুনিকতার আয়াস যদি বড় বেশি স্পষ্ট হয়, ভাষাপ্রকরণে সযত্ন আধুনিকতার অভিজ্ঞান যদি বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে প্রায়ই লাফিয়ে ওঠে, তা হলে অস্বস্তিবোধ না করে উপায় থাকেনা। "পুঁথিগত ভাষ্য-বিধানের সামনে কবির অনন্য শিল্পাশ্রয়ী স্বপক্ষাবাদ"—এ ধরণের বাগ্‌বিস্তার আমাদের স্বভারতই বিমূঢ় করে কিন্তু বাংলা গদ্য রীতিকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যায় বলে তো মনে হয় না। ৩৯৬ পৃষ্ঠার প্রথম পূর্ণবাক্যটির বাগর্থ খুঁজে পেতেও বিশেষ ক্লেশ হল। অবশ্য পাঠকের ভাষাবোধকে সবসময়ে ক্লেশহীন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই—বিশেষত এ ধরণের অনেক ক্লেশের পরিণতি নান্দনিক অভিজ্ঞতায় উত্তরণ। তবু, ভাষাচাতুর্য দিয়ে বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার যে তথাকথিত আধুনিক রীতিটি রয়েছে, সম্পাদক তাকে কখনো কখনো মান্য করেছেন বলে ধারণা হয়েছে। আমাদের ধারণা ভুল হলে সুখী হব।

অমিতাভ গুপ্ত

জীবনানন্দ দাশ/বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা ৬। ১৯৮৬। ৬০ টাকা।

মে দিন ঃ স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নেরও বেশি

সৎ-কবি মাত্রেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এবং তাঁর এই সমাজ নিশ্চয়ই দেশকালের গণ্ডীমুক্ত বৃহত্তর মানবসমাজ। সেই সমাজের প্রতি কবিদের দায়পালনের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়েছে—'মে-দিনের কবিতা' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটিতে। চব্বিশজন কবির পঁচিশটি কবিতা এবং অন্যতম সম্পাদক অতীন্দ্র মজুমদারের একটি সুলিখিত অবতারণিকা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। প্রায় সমস্ত রচনার নেপথ্যে প্রেরণা রূপে রয়েছেন প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মে-দিনের স্মৃতি পুষ্প দিয়ে তরুণ কবিরা অনেকেই প্রবীণ সহযাত্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সংকলন গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক মাত্র নন—গ্রন্থটির মুখবন্ধ থেকে শেষ কবিতাটি পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর কবিসত্তার অতন্দ্র অবস্থান অনুভব করা যায়।

মুখবন্ধে অতীন্দ্র মজুমদার প্রয়াত কবি-বন্ধুর কাব্যভাবনা, রোগজর্জর দেহ নিয়েও তাঁর নানা কাব্য-পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকাশকও জানিয়েছেন যে এই সংকলন-গ্রন্থটি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবিত ও সম্পাদিত তাঁর জীবদ্দশার শেষ প্রকল্প। একজন শক্তিমান যথার্থ বিপ্লবী কবির শেষবেলার কৃত ও কর্তব্যের সাক্ষ্যবাহী এই গ্রন্থটি একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা দাবি করে।

'মে-দিন শতবর্ষের আলোকে' : অতীন্দ্র মজুমদারের লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। মে নামের উদ্ভব, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে মে-দিনের উৎসবের রূপ ও রূপান্তর সংক্ষেপে উল্লেখ করে তিনি ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। শিল্পবিপ্লবের পরিণামে উদ্ভূত হল বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রাম ক্রমপরম্পরায় কীভাবে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে, তার একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণও তিনি দিয়েছেন। ১৮৮৬-র ১ মে, মে-দিনের উৎসবের দিন। শক্তিমান মালিকপক্ষ, পিঙ্কার্টন এজেন্সির খুনী গুণ্ডা ও বুর্জোয়াদের দালাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সমস্ত বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলল শিকাগো শহরের মিশিগান অ্যাভিনিউয়ের দিকে হাজার হাজার শ্রমিকের এক বহুকাঙ্ক্ষিত মিছিল।

শতায়ু এই মে দিনটি চির আয়ুষ্মান হোক—বিশ্বের সব বিপ্লবী কবিদের এই প্রার্থনা-সংগীতে বাংলার কবিরাও নিজ নিজ কণ্ঠদান করেছেন।

ধর্মঘট পালিত হল শহরের সমস্ত কলকারখানায়। লেকফ্রন্টের সভায় সমবেত সব শ্রমিককে সংগ্রামী অভিনন্দন জানালেন শ্রমিক নেতা পারসন্স ও অগাস্ট স্পাইজ। বহু শ্রমিকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে সেই মে দিবস আজ পরিবর্তিত বিশ্বে একটি নতুন প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

শতায়ু এই মে-দিনটি চির আয়ুষ্মান হোক—বিশ্বের সব বিপ্লবী কবিদের এই প্রার্থনা সংগীতে বাংলার কবিরাও নিজ নিজ কণ্ঠদান করেছেন। সুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত প্রবীণ ও তরুণ কবিদের নির্বাচিত কয়েকটি কবিতায় এই সংকলনটি প্রকাশ করে সম্পাদক ও প্রকাশক একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন। মে দিনের ভাবনাকে কেন্দ্র করে লেখা অনেকের কবিতা আমরা এই প্রথম একত্রে পেলাম।

প্রথম কবিতা বিষ্ণু দে-র 'মে-দিন' নিঃসন্দেহে এই সংকলনের একটি অন্যতম সেরা কবিতা। জীবনের গভীর প্রত্যয়কে মন্ত্রের গাঢ়তায় তিনি উচ্চারণ করেছেন। পুরাণের প্রসঙ্গ, রূপকথার চালচিত্র, কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডব মে-দিনের গানে কথা ও সুর জুগিয়েছে। আর সেই সুরে—"বিশ্বমাতার কোটি সন্তান/দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান/অমোঘ নিরুদ্বেগ।" শেষ পংক্তির এই "অমোঘ নিরুদ্বেগ" শব্দ দুটি যেন ইতিহাসমনস্ক দৃঢ় প্রত্যয়ী ঋত্বিকের আপ্তবাক্য। দিনেশ দাসের 'মে-দিন' কবিতাটিতেও মে দিন পালাবদলের শুভ সংকেত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিনিও মে দিনের মধ্যে দেখেছেন এক নবযুগের রক্তিম অভ্যুদয়—"লাল/ফুলের সকাল :/টকটকে লাখো জিভে জীবনের গান/পুরানো যুগের অবসান।" সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা' একটি সুন্দর নিটোল রসোত্তীর্ণ কবিতা। মে দিনকে কবি অনুভব করেছেন ধ্বংসের বার্তাবাহক রূপে। এই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন আজ এসেছে। মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের যৌবন-আত্মা সব বাধার পাহাড় অক্লেশে জয় করে এই দিনের অঙ্গীকার পালন করবে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা—'মে-দিনের স্বপ্ন' এবং 'মে-দিন একটি স্বপ্ন'—জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবির অন্তর্লীন বিশ্বাসের বাক্‌প্রতিমা। মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে এই কবি নিপীড়িত মানবাত্মায় যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন তারই দ্যোতকরূপে এসেছে মে দিনটি। তাই দুটি কবিতার দেহেই স্বপ্নের মায়াঞ্জন ছড়ানো। কিন্তু এই স্বপ্ন তন্দ্রা জড়িমায় আচ্ছন্ন নয়—এখানে কোনো মগ্ন চৈতন্যের লীলাবিলাস নেই। এক রুক্ষ রক্তাক্ত বাস্তবের স্থির চিত্র। কবি সারাজীবন দেখেছেন শুধু রাজনৈতিক পালাবদল। আক্ষেপ করেছেন দিন বদলায় না বলে। তবুও দিন-বদলের স্বপ্ন দেখায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগেও রোগশয্যায় শায়িত কবি মে দিনের স্বপ্ন দেখেছেন—শুনেছেন মে দিনের বিশাল চলমান মিছিল থেকে উত্থিত নতুন যুগারম্ভের জয়ধ্বনি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আট লাইনের ছোট কবিতাটি শুরু করেছেন "মে-দিন ফুলের দিন" এই বলে। মে দিনকে নিয়ে ফুলের উপমা অবশ্য অনেকের কবিতাতেই। মঙ্গলাচরণ যেমন বলেন "ইউরোপ টিউলিপলাল আবিরে মাতাল দিক্‌বিদিক", তেমনি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'মে দিবস' কবিতার প্রথম লাইন। "সোনালি চাঁপায় জ্বলে মে দিনের দীর্ঘ পরমায়ু।" আর সমীর রায় 'স্পাইজ ফিসার এঙ্গেলস' কবিতায় একটু ছাড়িয়ে গিয়ে লেখেন তিনি ফুলের কাছে রং, পাখির কাছে ডানা, নদীর কাছে হৃদয় ও পাহাড়ের কাছে আকাশ চেয়েছিলেন—প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঐ তিন শ্রমিক-নেতার কাছে পেয়েছেন পথচলার সংগ্রামী শক্তি। সব্যসাচী দেব 'মে দিনে' কবিতায় এই "মৃত্যুর নিথর ডাঙা"-র পরিবেশে অটুট রাখেন "স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নেরও বেশি" নতুন মে-দিনকে।

অবশ্য মানতেই হবে, এই সংকলনে কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে যেগুলি নিছকই বক্তব্যধর্মী, তথ্যভারে ন্যুব্জ কিংবা সাময়িকতায় আক্রান্ত। একটি স্মরণীয় দিনকে অবিস্মরণীয় করে রাখার সামর্থের অভাব কবিতাগুলির শব্দে চিত্রে ছন্দে সর্বত্রই স্পষ্ট। বিশেষ করে কয়েকটি ভালো কবিতার পাশে এগুলিকে বড়ই বেমানান মনে হয়। কোনো কোনো কবির বর্জন এবং কোনো কোনো নির্বাচন সংকলনটির মহিমা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করেছে। তবে এই ভালোমন্দের সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়েই হয়ত দায়বদ্ধ সমকালীন কাব্যধারার গতিপ্রকৃতি বা অসম চারিত্র অনেকটা বুঝে ফেলা যায়।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি বেশ ভালো। অনুষ্টুপ প্রকাশনী স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তাঁদের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সুধীজনের প্রশংসা লাভ করবে।

জয়ন্ত সোম

মে-দিনের কবিতা। সম্পাদনা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদার। অনুষ্টুপ, কলকাতা ৯। ১৯৮৬।১০ টাকা।

চীনের আধুনিক গল্প

'চীনের আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন' নাম হলেও সংকলনভুক্ত গল্পগুলি আজ থেকে অন্তত পক্ষে চার দশক কি তারও আগেকার লেখা। ১৯১৯-১৯৪৯ এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত মোট তেরটি গল্পের এই গ্রন্থটি 'মাস্টার পিসেস অব মডার্ন চাইনিজ ফিকশন'-এর বাংলা সংস্করণ। লেখকরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। সেদিক দিয়ে গ্রন্থটি যেমন চীনের তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, ঠিক তেমনি তা দেশের নেতৃত্বস্থানীয় গল্পকারদের সাহিত্যচর্চারও এক প্রামাণ্য নিদর্শন। বইটিতে অবশ্য তরুণদের সাহিত্য-ভাবনার কোনো পরিচয় নেই। গল্পকাররা প্রত্যেকে বয়স্ক—উনিশ শতকের শেষ ধাপে কিংবা বিশের শুরুতে যাঁদের জন্ম।

গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের ওপর জোর দেওয়া হয় নি। তবে একাধিক গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের সংকটময় বেঁচে থাকা ও নিষিদ্ধ জীবিকার দিকটি। যা থেকে আমরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের বহু মর্মান্তিক নমুনা পেয়ে যাই। আর এই লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ সর্বদা ক্ষমতাসম্পন্ন। কখনো বিরাট সামন্ত শ্রেণী, কখনো-বা তৃতীয় স্তরের মানুষকে সর্বাংশে গ্রাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সমাজ। এই সমাজ শ্রমোপজীবীদের আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে শেখায়। অস্ত্রহীন পঙ্গু জীবনে দারিদ্র ও অনটনের সঙ্গে তার সহাবস্থান তাকে আরো বিপর্যস্ত ও তুচ্ছ করে তোলে। অসহায় অশ্রুবিসর্জনের মতো, সেখানে, সবকিছুই তখন মূল্যহীন। অপার্থিব।

লাও শী-র 'আধখানা চাঁদ' গল্পটি এমনি এক সমাজের অবক্ষয়ের রূপ। বিপ্লবের পূর্বে মা ও মেয়ে প্রচণ্ড রকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে, তারা শুরু করে দেহবিক্রির ব্যবসা। গল্পটি সুখপাঠ্য। বিষয় বা পরিবেশনের দিক দিয়ে নতুনত্ব না থাকলেও লেখক মা ও মেয়ের মাধ্যমে বলা যায় তামাম বারবণিতাদের যথেষ্ট নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। ঘটনা-পরম্পরা ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণে তিনি শুধু এটুকু বোঝাতে সচেষ্ট যে, এই হীনবৃত্তির উৎস প্রকৃতই একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজ। তবে হোঁচট খেতে হয় গল্পের নামকরণে। 'আধখানা চাঁদে'র তেমন কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া গেল না। যদিও লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে তা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সে-চেষ্টাও খুব অকারণ এবং বাহুল্য ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তা ছাড়া, গল্প যেখানে কঠোর ও নির্মম বাস্তবতার সেখানে আসমানের চাঁদের সঙ্গে নিজের অদৃষ্টকে মেলানোর প্রয়াসকে বেশ লঘু মনে হয়।

প্রায় একই রকম ভাবনার গল্প 'ভাড়াটে বউ'। এখানে এক বিবাহিতা নারীকে তার স্বামী সংসার প্রতিপালনের ব্যয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ গ্রামের এক জমিদারের কাছে তিন বছরের জন্য ভাড়া দেয়। এই তিনটি বছর সে নিজের মেয়েকে ভুলে জমিদারের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিশেবে থাকে। এবং এক অসহনীয় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। যদিও সে একজনের স্ত্রী ও একটি অবোধ শিশুর মা, তাহলেও নিজেকে ও এই পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, দেখা যায়, সে অন্যের হাতের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু না। সন্তানের জন্য তার স্নেহ ও মাতৃত্ব, স্বামীর জন্য তার মনের টান আর বুড়ো-হাবড়া এই পর-পুরুষটার জন্য ভেতরে ভেতরে তার গুমরে ওঠা—ইত্যাকার বিভিন্ন সম্পর্ক ও নারীচরিত্রের মনস্তত্ত্বের দিকগুলি গল্পে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই গল্পটির লেখক রৌ শী এখন আর বেঁচে নেই। ১৯৩১-এর ১৭ জানুয়ারি কুয়োমিংটাঙের প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে হত্যা করে।

'শ্রীযুক্ত পান কেমন করে ঝড় সামলালেন' একজন বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে লেখা। যিনি স্বার্থপর ও ভীরু এবং খুব সামান্যতে যিনি পরিতৃপ্তি বোধ করেন। জাপানীদের সঙ্গে প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে তিনি যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতিতে নিজের চাকরি এবং পরিবারকে নিরাপদে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষকালে এই ঝড় থেকে বাঁচার জন্য তিনি যেসব উপায় অবলম্বন করেন, সেগুলো লেখকের শ্লেষদৃষ্টির মুনশিয়ানায় গল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। লেখাটি অত্যন্ত সাবলীল এবং চটপটে। লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই বুদ্ধিজীবীর আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকলেও, এক হিশেবে সেটা মানুষের যুদ্ধকালীন নিরাপত্তাহীনতার পরিচয়। অধিকাংশ গল্পে এই নিরাপত্তার চিন্তা কোনো না কোনোভাবে চামড়ার তলে তলে প্রবহমান রক্তের মতো জাগ্রত হয়ে আছে।

আজকের গল্পের পাশাপাশি এই সংকলনভুক্ত কয়েকটা গল্পকে (যেমন, 'লেকের ধারের সেই ছোট্ট ছেলেটা') ততটা সময়োত্তীর্ণ মনে না হলেও এই গ্রন্থের একটা ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বইটির অনুবাদ-সংক্রান্ত ত্রুটির কথা অনুবাদক নিজেই স্বীকার করেছেন। তাছাড়াও প্রায় প্রতি পাতাতে বেশ কিছু বানান ভুল থেকে গেছে যা পাঠকের চোখকে পীড়া দেয়। □

সৈকত রক্ষিত

চীনের আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন। অনুবাদ ডঃ সলিল ঘোষ। স্টার পাবলিকেশনস্‌ কলকাতা ৮। ১৯৮৬। ২৪ টাকা।

নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫

ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র 'মাঝি'-র বিশেষ সংকলন-সংখ্যা 'নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫' হাতে এল। সম্পাদকীয় পড়ে জানা যায় "সমসময়ের শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্কে না গিয়ে রেফারিগিরির বদলে প্রিয়-নির্বাচিত-সংকলন হিশাবে গড়ে তুলতে কবিরা যেমন একদিক থেকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি, সম্পাদকমণ্ডলীর অম্বিষ্টমন কবিতা নির্বাচনে সাধ্যাতীত শ্রম দিয়েছেন—ভিতর ও বাইরে দেশজুড়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়। উভয় তরফ থেকেই ১৯৮৫ ঘিরে প্রিয় নির্বাচনটি গড়ে তোলাই ছিল এ সংকলনের উদ্দেশ্য।"

সমসাময়িক কবিতার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব গড়ে তোলার স্বার্থে এ ধরনের প্রচেষ্টা যদিও প্রথম নয়, তবুও উল্লেখযোগ্যতার দাবি সংকলনটি নির্দ্বিধায় করতে পারে। ১৩৮ জন কবির ১৯৮৫ সালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা মোট ২০০টি কবিতা ১৫৮ পাতার সংকলনটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলনটি শুরু হয়েছে 'স্মরণিকা' বিভাগ দিয়ে, যেখানে সাম্প্রতিককালে প্রয়াত অরুণ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায় এবং সুচেতা মিত্র-র একটি করে কবিতা ছাপা হয়েছে। শ্রদ্ধা নিবেদনের এই ভঙ্গিটি ভালোই লাগল।

সংকলকদের কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য সংকলনটিতে পরিস্ফুট নয়। মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম, আশা-হতাশা বাস্তবের ও কবির মনের নানা উপাদান ও দিক বিষয়বস্তু হিশেবে এসেছে বিভিন্ন কবির কবিতায়। সেটাই তো সংগত—বাংলা কবিতার বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলাই এ ধরনের সংকলনের দায়িত্ব। একই বছরে বর্ষীয়ান কবি অরুণ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেমন লিখে চলেছেন, তেমনি পাচ্ছি শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু বা অমিতাভ দাশগুপ্তকে, কিংবা তরুণতর অনন্য রায়, শুভ বসু, অমিতাভ গুপ্ত, জয় গোস্বামী, নিশীথ ভড়, রণজিৎ দাশ থেকে শুরু করে তরুণতম পর্যন্ত অনেকেই। এতজন কবিকে একসঙ্গে পাওয়াটাই একটা মস্ত লাভ।

পুরোপুরি খুশি হওয়া যায় এমন অবশ্য বলা চলে না। যেমন, অধিকাংশ কবিরই নির্বাচিত হয়েছে একটি করে কবিতা। সেই 'একটি'তে কতটুকু আর চেনা যায় একজন কবিকে? সব মিলিয়ে তখন সংকলনটিকে মনে হয় সাধারণ কবিতা পত্রিকার যে কোনো একটি সংখ্যা মাত্র, আলাদা করে কবিচরিত্রকে বোঝার অবলম্বন কিছুতেই নয়। বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের নির্বাচিত কবিতাটি কতখানি প্রতিনিধিমূলক কিংবা কতখানি কবিতা হিশেবেই উপভোগ্য তা সন্দেহজনক।

সমস্ত সংশয় ও প্রশ্ন সত্ত্বেও সম্পাদক ও প্রকাশক নিশ্চয়ই প্রশংসিত হবেন তাঁদের এই প্রচেষ্টার আন্তরিকতায়।

অভীক মজুমদার

মাঝি। মে-জুলাই ৮৬। নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫। সম্পাদক প্রশান্ত রায়। কলকাতা ৬। ১২ টাকা

স্মৃতির অ্যালবাম থেকে পুরনো কলকাতার যানবাহন

প্রসাদ সেন

'কলকাতা পুরশ্রী', ১২ জুলাই ৮৬। কলকাতা ১৩।৩ পৃ।

খুব একটা পুরনো নয়, কিন্তু এখনই তা ইতিহাস হতে চলেছে—এই শতকেরই তিরিশের দশকের শেষভাগে এবং চল্লিশের অর্ধেক পর্যন্ত কলকাতার যানবাহন "কেমন ছিল, কীভাবে চলত", তারই স্মৃতিমূলক বিবরণী—"যাঁরা এগুলো দেখেন নি তাঁদের জন্য"। এসেছে নানা কথা—ট্রামের ড্রাইভারের সামনে জালহীন খোলা কেবিন, যাত্রীদের ওঠানামার গোল বারান্দা, ট্রাম চলার সময়কার ওপর-নীচে ও দুপাশে অসম্ভব দুলুনি, দুপুরের যাত্রীহীন নিঃসঙ্গ ট্রাম, কিছুকালের জন্য অন্তত ট্রামের 'এয়ার-হর্ণ', শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত দোতলার ছাদহীন প্রাইভেট বাস, বাসের শিখকর্মীদের পাজামা না পরে হাঁটু পর্যন্ত কুর্তা নামিয়ে দেওয়া, বড় বড় চৌরাস্তার মোড়ে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি বলতে হুড খোলা ফোর্ড গাড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়তে পড়তে মনে হয়, এ নিয়ে তো আরো লেখা যেত, আরো রসিয়ে জমিয়ে ভালো লেখা সম্ভব ছিল। শুধু দূর অতীতের নয়, অনতিদূর অতীতের গল্পও আমরা শুনতে চাই কলকাতাকে ঘিরে।

আজ ভোরে ছিঁড়ে ফেলি সংবাদপত্রের ঘোর ছায়া

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

'অজ্ঞাতবাস', মে ৮৬। কলকাতা ৩২। ১৩পৃ।

বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক লেখাটি থেকে ১· "সমরেশ মজুমদার অকাদেমি পাচ্ছে। যে কোনো সাধারণ হৃদয়বান পাঠকের মতো আমার পক্ষেও তা সহ্য করা কঠিন।" ২· "আমাদের ভাষায় লেখালেখি বিশেষত উপন্যাস ও প্রবন্ধকে দেশানন্দবাজার প্রধানত শেষ করে দিয়েছে ও দিয়ে চলেছে। এই বাক্যটি এর চেয়ে সামান্যতম অস্পষ্ট করে বলার সুযোগও আর নেই, বরং উল্টোটা করার জন্য আমি আজ যে-কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি আছি কারণ সামগ্রিক ভাবভাবনায় সাহিত্যেরই চারপাশে নিরন্তর ঘোরা এক সামান্য বাঙালি হিশেবেও মর্মে মর্মে আজ আমি টের পাই এমনকী ব্যক্তিগত এক ভয়াবহ বিপন্নতা।" ৩· "আমাদের ভাষার সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, কোনো প্রকাশনা সংস্থা

সাহিত্য ছাপার নেতৃত্বে নেই, আছে খবরের কাগজ।...এখানে প্রথমেই বাণিজ্যিক বাড়িগুলি একজন লেখকের লেখার তাগিদের যে নিজস্ব কাঠামো সেটা ভেঙে দিয়েছে, গুলিয়ে দিয়েছে, এবং লেখকের মাথা থেকে এ বিষয়ে সতর্কতার যে ঘিলুটা সেটা টেনে বার করে এনেছে।" ৪· "সাহিত্যকে ক্রমাগত গুরুত্বহীন, ভাবনাহীন, পার্থক্যহীন করে তোলা হচ্ছে। এবং যতই সে ওইরকম হয়ে উঠবে তত লাভ, ততই দায়হীন স্বস্তি।... আমাদের সমালোচনা সাহিত্য অত্যন্ত systematically গড়ে উঠতে দেওয়া হয় নি। উঠলেই তো সমস্যা। মুড়ি ও মিছরির দর এক কেন এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হবে। তাহলেই সমস্যা। পাঠকের রুচি গড়ে উঠবে।" এইরকম আরো অনেক উদ্ধারযোগ্য উক্তি আছে এই প্রবন্ধে। লিটল ম্যাগাজিন ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা : এই বিষয় নিয়ে আমরা তো বহু উত্তপ্ত আলোচনাই পড়ে থাকি—তার সৎ আবেগ আমাদের স্পর্শও করে। আবার যুক্তির ফাঁকিটাও টের পাই। কিন্তু আলোচ্য লেখাটিকে সেই দলে ফেলা চলবে না—শুধু সুলিখিত গদ্যে লেখা বলেই নয়, এখানে যে বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধান আছে তা অনেক গভীরতর ভাবনার পরিচায়ক।

প্রসঙ্গ : এপিটাফ

দেবকুমার ঘোষ

'পাণ্ডু', জুন ৮৬। মহানাদ, হুগলি। ৪ পৃ।

'পাণ্ডু' খুবই পাতলা, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার "কবিতা ও কবিতা আলোচনার পত্রিকা"। মোট দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে—দুটিতেই প্রধান বিষয় হল একটি করে কবিতা নিয়ে সে-সম্পর্কে কয়েকজনের আলোচনা। অনেকের হয়ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী-র 'কবিতা-পরিচয়'-এর কথা মনে পড়ে যাবে। সেরকমই সংবেদনশীল উপকারী পাঠ এবং উদ্ভট কষ্টকল্পিত পাঠের পাশাপাশি সহাবস্থান। 'পাণ্ডু'-র ১ম সংখ্যায় ছিল শঙ্খ ঘোষের 'খড়' কবিতাটি নিয়ে চারজনের আলোচনা। আলোচ্য সংখ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'এপিটাফ' নিয়ে তিনজনের। দেবকুমারবাবু দুটি কবিতা নিয়েই নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের উন্মোচনে স্বাধীন ও বিপজ্জনক আবিষ্কারও অল্পবিস্তর। তবু, সব মিলিয়ে তাঁর লেখা এবং 'পাণ্ডু' পত্রিকাটির প্রয়াস প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই।

> শৈলজারঞ্জনের শিক্ষণে "বাণীর উচ্চারণে" যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় না—এই কি সত্যিই অভিজ্ঞতালব্ধ, না বহুলালিত ও বহুপরিচিত কিংবদন্তি মাত্র ?

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী

পার্থ বসু

'দেশ', ১৯ জুলাই ৮৬। কলকাতা ১। ৫ পৃ।

রবীন্দ্রনাথ বয়সকালে কীরকম গাইতেন, তার কিছুটা কাল্পনিক এবং কিছুটা তথ্যনির্ভর ধারণার উপর ভিত্তি করে লেখক রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং এর ভেতর কোনটি রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া বা তাঁর অভিপ্রায়ের কাছাকাছি তা নিয়ে একটা কঠোর ও অতিনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। "কণ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে উন্মোচিত করে" গাওয়া, "বাণীর উচ্চারণে"র স্পষ্টতা, "তালের মাত্রাভাগে"র প্রকাশ্যতা ইত্যাদিই রাবীন্দ্রিক "গায়নভঙ্গি" এবং—তাঁর চর্চা হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ, অমিতা সেন, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে সুচিত্রা মিত্র বা পূর্বা দামে। এর মধ্যে দুষ্টগ্রহের মতো প্রবেশ করেছে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সুরনির্ভর, অর্থাৎ কথা বা বাণীর প্রতি উদাসীন ঘরানা বা গায়কী। এবং সেটাই গ্রাস করে ফেলেছে, রবীন্দ্রসংগীতের জগৎ। কেননা কণিকা বা নীলিমা বা সুবিনয় প্রভৃতি স্বনামধন্যরা তো এই ঘরানারই শিল্পী। এই হচ্ছে লেখকের প্রতিপাদ্য। তিনি বলেছেন, "বিষাদের সঙ্গে লক্ষ করা গিয়েছে, শৈলজারঞ্জন এবং তাঁর গায়কী-বদ্ধ শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর উচ্চারণে যথেষ্ট যত্নশীল নন।" একে তিনি নাম দিয়েছেন "শুদ্ধ সুরের চর্চা"। এসব কথা পড়ে আশ্চর্যই হতে হয়। কণিকা বা নীলিমা বা এই ধারার আরো অনেকেরই গানে "বাণীর মহিমা ক্ষুণ্ণ" একথা বলা কি বাতুলতা নয় ? প্রবন্ধটি, তখন মনে হয়, চিন্তার সরলীকরণ-দোষের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শৈলজারঞ্জনের শিক্ষণে "বাণীর উচ্চারণে যথেষ্ট যত্ন" নেওয়া হয় না—এটা কি সত্যিই অভিজ্ঞতালব্ধ, না বহুলালিত ও বহুপরিচিত কিংবদন্তি মাত্র ? অবশ্য পার্থবাবুর এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত শিল্পীরা মার্জনা পেয়ে যান, কারণ ব্রাহ্মসমাজ-চর্চিত "ধর্মজীবনের অঙ্গরূপে" গড়ে-ওঠা গায়কীর সঙ্গে নাকি রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের গানের গায়কীর "খুব পার্থক্য নেই"। প্রমাণ দেবব্রত বিশ্বাস। এবং সেই কারণেই বোধ হয় ক্ষমার্হ সুবিনয় রায়। তবে কি ব্রাহ্ম-শুচিবায়ুগ্রস্ততারও নমুনা এই প্রবন্ধ ?

ভারতীয় ফুটবল

অতল অন্ধকার থেকে আলোর পথে ?

তলাতে তলাতে একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল ভারতীয় ফুটবল। অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে একসময় সংশ্লিষ্ট সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে আপাতত বেশ কিছু দিন ভারতীয় ফুটবল দলকে সরিয়ে রাখা উচিত কি না। কারণ গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতীয় দলের খেলার মান ক্রমাগত অবনতির দিকে এগিয়েছে। বিরাশির এশিয়াডে যে দলটি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল সেই ভারতীয় ফুটবল দল তারপর থেকে এক এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগীতায় ভালো ফল করতে পারে নি। তিরাশি থেকে ছিয়াশি মোট চারটি নেহরু গোল্ডকাপের খেলা থেকে ভারত একটিও জয় সংগ্রহ করতে পারে নি। প্রি-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকেও বিদায় নিয়েছে এশিয়ার দুর্বল প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দলগুলির কাছে হেরে। এমন কি প্রি-ওয়ার্ল্ডকাপের খেলাগুলিতেও ভারত প্রাথমিক রাউন্ডের গণ্ডি পেরোতে পারে নি বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ডের বাধা টপকে।

গত চারবছরে ভারতীয় ফুটবল দলের যা কিছু সাফল্য তা এসেছিল যুগোশ্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের আমলে। তারই প্রশিক্ষণে ভারত এশিয়ান কাপে প্রাথমিক রাউন্ডের গণ্ডি পেরিয়ে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সেখানেও ভারতের ফলাফল খুব একটা আহামরি কিছু নয়। শক্তিশালী চীনের সঙ্গে ড্র করলেও

ভারত হেরেছিল তথাকথিত দুর্বল সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর কাছে। মিলোভানের আগে এবং পরে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে এসেছেন এবং গেছেন একাধিক কোচ। কিন্তু ভারতীয় দলের রাহুমুক্তি ঘটে নি

এরপর গতবছর ১৮ মে বাঙ্গালোরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভায় পি· কে· ব্যানার্জিকে ছিয়াশির এশিয়াড অবধি ভারতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রহিম সাহেবের পর সবচেয়ে সফল ভারতীয় কোচ 'পি·কে'। তার তত্ত্বাবধানে কোচিং ক্যাম্প শুরু হয় গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথমে কলকাতা, দিল্লি ও বাঙ্গালোরে তিনটি কোচিং ক্যাম্প খুলে খেলোয়াড়দের তালিম দেওয়া হয়। এই তিনটি শিবির থেকে বাছাই করা খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল ছিয়াশির নেহরু গোল্ডকাপে খেলে। পাঁচটি খেলায় মোট ১৭টি গোল খায়। অবশ্য সেবারের ভারতীয় দলে ভারতের প্রথম দলের সাত-আটজন খেলোয়াড় ছিলেন না। তারা তখন শ্রীলঙ্কায় এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় ব্যস্ত। কিন্তু চার মাস প্রশিক্ষণের পর ঐরকম হৃদয়বিদারক ফলাফল ভারতীয় ফুটবলকে কয়েক শ মাইল পিছিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ওঠে এর পরেও ভারতীয় ফুটবল দলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত কি না। কারণ বিদেশে দল পাঠানো মানেই একগাদা বিদেশী মুদ্রার অপচয়, সাথে সাথে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা। এবং সবদিক ভেবে চিন্তে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা রায় দেন যে আগামী এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের যাবার দরকার নেই। এ ব্যাপারে তাদের গাইড লাইন ছিল গত এশিয়াডে ষষ্ঠ স্থানাধিকারীরাই এবারের এশিয়াডে যেতে পারবে। যেহেতু ভারত ছিল গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিষ্ট তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে তাদের স্থান ছিল পাঁচ থেকে আটের মধ্যে। এ· আই· এফ· এফ·, ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক, ব্যাপারটাকে মেনে নেন নি। পরে ঠিক হয় যে ভারতীয় দলের রাশিয়া সফরের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে এশিয়াডে যাওয়া। কিন্তু রাশিয়ান দ্বিতীয় সারির ক্লাব দলের কাছে ভারত চারটি ম্যাচে ১৭টি গোল খায়। গোল করে মাত্র দুটি। সঙ্গত কারণেই ভারতীয় দলটির ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেবার কোনো কারণ ঘটে না।

ইতিমধ্যে ভারত ত্রিশতম মারডেকা প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণ পায়। ঠিক হয় মারডেকায় সেমিফাইনালে না উঠতে পারলে এশিয়াডে যাবার ব্যাপারটার ওখানেই ইতি।

অত্যন্ত হতাশজনক ভাবে শুরু করে ভারত। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ১-১ ড্র করার পর মালেশিয়ার কাছে ০-৩ গোলে হার। আপাতত আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ভারতের 'বনবাস' যখন প্রায় নিশ্চিত তখনই হঠাৎ জ্বলে ওঠে ভারত। দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-৩ এবং

বিকাশ পাঁজি

অতনু ভট্টাচার্য

কৃশানু দে

থাইল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে যাবার পাথেয় জোগাড় করে নেয় ১৯৮১ তে এই মারডেকারই সেমিফাইনালে ওঠার পর এই প্রথম ভারত কোনো প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠল। সেমিফাইনালে অবশ্য ভারত অতিরিক্ত সময়ে একটি গোল খেয়ে হারে চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে। হারলেও ভারতের খেলায় প্রশংসা করেন সবাই। বীরের মর্যাদায় মাঠ ছাড়ে ভারতীয় দল।

বহুদিন পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারত খানিকটা সম্মানজনক ফল করল।

ভারতীয় দলের এই জ্বলে ওঠার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ পেতে পারেন প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জি। বিশেষ করে এমন একটি পরিস্থিতিতে ভারত এবার মারডেকায় খেলতে গিয়েছিল যখন তাদের পক্ষে বলার মতো কিছুই ছিল না। ফুটবল প্রেমী মানুষ তাদের ওপর এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে প্রতিযোগিতার আগে কলকাতার মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত একটি প্রীতি ম্যাচে ভারতীয় ফুটবল দলের ওপর বর্ষিত হয় অজস্র বিদ্রুপ এবং কুৎসিত গালিগালাজ। ভারতীয় ফুটবল দলের অস্তিত্বই যখন বিলুপ্ত হবার পথে তখন মোটামুটি ভালো খেলায় প্রদীপ ব্যানার্জি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "ছেলেদের বলেছিলাম, এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। মরার আগে তোমরা অন্তত একবার প্রমাণ করে যাও যে তোমরা ফুটবল খেলা জানো। না হলে ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করবে না। রাস্তাঘাটে, অফিস কাছারিতে, আনন্দ অনুষ্ঠানে লোকে তোমাদের দিকে আঙুল তুলে বলবে ঐ ওদের জন্য ভারতীয় ফুটবল আজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা ভারতীয় ফুটবলকে খুন করেছে। এই অপমান, লজ্জা, গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাবার এই শেষ সুযোগ। আমি খুশি, ছেলেরা আমার কথার মূল্য দিয়েছে। ওরা প্রাণপণ লড়াই করেছে ; পরপর দুটো ম্যাচে ভালো খেলেও ঈপ্সিত ফল না পেয়ে ওরা ভেঙে পড়ে নি। দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বপ্নের ফুটবল খেলেছে। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারিয়ে ফাইনালেও যেতে পারতাম। তবে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে অনুতাপ করে লাভ নেই। সামনের লড়াই আরও কঠিন। ছেলেদের বলেছি, তোমরা পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেয়েছ শুধু। পাস করতে হলে আরও ভালো ফল করতে হবে।"

এই সাফল্যের জন্য দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের প্রশংসা করলেন পি· কে। তবে আলাদা ভাবে নাম করলেন কৃশানু দে, কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সত্যেনের। বললেন, "চিন্তা করতে পারবে না থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার শুরুতেই মাথা ফেটে গেলেও স্টিচ না করে কি খেলেছে কৃষ্ণেন্দু। এই দৃষ্টান্তে গোটা দলটাই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। অসাধারণ ফুটবল খেলেছে সত্যেন। রক্ষণভাগে তরুণের পাশে যখন একটা ভাল স্টপার দরকার তখন মাঝমাঠ থেকে সুদীপ চ্যাটার্জিকে তুলে স্টপারে খেলানোর সময় আমার মনে একটা দ্বিধা ছিল যে তাহলে মাঝমাঠ দুর্বল না হয়ে যায়। কিন্তু মাঝমাঠে দীর্ঘদেহী সত্যেন আমাকে সব ভাবনা চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করেছে। মাঝমাঠে কি করে নি ও। স্ন্যাচিং, ট্যাকলিং, ড্রিবলিং তো করেইছে, থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোটা পঞ্চাশ হেড নিয়েছে। বহুদিন পর ভারতীয় দলে এত ভালো একজন মিডফিল্ডার এল। সত্যেন অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলায় প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং মরিসিও আলফানসোর পক্ষে আক্রমণে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে গেছে।"

'আর কৃশানু' পি· কে বললেন, 'তোমরা কলকাতা মাঠে কৃশানুকে দেখেছ একই সঙ্গে তিন চার জনকে কাটাতে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলে কৃশানু সেরকম সাফল্য পায় নি। এবার ও প্রামণ করল আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ও সমান দক্ষ। একটা টুর্ণামেন্টে পাঁচটা গোল, তাও একটা হ্যাট্রিক সহ যে কোনো মানেই বড় পারফরমেন্স'।

অতএব ভারতীয় দল এশিয়াডে যাচ্ছে। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা যদি রাহাখরচ নাও জোগায় তবে নিজেদের পয়সাতেই যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এশিয়াডে ভারতের সম্ভাবনা কতটুকু ? পি· কে যতই বলুন না কেন মারডেকায় এবারের দলগুলি খুব একটা উঁচু মানের ছিল না—মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া তাদের জাতীয় দল পাঠালেও দক্ষিণকোরিয়া, চীন বা জাপান পূর্ণ শক্তি নিয়ে আসে নি। তাছাড়া এশিয়াডে ভালো ফল করার জন্য ভারতকে মধ্য প্রাচ্যের দলগুলিকে হারাতে হবে। ইরাক, কাতার, কুয়েত বা সৌদি আরবের চেয়ে ভারতীয় দল যে এখনও অনেক পেছিয়ে সেটা সকলের জানা। তবে এবারের আসরে দেখা গেছে যে শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে ভারতীয় দল এখন অনেক উন্নত। একই গতিতে ৯০ মিনিট বা প্রয়োজনে ১২০ মিনিট খেলার কথা আমরা এই সেদিনও ভাবতে পারি নি। এর জন্য অবশ্য সব কৃতিত্ব ভারতীয় দলের ফিজিকাল ইনস্ট্রাকটর দর্শন কুমার ট্যান্ডনের। ট্যান্ডনের প্রশিক্ষণ পুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জিতেছিল। ভারতীয় ফুটবল দলকেও তিনি একটা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছে দিয়েছেন।

ভারতীয় ফুটবলের ওপর থেকে হতাশার কালো মেঘ আবার সরে গিয়ে আলোর সঙ্কেত দেখা দিচ্ছে। তবে সে আলো কতটা জোরালো তা প্রমাণ হবে আগামী সিওল এশিয়াডে।

দীপঙ্কর মাইতি

উত্তরবঙ্গে টিভি

ছয় বনাম আট

১৯৮২ সাল। স্পেনে তখন বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা চলছে, জলপাইগুড়ি শহরের একরাশ তরুণ যুবক মাঝরাতে সেদিন ছুটে গিয়েছিলেন স্থানীয় পাওয়ার হাউসে। তছনছ করে দিয়েছিলেন অফিস-ঘর। কারণ? মাঝরাতে শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিদ্যুৎ থাকলেও বেশির ভাগ অংশই ছিল নিস্প্রদীপ। আর সেদিনই ছিল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল পর্যায়ের শ্বাসরুদ্ধ করা খেলা। বিদ্যুতের অভাবে সেদিন শহরের অধিকাংশ টেলিভিশনের পর্দাই ছিল ধবধবে শাদা। কিন্তু মজার কথা এই যে উত্তরবঙ্গের কোথাও তখনও দূরদর্শন কেন্দ্র বসে নি। হ্যাঁ, এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা সবই সেদিন জুটেছিল বাংলাদেশ টিভির সৌজন্যে।

আর একটু এগিয়ে আসি। সে বছরেই ছিল দিল্লিতে নবম এশিয়ান গেমস্। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং তার পরবর্তী প্রতিযোগিতার চাক্ষুষ উপলব্ধির জন্য উত্তরবঙ্গবাসীকে আবার নির্ভরশীল হতে হয়েছে বাংলাদেশের বদান্যতার ওপরে। অবশ্য ঠিক সেই সময়ই মালদায় স্থানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কল্যাণে খুব ছোটমাপের একটি রিলে সেন্টার বসেছে।
অবশ্য পাহাড়ী এলাকা বাদ দিলে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই টেলিভিশনের আমদানি ঘটেছে আশীর দশকের গোড়ার দিকে। আর উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী টিভি কেন্দ্রের স্থাপন হয়েছে তার অন্তত বছর পাঁচেক বাদে কার্শিয়াঙে যার দায়িত্ব দিল্লি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান রিলে করা।
এরকম একটা পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই আমাদের দেশীয় দূরদর্শনের অনুষ্ঠান এ অঞ্চলের দর্শকদের কাছে অপেক্ষাকৃত নতুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন তোলা যায় কোন অনুষ্ঠান এখানকার লোক বেশি দেখেন তাহলে খুব সাধারণভাবে এর উত্তর দাঁড়ায় ছয় নম্বর চ্যানেলের প্রোগ্রাম—অর্থাৎ বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের টিভি প্রচারের কথা খেয়াল রেখেই তাই কার্শিয়াঙ কেন্দ্র প্রথম প্রথম ছয় নম্বর চ্যানেলেই অনুষ্ঠান প্রচার করা শুরু করে। কিন্তু এতে দেখা গেল এক উল্টো সমস্যা। দুই অনুষ্ঠান জট পাকিয়ে এক বিশ্রী জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হল। পর্দায় হয়ত বাংলাদেশি ছবি আর কথা বেরুচ্ছে দিল্লি টিভির কুশীলবদের। পর্দায় ভাষণ দিচ্ছেন জেনারেল এরশাদ আর বুলি যোগাচ্ছেন জ্ঞানী জৈল সিং। এরকম একটা অবস্থা নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য। তাই নিরুপায় হয়েই হিশেব পাল্টাতে হল। কার্শিয়াঙ রিলে করা শুরু করল আট নম্বর চ্যানেলে। অর্থাৎ এ অঞ্চলের দর্শকদের হাতে রইল দুটো অনুষ্ঠানের মধ্যে বেছে নেওয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। আর এ স্বাধীনতা উপভোগ করতে গিয়ে সাধারণ দর্শক বেছে নিলেন ছয় নম্বর চ্যানেলকেই।
কিন্তু কেন?
শ্রীহরিনাথ পোদ্দার, অঙ্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী, বাড়ি কুচবিহারের রেলওয়ে কলোনিতে। তাঁকে এ প্রশ্ন করতেই তিনি জানালেন, 'দেখুন, কুচবিহারে কার্শিয়াঙ আর বাংলাদেশ দুটো কেন্দ্রের অনুষ্ঠানই পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ছবি অপেক্ষাকৃত ভালো আসে, এমনকি বুস্টার ছাড়াই। আর বোঝেনই তো, দশ বছর আগে হোক বা পরে হোক আমরা অনেকেই এসেছি বাংলাদেশ থেকেই। কাজেই একদিকে দেশের টান আর একদিকে ভাষার টান—এই দুইয়ে মিলে আমাদের তো বাংলাদেশের অনুষ্ঠানই দেখতে ভালো লাগে। আর তাছাড়া বাংলাদেশের প্রোগ্রামের মানও অনেক ভালো। ওদের খবরে এ বিশ্বপৃথিবীর বহু বৃত্তান্ত স্বচক্ষে দেখা যায়। কাজেই আপনিই বলুন না বাংলাদেশের অনুষ্ঠান ছেড়ে কেন কার্শিয়াঙ-এর প্রোগ্রাম দেখব? আর তাও যদি কার্শিয়াঙে নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান থাকত একটা কথা ছিল। রাতদিন হিন্দি আর হিন্দি কাঁহাতক ভালো লাগে। কই? আমরা তো বাংলাদেশের রেডিও

রবীন্দ্রনাথের গল্প 'রবিবার' নিয়ে মৃণাল সেনের টিভি ফিল্ম

ফটো : সোমনাথ সেনগুপ্ত

শুনিনা—শিলিগুড়িই শুনি ?' একই কথার সুর টেনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ মানস দাসগুপ্ত বললেন, আরে বাবা কার্শিয়াঙের হিন্দি প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। আমার এদিকে বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ভালো দেখা যায় না তাই বাধ্য হয়ে কার্শিয়াঙই খুলতে হয়। তোমরা জাতীয় সংহতির কথা বল। এভাবে জোর করে হিন্দি চাপালে সংহতি কি থাকবে না আসলে নষ্ট হবে ? জলপাইগুড়ি শহরের অবস্থাটা একটু অন্যরকম। শহরের বেশির ভাগ বাড়িতেই যেখানে টিভি আছে দেখা যায় দুটো করে অ্যান্টেনা লাগানো। একটা বাংলাদেশের জন্য আর একটা কার্শিয়াঙের জন্য। সেদিন কদমতলা থেকে নতুনপাড়া, তেলিপাড়া হয়ে স্টেশন আসতে আসতে চোখে পড়ল প্রায় শখানেক বাড়িতে অ্যান্টেনা লাগানো। তার মধ্যে প্রায় ৮০টি বাড়িতেই দুটো করে। আর বাদ বাকি খান কুড়ি বাড়িতে একখানা করে। আর মজার ব্যাপার সেগুলো লাগানো রয়েছে বাংলাদেশের দিকে মুখ করে। স্থানীয় এক টেলিভিশন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এরকম ডবল ব্যবস্থা করতে খরচ প্রায় শছয়েক টাকা বেশি লাগে। দুটো অ্যান্টেনা, দুটো বুস্টার, দুটো পাইপ, তার জন্য একটা চেঞ্জওভার সুইচ, দ্বিগুণ তার সবই লাগছে। তবুও লোকে তা কিনছেন। একবারে না পারলেও দুই তিন মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় অ্যান্টেনা লাগিয়ে নিচ্ছেন প্রায় প্রত্যেকেই।

সম্প্রতি দিনহাটা কলেজে জয়েন করেছেন তরুণ অধ্যাপক সাধন কর। সাধন দিনহাটারই ছেলে। দিনহাটার সঙ্গেই ওঁর নাড়ির টান। ওঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম আপনি বা আপনার শহরের লোকজন কোন চ্যানেলের অনুষ্ঠান বেশি দেখেন, ছয় না আট। সাধন কোনো রকম সংশয় না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কেন ? ছয় নম্বরের বাংলাদেশ।' কারণ জিজ্ঞেস করতেই বললেন প্রথমত বাংলাদেশের অনুষ্ঠান অনেক বেশি ঝকঝকে, দ্বিতীয়ত ওরা বেশ কিছু ভালো ইংরেজি ছবি দেখায় আর তৃতীয়ত ওদের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই বাংলা ভাষায় হয়। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ইংরেজি ছবি ভালো লাগছে আবার বাংলা অনুষ্ঠানও অনেক বেশি প্রিয়, স্রেফ ভাষার কারণে ; এদুটো আদৌ একসঙ্গে যুক্তিযুক্ত কিনা। তা বলে এ কখনোই বলা হচ্ছে না যে দিল্লি দূরদর্শনের প্রচারিত সমস্ত অনুষ্ঠানই খারাপ। কিংবা বাংলাদেশ টিভির সমস্ত অনুষ্ঠানই ভালো। 'বুনিয়াদ' বা 'নুক্কড়'-এর মতো ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের দর্শক কিন্তু কম নেই। 'কথাসাগর' অনুষ্ঠানে আরো ভালো ভালো গল্পের চিত্ররূপ দেখতে আগ্রহী অনেকেই। কিন্তু হাজার হলেও নিজস্ব ভাষার টান কজনের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ?

দিনকয়েক আগে মহারাষ্ট্রের সবগুলি দূরদর্শন কেন্দ্রকে (যেগুলি এতদিন দিল্লির অনুষ্ঠান রিলে করত) বোম্বাই দূরদর্শন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কখনই বলছি না কেন ওখানে করা হল। কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চল হিশেবে স্বভাবতই পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে একটু বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। ভুললে চলবে না একমাত্র এই কারণেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইলেকট্রনিক্স শিল্পকেন্দ্র বসাতে কেন্দ্রীয় সরকার সায় দেন নি। শোনা গেছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইনস্যাট ১ সি-এর মাধ্যমে এ রাজ্যেও মহারাষ্ট্রের মতো কিছু করার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু শুভস্য শীঘ্রম। এর মধ্যেই প্রচুর দেরি হয়ে গেছে। কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা অঞ্চলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভারতের প্রেসিডেন্ট কে জিজ্ঞেস করলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেন মহম্মদ এরশাদ।

উত্তরবঙ্গের প্রথম টিভি কেন্দ্র স্থাপিত হয় মালদায় ১৯৮২ সনে। খুবই ছোটমাপের এই কেন্দ্রটি বসানো হয়েছিল সে সময়ের স্থানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্বাচনী কেন্দ্রের অধিবাসীদের এশিয়ান গেমস দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এরপর বালুরঘাটে আর একটি ছোটমাপের এবং শেষমেষ ১৯৮৫ সালের ৩১ জানুয়ারি কার্শিয়াঙে একটি ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রিলে সেন্টার বসানো হয়। অবশ্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্শিয়াঙ কেন্দ্রের ক্ষমতা ১০ কিলোওয়াট হওয়ার কথা। তবে অতি সম্প্রতি কেন্দ্রের একজন অফিসার এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে জিনিশপত্র সবই এসে গেছে, ফলে যে কোনো দিনই এর ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে। এখনই এই কেন্দ্রের যা ক্ষমতা তাতে কার্শিয়াঙ থেকে ১৪০ কিলোমিটার (এরিয়াল ডিস্ট্যান্স) দূরে কুচবিহার শহরে বুস্টারের মাধ্যমে ৮ নম্বর চ্যানেলের প্রচারিত অনুষ্ঠান ধরা যায়। ক্ষমতা বেড়ে দশ কিলোওয়াট হলে এর প্রচারের পরিসীমা আশা করা যায় আরো বাড়বে। এইমতো একটা পরিস্থিতিতে দিনকয়েক আগে জানা গেল আলিপুরদুয়ার শহরে আর একটি ছোট মাপের রিলে সেন্টার তৈরি করার জন্য জমির অধিগ্রহণ হয়েছে আলিপুরদুয়ার কলেজের গার্লস হোস্টেলের পাশের মাঠে। হতে পারে ছোট কেন্দ্র। কিন্তু তার পেছনেও তো কিছু খরচ রয়েছে। এই অপচয় করার অর্থ কী ? এখনই আলিপুরদুয়ারে কার্শিয়াঙের সম্প্রচার ধরা যাচ্ছে। ক্ষমতা বেড়ে ১০ কিলোওয়াট হলে তো আর কোনো অসুবিধেই থাকবে না। এর মধ্যেই শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্রের চত্বরেই একটি ছোট টিভি রিলে সেন্টারের জন্য টাওয়ার তৈরি হয়ে আছে। বেতার কেন্দ্রের বাড়িতে সেজন্য দুটো ঘরও নেওয়া হয়েছিল। বেশ কতগুলো কারণে সে রিলে সেন্টার আর হয় নি। যাবতীয় মেশিনপত্র চলে গেছে

গোবিন্দ নিহালনির 'তামস'-এ ওম পুরী

আরেক জায়গায়। কেবল টাওয়ারটি মাথা উঁচু করে আকাশছোঁয়া অপচয়ের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে।
মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আগে যখন শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র ঘুরে গেলেন তখন নিশ্চয়ই দেখেছেন কেন্দ্রের স্টুডিও ফেসিলিটি কত খারাপ, প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীসংখ্যা কত কম। ফলে বেতারে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মানও কমতে শুরু করেছে। ফলে দূরদর্শনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার বদলে বেতার অনুষ্ঠান ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এরই সঙ্গে যদি ছয় আর আটের লড়াইয়ে আট কেবলই পিছোতে থাকে তাহলে তা নিয়ে চিন্তার সময় কি এখনও আসে নি ?

মিলিন্দ চক্রবর্তী

বেঁচে থাকা, বেঁচে ওঠার স্বাদ

দূরদর্শনের কল্পনাহীন, বিদেশ-থেকে-ধার-করা ধারাবাহিক সিরিয়ালের সাপ্তাহিক ক্লান্তির মাঝে মাঝে এমন কিছু অনুষ্ঠান আছে, যেগুলো দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকতে হয়। সেগুলো সবই বিদেশী প্রোগ্রাম, কিন্তু ভারতীয় দূরদর্শনের জাতীয় চ্যানেলে দেখাবার জন্য প্রশংসার সবটুকুই দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের পাওয়া উচিত। আগে মার্কিনি ও বৃটিশ কিছু বস্তাপচা সিরিয়াল আনা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি যে কটি বিদেশী সিরিয়াল দেখেছি আমরা, তা আমাদের মনকে পৃথিবীর সৃষ্টির আনন্দে রোমাঞ্চিত করে।
'সিক্রেটস অব দ্য সী', 'সারভাইভাল', 'বডি ইন কোয়েশ্চেন', 'দ্য লিভিং প্ল্যানেট', 'এক্সপিডিশন টু দ্য অ্যানিম্যাল কিংডম', 'কসমস'—এই সমস্ত অনুষ্ঠানই পৃথিবীকে, মানুষকে, জীবনকে, বেঁচে-থাকার নানা সংগ্রামকে, ব্রহ্মাণ্ডকে নতুন মাত্রায় আমাদের সামনে এনে দেয়।
সদ্যসমাপ্ত 'বডি ইন কোয়েশ্চেন' মানবশরীরের বিস্ময়কর রহস্য উন্মোচিত করছিল আমাদের সামনে, ক্যামেরা নিয়ে মানুষের শরীরেই ঢুকে পড়া যেন, রক্তের স্রোতময় আবর্তে ডিঙা বাইতে বাইতে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলীর সমস্ত ঘাট ছুঁয়ে এক অন্তর্গত জগৎ আবিষ্কার। কার্ল সেগানের 'কসমস' সিরিজে একটু তথাকথিত মার্কিনি বাণিজ্যিক মানসিকতা থাকলেও মহাকাশের ব্যাপ্তি আর তারই প্রসঙ্গে এই সৌরজগতের একমাত্র জীবন্ত গ্রহ পৃথিবীর সাযুজ্যে যেন অসীমকে বোঝা যায় খানিকটা। আর সেই জীবনের স্পন্দনে বাঙ্ময় এই পৃথিবীর জলের গভীরে, মরুভূমিতে, প্রকৃতিতে, অরণ্যে সদা জায়মান যে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, 'সিক্রেটস অব দ্য সী', 'সারভাইভাল', 'দ্য লিভিং প্ল্যানেট', 'এক্সপিডিশন টু দ্য অ্যানিম্যাল কিংডম'-এ তার আভাস পাওয়া যায়। 'এক্সপিডিশন' ছাড়া অধিকাংশ সিরিজই হয় শেষ হয়ে গেছে, নয়ত শেষ হবার মুখে। এর ভেতর সব চাইতে আকর্ষণীয় বোধ হয় প্রফেশর খুশটো-র 'সিক্রেটস অব দ্য সী'। কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে, কখনও মেরুদেশের বরফগলা জলের নীচে, কখনও আফ্রিকার ঘন বনের নদীতে নদীতে তিমি, পেঙ্গুইন, জলহস্তী বা স্যালমন মাছের বেঁচে-থাকার, বেঁচে-ওঠার মৃত্যু লড়াই আমাদের চমকে দেয়। কোনো কোনো দৃশ্য কবিতার মতো স্পন্দময়—যেমন 'পেঙ্গুইন' এপিসোডে ঐ আশ্চর্য প্রাণীদের জলখেলার দৃশ্য, স্লো-মোশনে তাদের জলে ডোবা, আবার ভেসে ওঠার ভঙ্গিমা এক নৃত্যময় কোরিওগ্রাফির আভাস আনে। স্যালমন মাছের সমুদ্র থেকে জন্মস্থানে ফিরে যাবার শারীরিক যুদ্ধ, ডলফিনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়ানো অসংখ্য মাছের সমুদ্রজোড়া উচ্ছ্বাস, কিলার হোয়েলের গান আর সাংকেতিক কথাবার্তা—বিস্ময় থেকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক উপলব্ধি দেয়। এ সিরিজগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবলে বিষণ্ণ লাগে। তবে আশা থাকেই, মনকে সঞ্জীবিত করবার মতো এ-ধরনের সিরিয়াল ভারতীয় দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ আমাদের ভবিষ্যতেও দেখাবেন নিশ্চয়ই। □

সিদ্ধার্থ রায়

সিরিয়ালের জোয়ার

দুই

শ্যাম বেনেগাল তাঁর নতুন টিভি সিরিয়াল সম্বন্ধে বলেছেন, এটাকে ঠিক 'সোপ অপেরা' বলা যাবে না। টিভি-র অন্যান্য সিরিয়াল দেখার অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে এটা। তাঁর জনপ্রিয় সিরিয়াল **কথাসাগর** শেষ হলে শুরু হবে নতুনটা। নাম **যাত্রা**। ভারতীয় রেল-ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছেন তাঁর নতুন সিরিয়ালে। একটি বিশেষ ট্রেন পেয়েছেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কাছ থেকে—সেই ট্রেনের তিনটি কামরায় রয়েছে স্টুডিও এবং সুটিং-এর যাবতীয় ব্যবস্থা। কন্যাকুমারী থেকে যাত্রা করে জম্মু পর্যন্ত পৌঁছতে ট্রেনটার যে সময় লাগবে তার মধ্যে তিনি সিরিয়ালগুলো শেষ করে ফেলবেন।
'কিস্‌সা কুরসি কা' ছবিটা করে নাম করেছিলেন অমৃত নাহাটা। শ্রীনাহাটা এবার ছোট পর্দার ছবি করার কথা ভেবেছেন এবং বেছে নিয়েছেন প্রেমচাঁদের ১৩টি ছোটগল্প। সিরিয়ালটির নামকরণ করেছেন **প্রেমচাঁদ কি কাহানি**।
ধর্মীয় মহামানবদের জীবন নিয়ে অনেক পরিচালকই ছবি করার প্রয়াস পেয়েছেন। এবার কবিরের

'বুনিয়াদ'-এর দৃশ্য

জীবন নিয়ে অনিল চৌধুরী টিভির জন্য তৈরি করছেন একটা সিরিয়াল। নাম দিয়েছেন **কবির**। মজার ব্যাপার হল ১৩ খণ্ডের এই সিরিয়ালে নাম ভূমিকায় কোনো একজন ব্যক্তি অভিনয় করছেন না। প্রত্যেকটি খণ্ডে পৃথক পৃথক অভিনেতা নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন কবিরের বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত। কবিরের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করবে নিনা গুপ্তা।
কেতন আনন্দ ইংরেজিতে করছেন একটি নতুন ধরনের সিরিয়াল—**হায়ার দ্যান এভারেস্ট**
৫০-এর দশকে মেজর পি·এইচ·এস· আলুয়ালিয়ার হিমালয় অভিযান নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই সিরিয়াল। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'হায়ার দ্যান এভারেস্ট' থেকে এ ছবির জন্য রসদ সংগ্রহ করেছেন পরিচালক। আলুয়ালিয়ার চরিত্রে অভিনয় করছেন এম·কে· রায়না। এই সিরিয়াল প্রচলিত ২৩ মিনিটের ১৩টি এপিসোডের সিরিয়াল হবে না।
ইব্রাহিম আলকজির মেয়ে অমল অ্যালানা বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর সিরিয়ালের বিষয় হিশেবে। ছবির নাম **রাজ কে স্বরাজ**। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত চারটি বিখ্যাত মামলা নিয়ে তিনি ছবিগুলো করছেন।
এক-একটি ঐতিহাসিক মামলাকে তিনি চার খণ্ডে ভাগ করেছেন। গান্ধীজী, তিলক, ভগত সিং এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির মামলাগুলো নির্বাচন করেছেন, কারণ পরিচালকের মতে, "স্বাধীনতা যে কেবল অহিংস আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসে নি সেটা আমি বলতে চেয়েছি সিরিয়ালে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ পরাধীনতার প্রতিবাদ করেছেন বিভিন্ন আদর্শ নিয়ে।" প্রতিটি ২৫ মিনিটের এপিসোডে গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনুপম খের, সরোজিনী নাইডুর ভূমিকায় সুলভা দেশপাণ্ডে, প্যাটেল হয়েছেন মনোহর সিং আর তিলকের নাম ভূমিকায় আছেন সদাসিব অম্রপুরকার। সিরিয়ালটা শুরু হয়ে গেছে। এপর্যন্ত তিনটি এপিসোড দেখানো হয়েছে।

দূরদর্শক

ধ্রুপদী আঙ্গিকে সমকাল

নাটক
রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' । প্রযোজনা বহুরূপী । নাট্য সম্পাদনা ও নির্দেশনা : কুমার রায় । অ্যাকাডেমি মঞ্চ । ৬ জুলাই ৮৬

খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে পাঞ্জাব, দক্ষিণ আফ্রিকা, গোর্খ্যাল্যান্ড বা নিকারাগুয়া । রাজনীতি কখনো ধর্ম, ধর্ম কখনো রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথই বার বার জানিয়েছেন আমাদের যে ধর্মের নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ । বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন বিবর্তনের পথ ধরে মানুষ নাকি উদ্ভূত হয়েছে এক হিংস্র প্রজাতির বানর থেকে । মানুষের কৃতকর্মে ফুটে উঠছে ক্রমাগত তারই স্বাক্ষর । তবু তার মধ্যেও মানুষ বলেই 'মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' একথা ঘোষণা করে গেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী । তাই সাম্প্রদায়িক হিংসা, অর্থহীন ধর্মান্ধতা, স্টার-ওয়ারের শ্বাসরোধী ভীতি অতিক্রম করে যখন প্রযোজিত হয় এমন একটি নাটক যার জন্য নতুন করে আস্থা জেগে ওঠে মনুষ্যত্বের প্রতি, তখন সেই পাওনার পরিসীমা থাকে না কোনো । বহুরূপীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'মালিনী' তেমনি একটি প্রাপ্তি ।

'মালিনী' নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আঠারো শো ছিয়ানব্বই সালে । নাটক রচনা ও প্রযোজনার একটি ক্রান্তিলগ্নে তিনি পৌঁছেছিলেন তখন । তা সত্ত্বেও এ নাটক শুধু তখন কেন, তাঁর পরবর্তী সুদীর্ঘ জীবৎকালেও মঞ্চস্থ করেন নি তিনি । অথচ নিজেরই লেখা যে কোনো ধরনের নাটক প্রযোজিত না হলে শান্তি পেতেন না কবি এমন তথ্য তাঁর জীবনীতে রয়েছে । শোনা যায়, একমাত্র 'বাঁশরী'-তে নামভূমিকায় অভিনয়ে যোগ্য মহিলা পান নি বলে মঞ্চস্থ হয় নি সে-নাটকটি । 'রক্তকরবী'র নন্দিনীকেও ন.কি খুঁজে পান নি তিনি । কিন্তু 'মালিনী' সম্পর্কে এমন কথা সত্য হতে পারে না হয়ত । তবে কি 'মালিনী' লেখার পরে পরেই রবীন্দ্রনাথ নাট্যকর্মে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছিলেন ভিন্নতর উপলব্ধিতে, অন্যতর

'মালিনী নাটকের একটি দৃশ্য ফটো নিমাই ঘোষ

আঙ্গিকে ? অথবা, প্রযোজনার পক্ষে অস্বস্তিকর লেগেছিল তাঁর কাছে 'মালিনী'র সংক্ষিপ্তি ? প্রযোজনার ব্যাপারে 'মালিনী' নিয়ে কী ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রসঙ্গে হয়ত সে আলোচনা অবান্তর, কিন্তু এ নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে বহুরূপী যে মুখোমুখি হয়েছিলেন এ ধরনের সমস্যায় তার প্রমাণ রয়ে গেছে পরিচালক কুমার রায়ের পরিকল্পনায় । তাই নাটকটিকে তিনি দরকার মতো সাজিয়ে নিয়েছেন কখনো কখনো ভিন্নতর বিন্যাসে । শুদ্ধবাদীদের মধ্যে হয়ত এ নিয়ে দেখা দিতে পারে সংশয়, প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনায় এমন স্বাধীনতা নিতে পারেন কিনা পরিচালক, কিন্তু সব সন্দেহ ও বিতর্ককে অবহেলা করে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে প্রযোজনাটি ।

তাছাড়া নিজের নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো নিরন্তর পাল্টাতেন নিজেকেই । তাই মালিনীর সঙ্গে কথোপকথন করতে গিয়ে কাশ্যপ যখন পরিণত হন 'নটীর পূজা'র উপালিতে, তখন শুধু মানানসই নয়, অনিবার্যই হয়ে ওঠে তা । কিন্তু সে কথা পরে । আবহতে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী-'র যন্ত্রসংগীতে যখন শুরু হয় নাটক [সংগীত নির্দেশনা : অর্ঘ্য সেন] তখনই দর্শক খানিক প্রত্যাশা গড়ে নিতে পারেন, আভাস পান পরবর্তী মুহূর্তগুলোতে কী উপস্থাপিত হতে চলেছে তাঁর সামনে । তারপর মঞ্চে প্রবেশ করে উত্তেজিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে ক্ষেমংকর, তার সঙ্গে তর্ক বাঁধে সুপ্রিয়র । এবং তারপরই ব্রাহ্মণবৃন্দ নিয়ে ক্ষেমংকরের প্রস্থানের পর মঞ্চে-স্থিত একাকী সুপ্রিয় সূত্রধরের ভূমিকা নিয়ে

জানিয়ে দেয় দর্শকদের কোন নাটক অভিনীত হতে চলেছে এখন এবং কী উদ্দেশ্য এ নাটক প্রযোজনার । আর তখনই বুঝতে পারেন দর্শক যে এ ভাষণের মধ্য দিয়ে পরিচালক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চলেছেন ধ্রুপদী ভারতীয় নাটকের একটি দরকারি আঙ্গিকের সঙ্গে । লক্ষ করা যাচ্ছে সাম্প্রতিক প্রায় প্রতিটি প্রযোজনাতেই কুমার রায় বার বার শরণ নিচ্ছেন এ আঙ্গিকটির । এভাবেই হয়ত তিনি সমকালকে বাঁধতে চাইছেন চিরকালের সঙ্গে অথবা চিরকালকে ধরতে চাইছেন সমকালে । একটি সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই যে তিনি সুপ্রিয়র মধ্যে এনেছেন বিবেকধর্মিতা তা-ই নয়, স্বয়ং কুমার রায়ও দুটি দৃশ্যের মাঝখানে একবার এ ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে শুনিয়ে গেছেন 'শান্তিনিকেতন' থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ । যেন এ উদ্দেশ্যকেই স্পষ্টতর করার জন্য আর একবার নেপথ্য থেকে কুমার রায় আবৃত্তি করেছেন 'পদধ্বনি' কবিতা থেকে গভীরতর অর্থে সংশ্লিষ্ট অংশ ।

বস্তুত বহুরূপী প্রযোজিত 'মালিনী'র বৈশিষ্ট্য এখানেই । কুমার রায় শুদ্ধব্রতী হয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি শুধুমাত্র 'মালিনী'র ছাপা পাঠে । বরং এ নাটকে যা ছিল অনেকটাই কাঠামো, কুমার রায় তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন সংলগ্ন অন্যান্য উপাদান । এমনকী যে গানখানি ধ্রুবপদের মতো বার বার ফিরে ফিরে ধ্বনিত হয়েছে নাটকে, সেই 'পূর্ব গগন ভালে'-র মধ্যেও ঘটেছে সেই সংলগ্নতারই প্রকাশ । এবং এ গানখানিও সন্নিবেশিত হয়েছে 'নটীর পূজা' থেকেই । এমন কথাও বলা যায় হয়ত, বক্ষ্যমান প্রযোজনাটি গড়ে উঠেছে 'মালিনী' ও 'নটীর পূজা'র মিশ্রণে । বেশ কয়েকবারই যেন সংকট মুহূর্তে মালিনী হয়ে উঠছিল শ্রীমতী । শুধুমাত্র উপলব্ধিসঞ্জাত প্রকাশে নয়, শ্রীমতীর গানও যেন অনিবার্যভাবে আশ্রয় পেয়েছে মালিনীর কণ্ঠে । প্রসঙ্গত বলা যায়, 'আর রেখো না আঁধারে আমায়

দেখতে দাও' গানখানি সৃষ্টি করেছিল অসাধারণ হার্দ্য নাটকীয়তা। এমন নমনীয় ব্যক্তিত্ব ও ব্যাকুল গভীরতা নিয়ে কলকাতার মঞ্চে বহুদিন গাওয়া হয় নি রবীন্দ্রনাথের গান। কোনোরকম যন্ত্রসংগীতের সাহায্য ছাড়া এমন সমৃদ্ধ গানটি গেয়েছেন দীপা, 'হায়রে'-র বিস্তারের মধ্যেও সংযত থাকতে পেরেছেন তিনি যা প্রযোজনায় এনে দিয়েছে এক ভিন্নতর মাত্রা।

আসলে কুমার রায় গভীরতাকে আবিষ্কার করতে চান সরলকে ভেদ করেই। মঞ্চসজ্জা বা বিবিধ কম্পোজিশনে তিনি নিবিষ্ট থাকতে চান সরলতার ধ্যানে। তাই 'মালিনী'র মঞ্চসজ্জায় থেকেছে বাহুল্যবর্জিত উপকরণ, মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি উত্থিত অংশ, গুটিকত সিঁড়ি, ব্যাক স্টেজে একটি পাটাতন এবং দূরে একটি নগরের প্রতিভাস [মঞ্চ : সুরেশ দত্ত]। শুধু বিন্যাসের মুনশিয়ানায় এ মঞ্চ পেয়ে গেছে বহুমাত্রিক সমতল এবং সামান্য কয়েকটি চরিত্র নিয়ে পরিচালক গড়ে তুলেছেন অজস্রের আভাস। শুধু অস্বস্তি জাগে যখন বন্দী ক্ষেমংকর দাঁড়িয়ে থেকেই আঘাত করে দণ্ডায়মান সুপ্রিয়র মাথায়, যেন প্রেক্ষিতের অভাবেই অসম্ভব মনে হয় তা। একটু অন্যতর বিন্যাস করা যেত না কি এখানে? কিংবা রাজা যখন নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন তাঁর মালিনীকে সমর্পন করবেন সুপ্রিয়র হাতে এবং উভয়ের সামনে প্রকাশও করেন সেকথা, তখন সেই মুহূর্তে মালিনীর অভিব্যক্তি যেন একটু অতিরিক্ত মনে হয় আমাদের কাছে। কেননা ক্ষেমংকরকে নিয়ে নাটকে তখন তৈরি হয়েছে যে টেনশন তার কাঙ্ক্ষিত সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে মালিনী—সেই সময়ে একান্ত ব্যক্তিগত সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে সে এমন মনোভাব যেন মানায় না মালিনীকে। এখানে ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণের অবকাশ আছে হয়ত।

'মালিনী'র অভিনয় একটি অর্কেস্ট্রার মতো। তবু তার মধ্যেও বিশেষ করে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেন ক্ষেমংকর ও মালিনীর ভূমিকায় দেবেশ রায়চৌধুরী ও দীপা ঘোষ। দেবেশের চলনে-বলনে উচ্চারণে মূর্ত হয়ে উঠছিল একটি অপরূপ দার্ঢ্য, এক কঠিনতর ব্যক্তিত্ব। আপন বিশ্বাসে একাগ্র ক্ষেমংকর নিজেকে ব্যক্ত করছিল সুকঠিন দৃষ্টিনিক্ষেপে, ঠোঁটের কুঞ্চনে ও দরকারি স্বরক্ষেপণে। তবু তার মধ্যেও যেন মনে হচ্ছিল দেবেশের কণ্ঠস্বরে রয়ে গেছে উপযুক্ত মড্যুলেশনের একটু অভাব। তবে তিনি যখন 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ' থেকে আবৃত্তি করছিলেন শান্তিবচন তখন অনিবার্যভাবেই যেন তৈরি হয়ে যাচ্ছিল একটি প্রাচীন পরিবেশ। দীপার সম্পদ তাঁর দুটি চোখ। চোখের অভিনয় কত বাঙ্ময় হতে পারে দীপা তার দৃষ্টান্ত। তবে তাঁর উচ্চারণে যেন রয়ে গেছে একটু বেশি সফিস্টিকেশন। কিন্তু ভক্তবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালিনী যখন অভিব্যক্ত হচ্ছিল নাচের মুদ্রায়, তখন দীপা যেন হয়ে উঠছিল অপরূপ এক ভারতীয় ভাস্কর্য। অবশ্য এ কম্পোজিশনটি পরিকল্পনার কৃতিত্ব পরিচালকেরই। সৌমিত্র বসু-র সুপ্রিয় যথাযথ। তাঁর অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস ও যন্ত্রণার সমানুপাতিক মিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে তাঁর সে অংশটি ভোলা যায় না যখন ফুল হাতে নিয়ে প্রায় স্বগত স্বরে উচ্চারণ করেন একই সংলাপ দ্বিতীয়বার। মহিষীর ভূমিকায় নমিতা মজুমদার মানানসই, বরং সে তুলনায় রাজা একটু নিষ্প্রভ।

বহুরূপী এর আগে মঞ্চস্থ করেছেন বেশ কিছু রবীন্দ্ররচনা যার মধ্যে ইতিহাস হয়ে আছে 'রক্তকরবী' বা 'চার অধ্যায়'। কুমার রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাটক বহুরূপীতে মঞ্চস্থ হল বোধ করি এই প্রথম। অনুপুঙ্খ আলোচনায় না প্রবেশ করেও সাধারণভাবে প্রশ্ন তোলা যায়, প্রয়োগ-পরিকল্পনায় শম্ভু মিত্রকে মনে হয় যতটা ইন্টেলেকচুয়াল, কুমার রায় কি তার পাশে একটু ইমোশনাল? তুলনায় কোনটি শ্রেয় সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় ইতিহাসের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বোধ করি ইমোশনাল অ্যাপ্রোচটাই বেশি দরকারি এবং এখানেই রয়ে গেছে বহুরূপী প্রযোজিত 'মালিনী'র স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব।

বিষ্ণু বসু

কুমার রায়ের সঙ্গে কথোপকথন

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ কেন? একশো পঁচিশতম বলে?

কুমার রায় : না, শুধু তাই কেন? রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায় সোশাল পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস সংকটের উত্তর। মেলে উত্তরণের সন্ধান। সে হিশেবে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সবগুলো নাটকই বার বার মঞ্চস্থ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন?

কুমার রায় : রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে সাধারণভাবেই রয়েছে বহুরূপী সম্পর্কে প্রত্যাশা, দর্শকদের প্রত্যাশা। তাই আমাদের উপর দায়িত্বও পড়ে যায় অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে আধুনিকতম নাট্যকার—তাঁর নাটকগুলো প্রযোজনার মধ্যে জড়িয়ে আছে আমাদের আইডেনটিটি খোঁজার প্রশ্ন। তাছাড়া ট্র্যাডিশনাল লোকনাট্যের ফর্মটিকেও রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছেন আশ্চর্যভাবে। সেটাও আমাদের কাছে আলাদা আকর্ষণের ব্যাপার।

প্রশ্ন : 'মালিনী' কেন?

কুমার রায় : 'মালিনী' নাটকটিকে মনে হয় এখনকার দিনেও অত্যন্ত রেলেভেন্ট। অবশ্য নাটকটি একটু সংক্ষিপ্ত, অনেকটা স্কেচি, তাই খানিক সাজিয়ে নিতে হয়েছে তাকে। প্রযোজনায় আনতে চেয়েছি ভারতীয় চেহারা, প্রস্তাবনা রেখেছি পুরোনো ফর্মে, এনেছি বিবেকধর্মী চরিত্র, যুক্ত করেছি রবীন্দ্রনাথেরই অন্য কিছু রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ—অবশ্য আমি যেটুকু প্রাসঙ্গিক মনে করেছি।

প্রশ্ন : আর কিছু?

কুমার রায় : 'মালিনী'র প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ ছিল আরো একটি। লক্ষ করে থাকবেন, সাম্প্রতিক বাংলা মঞ্চ থেকে 'ভার্স অ্যাকটিং' যেন একেবারে লোপ পেতে চলেছে। অথচ অভিনয়ের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হল এটি। আমি তাই চেয়েছি দলের ছেলেমেয়েরা এ বিষয়েও পারঙ্গম হোক। কতটুকু সফল হয়েছি তার সামগ্রিক বিচার করবেন বুধমণ্ডলী। □

মালিনী নাটকের একটি দৃশ্য ফটো নিমাই ঘোষ

নিসর্গের 'অন্য অন্ধকার'

প্রদর্শনী : কনওয়াল কৃষ্ণ-র জলরঙের ছবির একক প্রদর্শনী । চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি । ৬-১৫ আগস্ট ৮৬ ।

দিল্লির শিল্পী কনওয়াল কৃষ্ণ-র একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল প্রায় নিঃশব্দেই । আর কলকাতায় এটিই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী । এককালে কলকাতার সরকারি আর্টস্কুলের ছাত্র (১৯৩৩-৩৯) এই প্রবীণ ও সুখ্যাত শিল্পীর কোনো প্রদর্শনী আগে কখনো হয় নি কেন এখানে তা বিস্ময়ের । তাই এই আয়োজনের জন্য চিত্রকূট গ্যালারির শ্রী পি কেজরিওয়াল আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন ।

কনওয়াল কৃষ্ণ (জন্ম : ১৯১০) মূলত গ্র্যাফিকস শিল্পী হিশেবে সুপরিচিত । বিদেশ থেকে, বিশেষত প্যারিসে হেটারের আঁতালিয়ে ১৭ থেকে, ইন্তালিও পদ্ধতির প্রাকরণিক শিক্ষা নিয়ে এ দেশে ধাতুতক্ষণকে যাঁরা এই সময়ের একটি প্রধান শিল্পমাধ্যম হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, কনওয়াল কৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম প্রধান । ইন্তালিও পদ্ধতির প্রচলিত রীতিকেও তিনি অতিক্রম করেন তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় । রিলিফ বা নতোন্নত ও ইন্তালিও পদ্ধতিকে একসঙ্গে মিলিয়ে, কোলাজের ব্যবহারে প্লেটের তলবিন্যাস পাল্টে, কঠিন থেকে নরম বিভিন্ন মাত্রার রোলার ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আনেন । ধাতব পাতের উপর অ্যাসিডের তক্ষণ ও অন্যান্য পদ্ধতিগত আপাতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যে নৈর্ব্যক্তিক রূপাভাসের সৃষ্টি করে, তাকে সূচারুভাবে ব্যবহার করতে গিয়েই হয়ত প্রকৃতির সমরূপতা থেকে সরে আসেন এই শিল্পী । প্রকৃতি তার অবয়বের সত্য থেকে অন্তর্নিহিত ভাবের সত্যে উত্তীর্ণ হতে থাকে তাঁর ছবিতে । প্রকৃতিকে ভিত্তি হিশেবে নিয়েও চিত্রের গাঠনিক ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে জীবনের ও চেতনার গভীরতর বিমূর্ত বোধের রূপায়ণে নিয়োজিত হয় তাঁর ছবি । গ্রাফিকসের পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যম, বিশেষত জলরঙেও, তিনি কাজ করেছেন । আলোচ্য প্রদর্শনীটি তাঁর জলরঙের ছবির ।

২৬ টি ছবির মধ্যে দুটি বাদে সব ছবিই 'মাউনটেইন মেডিটেটিং' নামে একটি সিরিজের অন্তর্গত, ১৯৮৩ থেকে ৮৬ পর্যন্ত সময়ে করা । বাকি দুটি ছবি, যার বিষয়ও হিমালয় থেকেই নেওয়া, ১৯৪৫ ও ৪৭-এর কাজ ।

শেষোক্ত ছবি দুটি অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রদর্শনীটি অংশত পূর্বাপরতার চরিত্র পেয়েছে । আমরা এই শিল্পীর ক্রমবিকাশের কিছুটা আভাস পেতে পারি যেমন এ থেকে, তেমনি এই সময়ের ছবির একটি বিশেষ ধারার ক্রমবিকাশের আভাসও ।

'কাফ্রিস্তানের কন্যা' নামে ১৯৪৫-এর ছবিটিতে গাছের তলায় বসে থাকা এক পাহাড়ি যুবতীর রূপায়ণ । লোকায়ত বিষয়ের খানিকটা আদর্শায়িত রূপায়ণের মধ্যে একই সঙ্গে বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব ও তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসের ইঙ্গিতও রয়েছে । 'কৈলাশ পর্বত' নামে ৪৭-এর ছবিটি বিশুদ্ধ নিসর্গচিত্র । বেঙ্গল স্কুলের প্রভাবমুক্ত, শিল্পীর নিজস্বতার পরিচয় রয়েছে এই ছবিতে । প্রকৃতির নিজস্ব স্বরূপের যে উপস্থিতি এই ছবিতে, সেই সমরূপতা থেকে পরবর্তী সময়ে দূরে সরে কেমন রূপ নিয়েছে কনওয়াল কৃষ্ণ-র ছবি, তারই পরিচয়ে উজ্জ্বল এই প্রদর্শনী । প্রকৃতি বা নিসর্গ তাঁর ছবির বিষয় । প্রকৃতিকে বা বাস্তবতাকে কখনোই অস্বীকার করেন নি তিনি । কিন্তু প্রকৃতির বাইরের অবয়ব তার অন্তর্নিহিত ভাবগত নির্যাসে দ্রবীভূত হয়েছে । এই দ্রবীভূত বাস্তবতাকে আলো ও অন্ধকারের নানা সূক্ষ্ম পর্দায় বিন্যস্ত করে তিনি রূপ দেন । বাস্তবতার নির্যাস ক্রমান্বয়ে বিমূর্ততার দিকে যায় । বাস্তবতা ও বিমূর্ততার দুই বিপ্রতীপ বিন্দুর টানাপোড়েনের সমন্বয়ে তাঁর ছবিতে উন্মোচিত হয় এক মরমী দার্শনিক চেতনা, যার মধ্যে সময়-সঞ্জাত বাস্তবতার সারাৎসারের অনুরণন থাকে । বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ছবির নান্দনিক শুদ্ধিতে পৌঁছতে চাওয়া, আবার সেখান থেকে বাস্তবতার গভীরতর সত্যে ফিরে আসা, এরকম কয়েকটি নান্দনিক স্তরের পরিক্রমাতেই তাঁর ছবির বিশিষ্টতা । গ্র্যাফিকসের বিমূর্তায়নের অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘজীবনে অর্জিত আধুনিকতায় অন্বিত সদর্থক ভারতীয়তার মরমী চেতনা এক সংহত রূপ পেয়েছে ধ্যানমগ্ন পর্বতমালার এই জলরঙগুলিতে ।

কখনো কখনো ধাতু-তক্ষণ বলেও ভুল করা অস্বাভাবিক নয় এই ছবিগুলিকে । ২১×২৭ থেকে ৫৩×৭৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের তুলট কাগজের চিত্রক্ষেত্র মধ্যবর্তী কাগজের শাদার আলোক-উদ্ভাসিত উজ্জ্বলতা থেকে চার প্রান্তের গভীর ও শীতল বর্ণের অন্ধকারের দিকে প্রবাহিত হয় । অথবা দিগন্ত-ব্যাপ্ত চরাচরের গাঢ় তমসা কেন্দ্রবর্তী উদ্ভাসিত উজ্জ্বলতায় মুক্তি পেতে থাকে । পর্বতের অন্তর্গত বনানী বা গিরিচূড়ার স্বরূপ, আলোর সেই বিভিন্ন মাত্রায় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েও, একেবারে লুপ্ত হয় না । কখনও কাগজের উপরের পর্দাকে ভাঁজ করে নতোন্নত ভঙ্গিতে উত্তলতার আভাস আনা হয় । পর্বতপৃষ্ঠের নানামুখী উত্তলতা-অবতলতার ছদ্মবেশে তা ছবির বিমূর্ত নান্দনিক গঠন হিশেবে কাজ করে । পাহাড়ি নিসর্গের ছদ্মবেশের আড়ালে আলো-অন্ধকারের যে দ্বন্দ্ব উন্মোচিত হয়, তাতে এক সদর্থক মরমী দার্শনিক চেতনার বিশিষ্ট রূপ ধরা থাকে । এই উন্মোচনই ছবিগুলিকে মাত্রাময় করে তোলে । কনওয়াল কৃষ্ণর প্রায় সারাজীবনের ছবিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে একদিকে হিমালয়ের স্তব্ধ ধ্যানমগ্নতা, অন্যদিকে আলো ও অন্ধকারের সুগভীর দ্বৈত । তাঁর নিজের ভাষায়, আলোকে তিনি দেখেছেন তার পরিপূর্ণ বৈভবে, আর অন্ধকারকে আলোকিত অভিব্যক্তির সূক্ষ্মতায় ।

দেশবিদেশের নানা প্রান্তে তাঁর জীবনের বিস্তীর্ণ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আলো-অন্ধকারের এই দ্বৈতের রহস্য তাঁর অবচেতনে যে গভীর-প্রভাব ফেলেছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে ছবিতে । এই প্রদর্শনীর ছবিগুলিতে রয়েছে তারই এক সুসংহত রূপ ।

আমাদের সমকালীন ছবিতে বিমূর্ততা যে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ, ব্যক্তিচেতনা-নিরপেক্ষ এক নৈর্ব্যক্তিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিমানবিক রূপ নিচ্ছে বিশেষত এই দশকের অনেক তরুণ শিল্পীর ছবিতে, এমনকী ষাটের দশকেও এরকম নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল না বিমূর্ততার চর্চায় । বিমূর্ততার মূল প্রবাহটি ছিল তখন নিসর্গেরই উপর আলো-অন্ধকারের দ্বৈতে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতাকে অবলুপ্ত করে দেওয়ার মধ্যে । রবীন্দ্রনাথের নিসর্গের ছবিতেই সম্ভবত প্রথম প্রকৃতির রহস্যের বিমূর্ত বোধ তার আত্মপরিচয়কে দ্রবীভূত করেছে । গোপাল ঘোষের ছবিতে সব সময় প্রকৃতি ও বিমূর্ততার মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট থাকে নি । নিসর্গ রচনা যাঁদের অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম ছিল, চল্লিশ দশকের সেই শিল্পীরা যখন পঞ্চাশে পৌঁছলেন, তখন তাঁদের অনেকের ছবিতে আসতে লাগল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবের

কনওয়াল কৃষ্ণের নিসর্গ দৃশ্য

রূপায়ণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচেতনারই কিছু বিমূর্ত বোধ । পরবর্তী দশকগুলিতে সেই বিমূর্ততা প্রকৃতির অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে সম্পূর্ণতায় পৌঁছেছে । তাতে এসেছে মূলত দুটি ধারা—অভিব্যক্তিময়তা বা এক্সপ্রেশনইজমেরই দুই ভিন্ন রূপ হিশেবে । এস এইচ রাজা, রামকুমার বা নাসরিণ মোহামেদির বিমূর্তায়িত নিসর্গের ছবিতে রঙের মাধ্যমে জ্যামিতিক ক্ষেত্র-বিভাজনে এক ধরনের নাগরিক বৈদগ্ধ আছে, যার প্রবণতা অনেকটা বৌদ্ধিক প্রকাশের দিকে । আর এক ধরনের ছবি আছে, যার গতি মরমী অনুষঙ্গের দিকে । বেঙ্গল স্কুলের ভারতীয়তা-বোধের মধ্যে যে প্রাচ্য দর্শন আশ্রিত মরমী অনুষঙ্গ ছিল, তারই আধুনিকতায় প্রসারিত এক রূপ অনুভব করা যায় এই সব বিমূর্ত নিসর্গে । কৃষ্ণ রেড্ডি, ত্রিলোক কাউল, আকবর পদমসি, পরমজিত সিং বা কলকাতার শিল্পী সত্যেন ঘোষাল যিনি গত কয়েক বছর ধরে 'নেচার ইন মেডিটেশন' নামে একটা সিরিজে তেলরঙের ছবি করছেন, তাঁদের ছবিতে এই মরমী অনুষঙ্গই প্রধান । কনওয়াল কৃষ্ণর বিমূর্তায়িত নিসর্গের ছবিগুলি এই দ্বিতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত । আবার পদমসি বা সত্যেন ঘোষালের ছবিতে আলোই যেমন প্রধান মাত্রা বা বাদী স্বর, কনওয়াল কৃষ্ণর ছবি তার বিপরীত । অন্ধকারই সেখানে প্রধান সুর । কিন্তু সেই অন্ধকার মৃত্যুর বা নেতির প্রতীকরূপী অন্ধকার নয় । বাস্তবতার অন্তর্গত অপার রহস্যময়তা কেমন করে শুদ্ধতার অভিমুখী হয়, কনওয়াল কৃষ্ণর ছবি সেই সন্ধানেরই বিমূর্ত চিত্রকল্প । তাঁর নিসর্গে যে অন্ধকারের প্রাধান্য তা যেন বাস্তবতার বা চেতনার সেই 'অন্য অন্ধকার' ।

মৃণাল ঘোষ

নজরুলগীতির ভিন্ন রুচি

নজরুল শ্রদ্ধার্ঘ । আয়োজক : আরোহী । বিজন থিয়েটার । ১৮ জুলাই ৮৬ ।

গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রবল দাক্ষিণ্যে বিজন মঞ্চের বদ্ধ গুমোট পরিবেশ প্রাণান্ত করে দেয় । সেইখানে বর্ষপূর্তি আয়োজন বসিয়েছেন আরোহী গোষ্ঠী, তাদের প্রথম বছরের অনুষ্ঠান । সুকুমার মিত্রর নামেই দেখতে বা শুনতে আসা । অভিজ্ঞতা বিপরীত । শুধু গানের অনুষ্ঠান হিশেবে বিরল মাত্রায় চিহ্নিত হতে পারত আয়োজনটি, অনায়াসেই । অপটু কবজির বেপথু মোচড়ের একবারেই নিকৃষ্ট মানের আলেখ্য 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি', অবিকৃত কণ্ঠের নাটুকে কাব্যপাঠ, অপ্রয়োজনীয় শিল্পী-পরিচিতি, কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ শিল্পীর বেদম নৃত্য সে মানকে একদম জলো করে দিল । অথচ শুরুর আয়োজনটি চমৎকার । সুকুমার মিত্র সংবর্ধিত হলেন, মঞ্চে গান গাইতে বসলেন ছন্দিতা দত্ত । নজরুলসংগীতে চমৎকার অধিকার ওঁর, গলাটিও ঘসামাজা । তবে একাদিক্রমে বারটি গানের পরিবেশন কোনোভাবেই ধৈর্যের সমর্থন পাবে না । থামতে জানাও তো বিরাট একটা আর্ট ! কমল দাশগুপ্ত, ফিরোজা বেগম এবং সুকুমার মিত্র-র ছাত্রী ছন্দিতা দত্ত বেশ তৈরি হয়েই এসেছিলেন অবশ্য । কাব্যধর্মী, সুরধর্মী—নির্বাচনে উভয় মেজাজের গান । পর্যায় হিশেবে শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান, এমনকী যৎ আশ্রিত টপ্পাও । সবেতেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি । কিন্তু প্রথম বড় আসরে চোখেমুখে সারাক্ষণ একরাশ উচ্চনাসা বিরক্তির

সুকুমার মিত্র

আমদানি হল কেন ? আরো খানিকটা মুক্তকণ্ঠ হতে পারতেন শিল্পী । নির্বাচনে গোলযোগ রয়েছে । 'এ কোন মধুর শরাব দিলে'-এর মতো তরল চালের নিতান্তই গৌণ রচনার অন্তর্ভুক্তি রুচির সমর্থন পায় কি ? বিশেষত শিল্পী যখন সুকুমার মিত্রর ছাত্রী । ভালো শুনিয়েছে 'সখী সাজায়ে রাখলো পুষ্পবাসর', 'আমি এ কুসুমহার', 'তুমি কি আসিবে না' এবং 'প্রথম প্রদীপ জ্বালো' । গলা শুনলে বোঝা যায়, ছন্দিতা অনুশীলনের মধ্যে রয়েছেন । ত্রিসপ্তকে অনায়াস, উচ্চারণে সতর্ক ।

নৃত্যযোজিত সংগীতালেখ্য 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি'-র আগে সুকুমার মিত্র-র মাত্র কয়েকখানি গান । পরপর 'এ ঘনঘোর রাতে', 'ফিরিয়া যদি সে আসে', 'আমার শ্যামা মায়ের', 'আঁখি পাতা ঘুমে' । নির্বাচনের বৈদগ্ধ্যে, নিবেদনের আভিজাত্যে স্বতন্ত্রচিহ্নিত । 'আমার শ্যামা মায়ের' গানটিতে টপ্পার দানাগুলি স্বচ্ছ, সম আয়তনের, হাত দিয়ে ধরা যায় যেন । কাফি-কানাড়ার জবরদস্ত মিশ্রণ 'আঁখি পাতা ঘুমে' নজরুলকে চিনিয়ে দেয় । নজরুলগীতির অখাদ্য-কুখাদ্য ছাঁটাই বস্তুগুলি এখন পরম সমাদৃত । তার মাঝখানে সুকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কিংবা সুপ্রভা সরকারেরা ভিন্ন রুচি গড়ছেন । এর একটা ভবিষ্যৎ আছেই ।

ভবিষ্যতের কয়েকজন শিল্পী সংগীত-আলেখ্যটিতে গলা দিয়েছেন । বেশি রাতের এই মামুলি আয়োজনের প্রায় সবকিছুই খাটো মাপের, সহজে ভুলে যাওয়া যায় ।

ছন্দিতা দত্ত

ভোলা যাবে না কয়েকটি কণ্ঠকে । আর সে কারণেই শেষপর্যন্ত বসার আগ্রহ বজায় থাকে । আলাদা করে এই অল্পবয়সীদের নাম উল্লেখের উপায় নেই, তেমনভাবে চিনিয়ে দেওয়া হয় নি । কিন্তু বলতেই হবে, ছন্দিতা দত্ত-র যোগ্য পরিচালনায় একক কণ্ঠে যাঁরা ছিলেন, শতকরা সত্তরভাগ তৈরি তাঁরা সকলেই । 'ওগো সুন্দর তুমি', 'সৃজন ছন্দে', 'সন্ধ্যা মালতী যবে' 'গাঙে জোয়ার এল ফিরে'—এমন আরো কয়েকটি গান স্বাবলম্বী পরিবেশনে দৃপ্ত । দ্বৈত গানগুলিতে খানিক ভুল বোঝাবুঝি, প্রধান পুরুষ কণ্ঠটিতে পুরুষোচিত গাম্ভীর্যের অভাব—এহেন ত্রুটি সংশোধনযোগ্য । সারা অনুষ্ঠানে বাবলু বিশ্বাসের তবলা-সংগত অতি উঁচুমানের, অল্পবয়সী বিশ্বজিৎ অধিকারী বা দেবাশীষ ঘোষ যথাক্রমে তবলা ও হারমোনিয়ামে বেশ দক্ষ । সহজে হাততালি কুড়নোর চেষ্টায় রাশ টানতে হবে কেবল, বিশেষত শ্বেযোক্তজনের ।

অলক রায়চৌধুরী

অভিনেতা যেখানে অসহায়

চলচ্চিত্র : শ্যামসাহেব । কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । প্রযোজনা : হাস্না গুপ্তা । পরিচালনা : সলিল দত্ত ।

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—সাহেবি উচ্চারণে শ্যামসাহেবের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই কথাগুলি আবৃত্তি করতে হয়েছে । সেটা সৌমিত্র-র নিজের কাছে কতটা পীড়াদায়ক হয়েছে বোঝার উপায় নেই । তবে পরিচালক সলিল দত্ত সৌমিত্রকে দিয়েই এই কাজটি করিয়ে নিতে চেয়েছেন বাণিজ্যিক পারাপারের সহজিয়া সাধনায় । সাহেব এই ছবিতে শ্যাম হয়েছেন । একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের সর্বময় কর্তা এই সাহেব । অসম্ভব কৃপণ, টাকা আগলে বসে থাকেন তিনি । সিন্দুকে টাকার সঙ্গে রিভলবারও থাকে । সমাজবিরোধীদের আক্রমণ থেকে

নিজেকে রক্ষা করার জন্য সেটা কাজে লাগান তিনি। সুন্দরী মহিলা দেখে কাঁচা মুলো ও পাতা চিবুতে থাকেন। কখনও-কখনও স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করেন। মেয়েরা চারিদিকে গোল হয়ে, মধ্যিখানে সাহেব। অতএব, শ্যাম সাহেব। চমৎকার বুঝিয়েছেন পরিচালক।
ছবির টাইটেল-পর্বে নানা বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ দেখে চমকে উঠতে হয়। প্রায় কোনো রং বাদ নেই। তার মধ্যে হয়ত ঝুঁকি ছিল। কারণ রং তো তাহলে বাছাই করতে হয়। বিচিত্র এইসব রংগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে এ ওর গায়ে, তাদের মিশে যাবার আর্তনাদ মিলিয়ে যেতে না যেতেই এসে পড়ে আরো সব রং। রকমারি ফুল দুলতে থাকে। সেই সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে আর্তনাদ-সংগীত। স্বীকার করব প্রথম চোটে বিস্ময় এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে দৃশ্যটির অর্থ একেবারেই ধরতে পারি নি। ছবির শেষে শ্যামসাহেবের বাণী শুনে ধাতস্থ হলাম। বিচিত্র এইসব রংয়ের নামই হয়ত জীবন।
জীবনের নাম রং—বিশেষ করে যেখানে শ্যামসাহেব আছে, চন্দ্রা আছে, চন্দ্রার স্বামী-মেয়ে সবাই আছে, নাচাকোঁদা আছে। আর হ্যাঁ, নারীস্বাধীনতার কথাও পরোক্ষে আছে। এ বিষয়টা আজকাল আবার নানা কায়দায় ঢুকে পড়ছে ছবিতে। যদিও ভেতর থেকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা তেমন চোখে পড়ছে না। তাই কেবল বাইরের ভঙ্গিটাই চোখে পড়ছে আমাদের। এ ছবিতেও যেমন স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য চন্দ্রা পার্টিতে গিয়ে নাচগান করে অন্তত একটি দৃশ্যে। ঘরে সাজা পুতুল হয়ে দিন কাটাতে মোটেই রাজি নয় সে। ভাগ্যিস ইবসেন নামে কেউ এ বিষয়ে একটা নাটক লিখেছিলেন একবার। ইবসেনের দিন চলে গেছে আজ। এখন শ্যামসাহেব। শুরুতেই দুর্ঘটনা। গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাবে মি: মিত্র অথবা দীপঙ্কর দে, ঠিক সেই সময় পদচারিনী অপর্ণা বা চন্দ্রার সঙ্গে ধাক্কা। গাড়ির দরজায় কপাল ফেটে যায় চন্দ্রার। কিন্তু ছবিতে সাধারণত এভাবেই আবার কপাল খুলে যায়। চন্দ্রা দেখতেও সুন্দরী, অতএব ছবির নায়ক মিত্রমশাই তার কপাল ফাটিয়েই ক্ষান্ত হল না। নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রার প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব নিল। তারপর জোর করে চন্দ্রাকে বাড়িতেও পৌঁছে দেবার কাজ হাসিমুখে পালন করল সে। "আপনাকে বাড়ি আমি পৌঁছে দেবই"—নায়কের মুখে এই কথা শুনেই বোঝা যায় সে রীতিমতো নাছোড়বান্দা চরিত্র। চন্দ্রার কেবল এক দাদা কলকাতায় থাকেন। বাবা-মা কেউ নেই। দাদাও তাড়াতাড়ি বদলি হয়ে যাচ্ছেন অন্যত্র। প্রবল সমস্যা। তায় আবার জেদি মেয়ে, বিয়ের কথা শুনলেই রাগ করে। বরাবর হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। এক্ষেত্রেও মিঃ মিত্রই ভরসা। কারণ, তার হাতেই ফেটেছে চন্দ্রার কপাল। অতএব গান : পার্কে, ফোয়ারার ধারে—দুজনেই গাইতে জানে। তারপর গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে গুণ্ডাদের হাতে বিপত্তি। নায়ক আবার মদ্যপান করে টং অবস্থায়। সেদিনই চন্দ্রার বাড়িতে গিয়ে তার দাদার কাছে, বিয়ের প্রস্তাব করে সে। এভাবেই ঢুকে যায় বিয়ের পর্ব। এ বিয়েতে চন্দ্রার কোনো রাগ নেই। তাছাড়া, নায়ক নাছোড়বান্দা।
বিয়ের পর প্রথম কিছুকাল ভালো কাটে। কিন্তু শিগগিরি ব্যবসার খাতিরে বোম্বাইতে গিয়ে মধু নামে একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। মধু আবার এক ভুয়ো কোম্পানির মালিক শেঠির রক্ষিতা। অতঃপর নায়ক আর মোটেই সময় করে উঠতে পারে না স্ত্রী-র জন্য। মধু তার ব্যবসার উন্নতির চাবিকাঠি। অতএব মধুই জীবন। এর মধ্যে চন্দ্রা তার বিধবা শাশুড়ির কাছ থেকে জেনে গেছে এ বাড়িতে তিনিও কোনোদিন যথাযোগ্য মর্যাদা পান নি। তাকে জিজ্ঞেস না করেই তার কোলের সন্তানকে পড়াশুনার জন্য দার্জিলিং পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনও তাই হতে চলেছে। চন্দ্রার ছোট মেয়েটিকে দার্জিলিং পাঠিয়ে দিতে চায় তার স্বামী। এই আতঙ্কে ও সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে চন্দ্রা তার মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে

শ্যামসাহেবে অপর্ণা সেন

যায়। বিজ্ঞাপন দেখে একটি স্কুলে ইনটারভিউ দিতে যায় চন্দ্রা। এখানেই আবির্ভাব শ্যামসাহেবের। এখান থেকেই ছবির মধ্যে কিছুটা গতি দেখতে পাই আমরা। শ্যামসাহেবের সঙ্গে দর্শকদের প্রথম পরিচয়ের মধ্যে নাটকীয়তা আছে। সাহেব নিজের মর্জি মতো চলেন। তাই লোক ডেকে এনেও শেষ মুহূর্তে তিনি ইনটারভিউ বাতিল করে দেন। স্কুলের আর এক শিক্ষিকার সহায়তায় চন্দ্রা সোজা সাহেবের ঘরে গিয়ে হাজির হয়। সাহেব তখন কাঁচা মুলো চিবুচ্ছেন। সাহেবের নিত্যসঙ্গী ভৃত্যের ভূমিকায় চিন্ময় রায় আগাগোড়া ভাঁড়ামি করে গেছেন। তাতে কৌতুক জমে নি, বরং ছবির অতি সামান্য যে গতি তাও নষ্ট হয়েছে। চরিত্রটি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, চিত্রনাট্যের পক্ষে সে বাড়তি বোঝা। যে দুর্বল চিত্রনাট্য নিজেই চলতে পারে না, তার পক্ষে এই বোঝা সামলানো মুশকিল। অতএব অভিনেতার কাছ থেকে কাজ কী করে আদায় হবে ?
চন্দ্রা, তার ছোট মেয়ে ও শ্যামসাহেবের সম্পর্কের মধ্যে গভীর এক মানবিক আবেদনের অবকাশ ছিল। সেটা পরিচালক একেবারে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করেন নি একথা বললে ভুল হবে। কিন্তু ভুল পথে, দুর্বল ভাবনায় সেটাও উবে গেছে। চন্দ্রা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর তার স্বামী মেয়েকে পেতে চায় নিজের কাছে। সরাসরি লালবাজারে পুলিশের এক বড় কর্তার কাছে হাজির হয় চন্দ্রার স্বামী। তিনি এই পরিবারের একজন বন্ধুও। তাঁর সাহায্যেই চন্দ্রার হদিশ পায় তার স্বামী। মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে চন্দ্রা মেয়ের দুঃখে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এর আগে অবশ্য শ্যামসাহেবের অতীতের ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকে জানতে পেরেছি আমরা। সাহেবের তিনটি বৌ মারা গেছে। সেই সঙ্গে তার মা-ও। তৃতীয় পত্নীর চেষ্টায় গড়ে উঠেছে আজকের স্কুল। সেও তার আপন ভাইয়ের হাতে ছুরিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। সাহেব এখন নিঃসঙ্গ। নিয়মিত মদ্যপান করতে হয় তাকে। চন্দ্রা আর তার ছোট মেয়েটিকে সাহেব তার বিপুল অর্থের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে। তার কেবল একটিই বাসনা। অন্তিম সময়ে চন্দ্রা তাকে শ্যামসাহেব বলে ডাকবে। বলবে, "তুমি যেও না শ্যামসাহেব, তুমি যেও না " তখন শ্যামসাহেব বলবে, "মরিতে চাহি না আমি।" হয়েছেও তাই। অনুতপ্ত স্বামীকে নিয়ে চন্দ্রা সাহেবের অন্তিম সময়ে হাজির হয় তার কাছে, সঙ্গে তার ছোট মেয়েটি। চন্দ্রা শ্যামসাহেব বলে ডেকেছেন, সাহেব অস্ফুটে উচ্চারণ করেছেন—"এই সূর্যকরে, পুষ্পিত কাননে।"
'শ্যামসাহেব'কে তবু বাঁচানো গেল না। এমন ছবিতেও শ্যামসাহেবের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রাখার মতো। চন্দ্রার চরিত্র ভাবনাই আগাগোড়া দুর্বল। এই ভূমিকায় অপর্ণা সেন যা কিছু করেছেন, তার বেশি আশা করা অন্যায়। 'কোনি' ছবিতে অসাধারণ চরিত্রাভিনয়ের প্রত্যাশা জমিয়ে তুলেছিলেন সৌমিত্র। 'শ্যামসাহেব' ছবিতে সেটা যে ঈষৎ অস্পষ্ট তার জন্য দায়ী দুর্বল চিত্রনাট্য। তবু দু-একটি জায়গায় তাঁকে চিনতে পারি আমরা।
আমাদের দুর্ভাগ্য, হাতের কাছে পাওয়া ক্ষমতাবান সব অভিনেতাদের আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না।
তপনকুমার ঘোষ

প্রনবেশ মাইতির ছবি

চিত্র-ভাস্কর্য

সত্যজিৎ রায়, রঘুনাথ গোস্বামী, পূর্ণেন্দু পত্রীদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী হিশেবে প্রণবেশ মাইতি ইতিমধ্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লিনোকাট ও পেপার কাটিং-এ শাদাকালো, কখনোবা রঙিন রেখাঙ্কনে তিনি অন্নদাশংকর রায়ের 'ছড়া সমগ্র', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চিড়িয়াখানা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলদস্যু' বা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা-'র মতো আরো অনেক বই অলঙ্কৃত করেছেন। 'শিশুমেলা' পত্রিকায়ও বর্ণময় অলংকরণ লক্ষ করা গেছে। সম্প্রতি সেইসব ছবির প্রায় ১৩৩টি নমুনা একটি প্রদর্শনী হল অ্যাকাডেমিতে (২-৭ জুলাই)। মুদ্রিত ছবিগুলির পাশে নমুনা হিশেবে একটি বোর্ডে লিনোকাট ব্লকগুলিও প্রদর্শন করায় প্রদর্শনী মান বেড়েছে। ছবির বিষয়ব... না-বিমূর্ত, কিঞ্চিৎ স্থূল-বর্ণময় বাস্তবে উপস্থাপন। প্রচ্ছদ বা অলংকরণের ছবি হলেও শিল্পসম্মত বলে উপভোগ্য।

এখানেই হাওড়ার চিত্রলেখা স্কুলের ৪ থেকে ১২ বছরের ৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর প্যাস্টেল, পেনসিল, জলরং ছবির প্রদর্শনী (৮-১৪ জুলাই) দেখে মনে হয়েছে, এরা সঠিক তত্ত্বাবধানে আছে। প্রদর্শনীতে ২০-২২ বছরের কয়েকজনের ছবি থাকলেও ছোটদের ছবিই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ছবির মূল শর্ত ড্রইং-এ ছাত্ররা বেশ পারদর্শী।

প্রদীপ পাল

গান

রাজ্য নৃত্য, নাটক ও দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমি এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর যুগ্ম উদ্যোগে ২৪ ও ২৫ জুলাই জোড়াসাঁকোর উদয়শংকর হল ও বি টি রোড মরকত কুঞ্জের লেকচার হলে বসেছিল ভাওয়াইয়া চটকা গানের আসর। জলপাইগুড়ির মান্য শিল্পী দীপ্তি রায় সে অনুষ্ঠানের শিল্পী। রেকর্ড বা শহর-শহরতলির নানাবিধ জলসা বা সম্মিলনীর 'মেড ইন ক্যালকাটা' ধাঁচের ফরমায়েশি লোকগীতির আসর নয়, একেবারে মাটির ঘ্রাণ গলায় নিয়ে মগ্ন সপ্রতিভতায় গান শুনিয়েছেন শিল্পী। তফাতটা বেশ ভালোই নজরে আসে।

ব্যারাকপুরের রবীন্দ্রকলাকেন্দ্র রবীন্দ্রায়ন কলামন্দির বেসমেন্ট হলে ডঃ অমলশংকর ভাদুড়ীর পরিচালনায় নিবেদন করলেন গবেষণামূলক এক অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীতে কালীদর্শন। বিষয়ের অভিনবত্বে তো বটেই, আলেখ্য রচনা ও সংগীত পরিবেশনের কৃতিত্বেও প্রায় সম পরিমাণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শিল্পীগোষ্ঠী। প্রথমার্ধে একক সংগীতে অংশ নিয়েছেন ...নানী ঘোষ এবং ডঃ অমলশংকর ভাদুড়ী। সব মিলিয়ে এক রুচিস্নিগ্ধ সন্ধ্যা।

রমেশ মিত্র রোডের ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী ঘরোয়া আসরের অনুষ্ঠাতা সংস্থাগুলির মধ্যে বেশ পরিচিত। নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেন এমন হয়ত বলা যায় না, কিন্তু কুশলী নবীনদের ক... পেতে আসরে পেশ করার স্বতঃপ্রণোদিত দায়বোধ ওঁদের রয়েছে। এবং সে কারণেই সুছন্দম কিংবা অরিত্র প্রভৃতি সংস্থাগুলির সমসারিতে ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীকে অনায়াসেই ফেলা যেতে পারে। ওঁদের ১০ আগস্টের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন প্রবাসিনী নন্দা মুখোপাধ্যায় এবং প্রত্যূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমজন শোনালেন খেয়াল ও ঠুম্‌রি। দ্বিতীয়জন সরোদিয়া—সমরেন্দ্র শিকদার এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কৃতী ছাত্র। সুজিত সাহার তবলা সংগত এই নবীনবরণকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে।

অলক রায়চৌধুরী

থিয়েটার

প্রয়াস নাট্যগোষ্ঠীর নতুন প্রযোজনা ইয়েভগেনি লিভোভিচ্ শোয়ার্ৎস-এর নাটক অবলম্বনে 'দানব' অভিনীত হল ৯ অগাস্ট অ্যাকাডেমি মঞ্চে। নাটকটি গড়ে উঠেছে অনেকটা পৌরাণিক কাহিনীর আদলে। একটি কাল্পনিক দেশের জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত বিশাল ক্ষমতাশালী এক রাজার অত্যাচারে। মায়াবী সে, মুহূর্তের মধ্যে নিজের রূপ বদলে ফেলতে পারে। হঠাৎই সেই রাজ্যে আগমন ঘটে নীলকমলের, ভিনদেশি এক সাহসী যুবক। সে মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে মূলধন করে রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এর পরের ঘটনা তো আমাদের জানাই আছে। দুষ্টের পতন এবং ন্যায়ের জয়—ইচ্ছাপূরণের সূত্র

"দানব"-এর দৃশ্য

ধরেই নাটকের এই পরিণতি হয়ত আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুখে আপ্লুত করে। আসলে নাটক নির্বাচনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রযোজনাটির দুর্বলতা। নতুবা প্রয়াস গোষ্ঠীর দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। অশোক মুখোপাধ্যায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালনার দায়িত্বে বিদ্যুৎ নাগের ভূমিকাও ছিল বেশ উজ্জ্বল। তবে বিষয়ের ঘাটতি কুশীলবদের একক প্রচেষ্টাকে অনেকটাই নষ্ট করেছে। অভিনেতাদের মধ্যে লিপিকা সাহা ও পল্লব রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

বিবিধ

২০ জুলাই টিটাগড় রবীন্দ্রভবনে গোবিন্দ স্মৃতি সংগীতায়ন ওঁদের বার্ষিক মিলনোৎসবে মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'। তার আগের অনুষ্ঠানগুলিও রীতিমতো নজর কাড়ার মতো। সমবেত তালবাদ্য কিংবা কথক নাচের অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের অনুশীলনকে মেলে ধরে। শহরতলির এই ধরনের কয়েক শ শিক্ষায়তন কোনোরকম প্রচার বা পৃষ্ঠপোষকতার তোয়াক্কা না করে অনুষ্ঠানের গুণগত মানোন্নয়নের পিছনে প্রাণপাত করে চলেছে। তার চমৎকার এক উদাহরণ 'তাসের দেশ'। সংগীতাংশে হয়তবা কতক খামতি ছিল, কিন্তু নৃত্যের সমবেত প্রদর্শনী একচুলও বেতাল হয় নি। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'তাসের দেশ', অন্তত নৃত্য ও অভিনয়ের আয়োজনের ব্যাপকতায় দুরূহতম। প্রদীপ্ত নিয়োগী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রায় আনকোরা নতুন শিল্পীদের নিয়ে অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। শ্রাবণী প্রামাণিক, অনুরাধা নিয়োগী এবং রাজপুত্রবেশী প্রদীপ্ত নিয়োগী আলাদা করে সাধুবাদ পাবেন।

ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা 'মাঝি' ৩ আগস্ট বিবেকানন্দ সোসাইটি মঞ্চে আয়োজন করেছিলেন এক কবিতা-সন্ধ্যার। 'নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫' এবং প্রশান্ত রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'হাত ধুয়ে ফেলেছি হাওয়ায়'—এই বই দুটির সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হল শ্রোতা-দর্শকদের। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী। বেশ ছিমছাম আয়োজন।

এসেনশিয়াল রিক্রিয়েশান ক্লাব কলামন্দিরে সংবর্ধনা জানালেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং অখিলবন্ধু ঘোষকে। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অমলেন্দু দাশগুপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ে শোনা গেল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি। গান গাইলেন অজয় চক্রবর্তী। সবশেষে মমতাশংকর ব্যালে ইউনিট নিবেদিত রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিল্ম

রবীন্দ্রসদনে ৩ সেপ্টেম্বর উত্তম স্মৃতি সংসদ-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান।
গোর্কি সদনে এ পক্ষের প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের ফিচার ফিল্ম ছাড়াও প্রদর্শন-তালিকায় রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবন অবলম্বনে তথ্যচিত্র।
বর্তমান পক্ষে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ ছবির প্রদর্শন স্থগিত রেখেছেন।
নন্দন-এর বড় এবং ছোট প্রেক্ষাগৃহটিতে দুপুর ও সন্ধ্যায় দেশ-বিদেশের নানা ফিচার ফিল্ম দেখাবেন সিনে ক্লাবগুলি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক সিনে সার্কেল, সিনে সেন্ট্রাল, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রমুখ সংস্থা। বিস্তারিত সূচি প্রকাশিত হয় নি।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের নিউ গ্যালারিতে ৫ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

নাটক

শিশির মঞ্চে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, এবং ১৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে সমীক্ষণ, অন্য থিয়েটার, উত্তরণ, কোরাস, রঙ্গসভা এবং নাট্যায়ন-এর নাট্য নিবেদন।
সেখানেই ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নাট্যার্ঘ্য গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় তিন দিনের নাট্যোৎসব।
ম্যাক্সমুলার ভবনে এ পক্ষের প্রতি শুক্রবার অর্থাৎ ৫ এবং ১২ সেপ্টেম্বর অভিনীত হবে সংবর্ত গোষ্ঠীর নতুন প্রযোজনা 'অতন্দ্র গোলাপ'। অনুবাদ ও নাট্যরূপ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নৃত্য নির্দেশনা : শুভাশিস ভট্টাচার্য। নির্দেশনা : সুনীল দাশ।
রবীন্দ্রসদনে ২ এবং ১০ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে আগামী ও থিয়েটার পয়েন্ট-এর প্রযোজনা।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ ২, ৩, ৫, ৭ (সকাল), ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ (সকাল) এবং ১৬ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে চেতনা, গন্ধর্ব, থিয়েটার ফ্রন্ট, প্রত্যয়, চার্বাক, থিয়েটার কমিউন, লাইমলাইট, সমকালীন শিল্পীদল, শূদ্রক, পি-এল-টি, রঙ্গন এবং চেতনার প্রযোজনা।
সেখানেই ৪ এবং ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নির্দেশনায় নান্দীকার-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা : 'নীরা'।
অ্যাকাডেমিতে ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বহুরূপী অভিনয় করবেন রবীন্দ্রনাটক : 'মালিনী'। প্রয়োগ প্রধান : কুমার রায়।

প্রদর্শনী

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ৩ সেপ্টেম্বর ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
সেখানেই ৯ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকছে সাইকোলজিকাল অ্যান্ড এডুকেশানাল রিসার্চ আধিকারিকের নানা প্রদর্শন-সামগ্রী।
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ১৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সমিতির ব্যবস্থাপনায় তিন দিনের প্রদর্শনীর সূচনা। ১৮ সেপ্টেম্বর এই প্রদর্শনীর সমাপ্তি দিবস।
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের নিউ গ্যালারিতে ৬ সেপ্টেম্বর লেডিজ ইন সংস্থার শাড়ি বিক্রির প্রদর্শনী। এক পক্ষকালের এই প্রদর্শনী আগামী পক্ষেও চলবে।
সেখানেই নর্থ গ্যালারিতে ৮ সেপ্টেম্বর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা। চলবে বর্তমান পক্ষ পার করে।

অ্যাকাডেমির ওয়েস্ট গ্যালারিতে ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে তরুণ দে-র চিত্রকলা ও ড্রইং প্রদর্শনী। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
সেখানেই সাউথ গ্যালারিতে ১১ সেপ্টেম্বর বেগম সংস্থার উদ্যোগে অলংকার প্রদর্শনী। ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে ১৪ সেপ্টেম্বর মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জীর চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা। আগামী পক্ষেও চলবে।
মৌলালি যুবকেন্দ্রের প্রদর্শনকক্ষে ছুটির দিন ছাড়া এ পক্ষের প্রতিদিন দেখা যাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক স্থায়ী প্রদর্শনী।

গান

রবীন্দ্রসদনে ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সঞ্চারিনী আয়োজিত সংগীত-আসরের মুখ্য শিল্পী কালিদাস নাগ। শোনাবেন নজরুল ও সমসাময়িক গীতিকারদের কাব্যগীতি।
রবীন্দ্রসদনে ঐদিন অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর সকালের অনুষ্ঠানটির নিবেদক 'খোয়াই'। অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রসংগীতের।
সেখানেই ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর সমবেত ও একক সংগীত এবং নৃত্যযোজিত সংগীতালেখ্য নিবেদন করবেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার, রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়।
রবীন্দ্রসদনে ১৪ সেপ্টেম্বর ত্রিবেণী-র সংগীতাসর।
সেখানেই ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর বেহালার সবুজ স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী এবং আবৃত্তিকারদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সম্মিলনী।

বিবিধ

রবীন্দ্রসদনে ৫ এবং ৮ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে শিক্ষক দিবস ও সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান।
সেখানেই ৯ সেপ্টেম্বর প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার আবৃত্তি, নাটক এবং সংগীতের আসর।
রবীন্দ্রসদনে ৬ সেপ্টেম্বর ড্যানসার্স গিল্ড-এর নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের পরিচালনায়। নৃত্যাংশে রঞ্জাবতী সরকার, ঝুমা বসাক, মঞ্জুশ্রী চাকীসরকার প্রমুখ।
সেখানেই ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে কেরালা নৃত্যকলা মন্দিরের শাস্ত্রীয় নৃত্যের আসর।
রবীন্দ্রসদনে ৪ এবং ১১ সেপ্টেম্বর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দুটি শাখা আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠান।
শিশির মঞ্চে ৭ সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের বার্ষিক সম্মিলনী।
সেখানেই ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ত্রিবেণী এবং শরৎ বোস অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় বিচিত্রানুষ্ঠান।
শিশির মঞ্চে ১৬ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া ওমেন্স কংগ্রেসের সম্মেলন।
মৌলানা আজাদ কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক উৎসব শুরু হচ্ছে বর্তমান পক্ষের ১০ তারিখে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। পরবর্তী দিনগুলিতে থাকছে আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের ১২৫ বর্ষ স্মরণানুষ্ঠান, মুশায়রা, পাশ্চাত্য সংগীত সন্ধ্যা, আলোচনা সভা ইত্যাদি।
বিড়লা সভাগৃহে ৫ সেপ্টেম্বর রেশমী মজুমদারের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'।
ভারতীয় ভাষা পরিষদ মঞ্চে ১৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মতী চক্রবর্তীর নৃত্য-পরিচালনায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য : 'শ্যামা'। সংগীতাংশে অলক রায়চৌধুরী, রাজশ্রী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

Regd No R.N. 41096/83 PRATIKSHAN VOL IV No 5 2-16 Sept. '86 FORTNIGHTLY Postal Regd No WB/CC 404